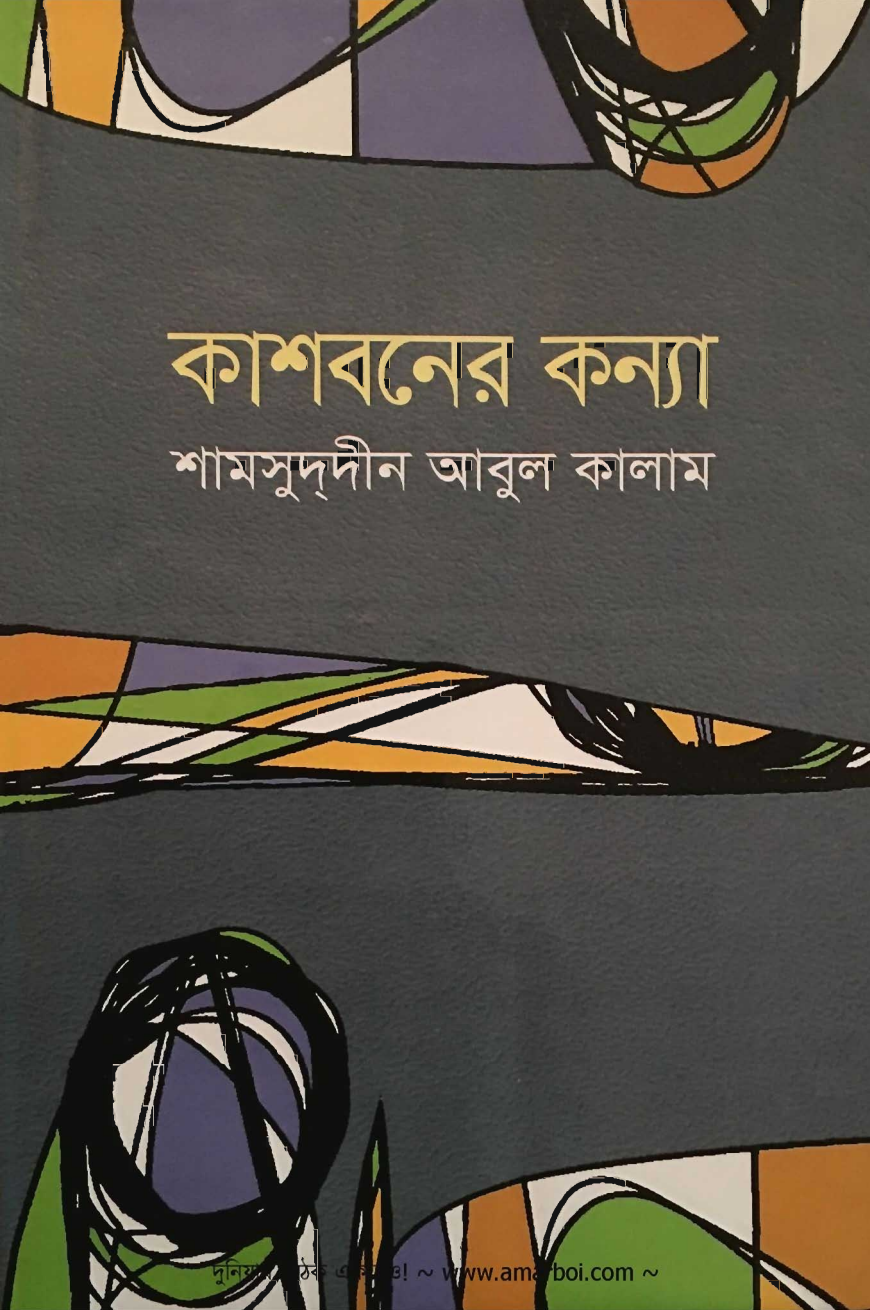

কাশবনের কন্যা

শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশবনের কন্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশবনের কন্যা

শামসুদ্দীন আবুল কালাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

সকল কবিকুল প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

পবিত্র সরকার

বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস প্রকাশ করেই যশস্বী এবং জনপ্রিয় হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত আছে। শামসুদ্দীন আবুল কালামও (১৯২৬) এই দৃষ্টান্তমালার মধ্যে অন্যতম উল্লেখ্য এক উপন্যাসকার। তাঁর কাশবনের কন্যা (১৯৫৪) উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন তুলেছিল, এবং আমাদের মতে, পূর্ব পাকিস্তান তথা পরবর্তী বাংলাদেশের গল্প-উপন্যাস যে পশ্চিম বাংলা তথা সর্ববঙ্গীয় গল্প-উপন্যাসের ব্যাপকতর ধারার মধ্যে একটি নিজস্বতা অর্জন করতে শুরু করেছিল—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র লালসালু (১৯৪৮)-র পরে তারও এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তখন পূর্ব পাকিস্তান নামাঙ্কিত পূর্ববাংলার ব্যাপকতর বাঙালি জীবন যে সব কারণে বৃহত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি তার প্রাতিবেশিক কারণগুলি এখানে সম্পূর্ণ আলোচনা করার অবকাশ নেই। পদ্মা প্রমত্তা নদী ও অন্যান্য গল্প-উপন্যাসের লেখক সুবোধ বসু সে অর্থে জনপ্রিয় ছিলেন না, কুরপালা, গৌরীগ্রাম, শতাব্দীর লেখক রমেশ চন্দ্র সেনও না। প্রমথনাথ বিশীর পদ্মা বা জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার সে অর্থে জনজীবনের আখ্যান নয়। যদি বলি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ-আশ্রিত উপন্যাসগুলিও ভূমিগত জনজীবনের ছবি হয়ে উঠতে পারেনি, তা বিতর্কিত সিদ্ধান্ত হবে, তবে হয়তো সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হবে না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটোগল্পে অবশ্য পূর্ববাংলার জনজীবনের দু'একটি ঘনিষ্ঠ ছবি আছে। পরবর্তীকালে উদবাস্তু লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় পূর্ববঙ্গ এসেছে মূলত নস্টালজিয়ার ভেলায় চড়ে। সে ভূমি অল্পবিস্তর অতীতে এবং এক বিষণ্ন সৌন্দর্যে আশ্রিত। কিন্তু এসব বহু আখ্যানেই প্রধান-ভাবে জুড়ে আছে মধ্যবিত্ত (কখনও বা জমিদার শ্রেণিভুক্ত) হিন্দু সমাজ। অখণ্ড বাংলার খাদ্য-অর্থনীতির যারা প্রাণ ছিল সেই কৃষক-মৎস্যজীবী সমাজের, বিশেষত মুসলমান শ্রমজীবী সমাজের গভীর ও অন্তরঙ্গ ছবি এঁদের লেখায় খুব বিস্তারিতভাবে নেই। দেশভাগ পূর্ববর্তীকালে প্রকাশিত বাঙালি মুসলমান লেখকদের গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধেও বহুলত এই কথা বলা যেতে পারে, যদিও কিছু ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। তাঁদের মূল উপজীব্য ছিল জায়মান মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন।

এমন হওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ যে-সময়ে পঞ্চভূত (১৮৯৭)-এর "মনুষ্য" প্রবন্ধে একটি সহজ নৈসর্গিক রূপক ব্যবহার করে লিখেছিলেন যে, বাঙালি লেখকদের মনোযোগের সূর্যালোক প্রথমে পড়েছিল পাহাড়ের চূড়োগুলির উপর—অর্থাৎ উচ্চবিত্ত অভিজাত শ্রেণীর নায়ক-নায়িকার উপর—পরে তা ক্রমশ নীচের উপত্যকাভূমিতে এসে পড়েছে—তা তখনও পুরো সত্য হয়নি। তারা দীর্ঘদিন উপন্যাসে গৌণ ও বিচ্ছিন্ন পার্শ্বচরিত্র হয়ে থেকেছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় গোষ্ঠীর বাঙালি লেখকের রচনাতেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটোগল্পে অবশ্যই দু'চারটি ব্যতিক্রম দেখা গেছে। আমরা যাকে 'জনজীবন' বলি অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত, স্কুল-কলেজে পড়া বাঙালি সমাজের মনোযোগের অবস্তরে নির্বাসিত শ্রমজীবী, বিশেষত ভূমিশ্রমিক সমাজের জীবন, তা আখ্যান-সাহিত্যে তেমনভাবে আসেনি। আজকাল আমরা যে Marginalised কথাটি ব্যবহার করি তা এদের অস্তিত্ব—এবং সাহিত্যে তার প্রতিবিম্বনের যে তীব্র দারিদ্র্য—তার অর্থকে যথেষ্ট প্রকাশ করে না।

মুসলমান আত্মস্বাতন্ত্র্য বোধের উদ্ভবের একটা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা এদেশের ইতিহাসে যথেষ্ট করা হয়েছে, আমাদের তার যুক্তিযুক্ততার বিচারে যাবার অবকাশ নেই। সব ঘটনারই নানাপার্শ্বিক দৃষ্টান্ত থাকে এবং এর কোনো একটি পিঠ ধরে নিয়ে অনেকেই পুরো ঘটনাটাকেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। আমাদের মতে বাঙালি মুসলমান সমাজের এই স্ব-চেতনার জাগরণের ফলে যে-লাভ হয়েছে তা ওইখানে তাঁরা তাঁদের নিজেদের সমাজের জীবনকে তীক্ষ্ণ, ঘনিষ্ঠ ও মমতাময় দৃষ্টি দিয়ে দেখার অবকাশ খুঁজে নিয়েছেন এবং সাহিত্যে তার চিত্রণে মনোযোগী হয়েছেন। এতে অবশ্যই শ্রেণিগত বাধাও ছিল, সকলে সমানভাবে জনজীবনের ছবি আঁকতে পারেননি। সে-সম্ভাবনা একদিক থেকে অনুমানযোগ্য ছিল। যে-অভিজ্ঞতা লেখকের অধিগত নয়, যিনি এমনকি আকাঙ্ক্ষা এবং সহানুভূতি দিয়েও সে-অভিজ্ঞতার ক্ষতিপূরণ করতে পারেন না, তাঁরা এ বিষয়ে লিখতে গেলে রক্তমাংসহীন রোমান্টিক ছবি আঁকবেন—এমন ভয় থেকে যায়। কাজেই আমরা যখন বলি যে, হিন্দু বা মুসলমান জনজীবন বাঙালি লেখকদের রচনায় দীর্ঘদিন আসেনি, তা নিছক ঘটনা হিসেবে নির্দেশ করি, লেখকদের প্রতি অভিযোগ হিসেবে নয়।

পূর্ব-বাংলায় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠায় মুসলমান জনজীবন সে দেশের আখ্যানে আসার সুযোগ যে বাড়ল, এতে আমাদের সুনিশ্চিত লাভই হল। আশা করি এ কথাকে কেউ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রীয় সত্তার সৃষ্টির সমর্থন বলে ধরে নেবেন না। লাভ হল এই যে, যারা এতদিন উপন্যাসে নায়ক হতে পারেনি, তারা নায়ক হয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। অন্যদিকে বাঙালি কে ও কারা সে প্রশ্নের সীমানা, বাঙালি জীবনের বিস্তার যে শহুরে মধ্যবিত্ত এবং গ্রামীণ ও দরিদ্র, মূলত হিন্দু জীবনের বাইরেও আরও বহুদূর প্রসারিত তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এ হল বাঙালির সংস্কৃতি বা সমাজচৈতন্যের ঘনীভবনের দিক থেকে লাভ, যদিও আমরা সকলে এই লাভ বিষয়ে সমান সচেতন নই। সাহিত্যের ভূগোল ও সমাজ-বিস্তার আগেও ঘটেছে, দূর দেশ বা দূর কালের মানুষদের আখ্যান পড়ে আমরা মানুষের অস্তিত্বের মূল কথাগুলি যে অভিন্ন, দেশকালের ভেদরেখা দিয়ে সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন নয়—তা অনেক রচনা পড়েই আমরা বুঝতে শিখেছি। কিন্তু এই পৃথিবীব্যাপী মনুষ্যত্বের এক মূল্যবান খণ্ড যে বাঙালি বা বঙ্গভাষী মানুষেরা—তাদের সামগ্রিক পরিচয়ই তো আমাদের অনেকের কাছে অস্পষ্ট।'[১] ফলে এসব বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানবিক এবং বাঙালিত্বের বোধ আরও সমৃদ্ধ হয়। যাঁরা শিল্পকৈবল্যবাদী তাঁরা এ কথাগুলিকে অবান্তর বলে মনে করবেন। কিন্তু আমরা যারা সাহিত্যপাঠকে আত্মচৈতন্যের প্রসার ও ঘনীভবনের একটা উপায় বলে মনে করি, শুধু বিনোদন-নির্ভর সময়যাপনের নয়, তাদের কাছে এ বিষয়গুলিও গুরুত্বপূর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

যতদূর দেখা যাচ্ছে, শামসুদ্দীন আবুল কালামের মূল সৃষ্টিকাল ১৯৫২ থেকে ১৯৭৮। কিন্তু ১৯৬৪-র চোদ্দ বছর পর আর একটিমাত্র উপন্যাস লেখেন তিনি, ওই ১৯৭৮-এ প্রকাশিত হয় জায়জঙ্গল। ফলে কার্যত ১৯৬৪ পর্যন্তই তিনি অব্যাহত রূপে সর্জনশীল ছিলেন, একথা বলা যেতে পারে। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয়—অনেক দিনের আশা (১৯৫২), পথ জানা নেই (১৯৫৩), ঢেউ (১৯৫৩), দুই হৃদয়ের তীর (১৯৫৫)। তারপর ১৯৫৪-তে কাশবনের কন্যা প্রথমে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের ধারাবাহিকতার শুরু হয়। তারপরে কাছাকাছি সময়ান্তরে প্রকাশিত হয় আশিয়ানা (১৯৫৫), জীবন-কাব্য (১৯৫৬), কাঞ্চনমালা (১৯৬১), দুই মহল (১৯৬৪), আলম-নগরের উপকথা (১৯৬৪)। জায়জঙ্গল অনেক পরে সেকথা আগে বলেছি।

এ-বিষয়ে যেটুকু আলোচনা আমরা দেখার সুযোগ পেয়েছি, তাতে লেখকের অন্য গল্প-উপন্যাস খুব একটা মনোযোগ পায়নি, মূলত *কাশবনের কন্যা*-র উপরেই সকলের নজর পড়েছে। তার একটি কারণ, *কাশবনের কন্যা* প্রথম প্রকাশে হইচই ফেলে দিয়েছিল। তার একটা ইঙ্গিত আছে বৈশাখ ১৩৯৪ সংস্করণে লেখকের ভূমিকায়—"নানা দেশের বহু ব্যক্তি এই বইটি সম্পর্কে কেবল আগ্রহই প্রকাশ করেন নাই, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের জন্যও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ১৯৫৬ সালে জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা এ-জন্য আর্থিক সহায়তার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন এবং জার্মান ভাষায় প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে এবং অন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীমতী লীলা রায়ের আগ্রহ সত্ত্বেও বইটি আবার পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রস্তুতের পূর্বে কোনও অনুবাদ সঙ্গত মনে করি নাই। বইটির অসাধারণ সাফল্যর জন্য[২] কেবল গুণগ্রাহীদের নিকটই আমি ঋণী নহি, আমরা দেশ, দেশবাসী এবং তাহার জীবনবাদী জীবনসংগ্রামী সমস্তজনের নিকটও গভীরভাবে ঋণবদ্ধ হইয়া আছি।"

বইটির পাঠকপ্রীতির দিক থেকে ওই অসাধারণ সাফল্য সত্ত্বেও এটি সমালোচকদের কাছ থেকে তেমন উচ্ছ্বসিত সংবর্ধনা পায়নি। অন্তত আমার ব্যবহৃত সীমাবদ্ধ কয়েকটি সূত্র থেকে এই ধারণা হওয়া সম্ভব। বিশেষত মননশীল সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেন এক প্রবন্ধে[৩] বাংলাদেশের উপন্যাসের আঙ্গিক আলোচনা প্রসঙ্গে কাশবনের কন্যা-কে দূরাঞ্চলের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসের অন্তর্গত করেছেন এবং "বিষয় ও শিল্পের জৈবিক সমগ্রতা নির্মাণে অধিকাংশ উপন্যাসই অসফল"—এগুলি সম্বন্ধে এই সাধারণ মন্তব্য করেছেন। এ উপন্যাসটি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ মন্তব্য, "অতি রোমান্টিকতার অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসটির সম্ভাবনাটিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে"।[৪] আমরা জানি না অধ্যাপক হোসেন উপন্যাসটির কোন সংস্করণ ব্যবহার করেছিলেন।

৩

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা *কাশবনের কন্যা*-র পুনঃপাঠ করছি, মূলত পশ্চিমবঙ্গের পাঠকদের জন্য। প্রথমেই লক্ষ করি, সাধারণ উপন্যাসের আখ্যানবয়নের প্রচলিত রীতি থেকে উপন্যাসটির রচনায় লেখক বেশ কিছু নতুনত্ব এনেছেন। এতে পরিচ্ছেদ পঁচিশটি, কিন্তু পরিচ্ছেদগুলি সংখ্যায়িত নয়, এমনকি ক্রমচিহ্নিতও নয়। পরিচ্ছেদ শুরু চিহ্ন হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি অতিরিক্ত পৃষ্ঠা, যাতে সম্ভবত জয়নুল আবেদিনের একটি ছবির ফ্রেমে একটি লোকসঙ্গীত বা কবিতার অংশ মুদ্রিত। আমাদের সংস্করণ প্রস্তুত হয়েছে বইটির 'জয়ন্তী সংস্করণ' (রজত জয়ন্তী?) থেকে, জানি না এই সংস্করণে ছবির এই বিশেষ সংযোজন ঘটেছিল কি না। অর্থাৎ মামুলি ন্যারেটিভ ধরনের একটি গদ্যবর্ণনা ও সংলাপময় উপন্যাস না লিখে লেখক প্রথমেই এটিকে লোক-বৃত্তান্তের আঙ্গিকে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন, লোককথার একটি আবহ তৈরি করেছেন। অজস্র লোকসংগীত, কিছু লোকগল্প প্রচুর গ্রামীণ শব্দ ও গ্রাম্য প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে দিয়েছেন। চরিত্রগুলি সম্পূর্ণতই গ্রামীণ, সম্ভবত বরিশাল অঞ্চলের নদী খালবিল কর্দম-পরিকীর্ণ বৃক্ষলতাবহুল মফস্সলের বাসিন্দা, ফলে এক মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ জীবন যেন প্রায় এক গ্রাম্যগাথার মতো পরিবেশিত হয়েছে। বাখ্‌তিনের হেটোরোগ্লসিয়া, বা বহুস্বরিকতা সম্বন্ধে লেখক অবহিত ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু এ উপন্যাসের নানাবিধ স্বর পাঠকের চোখে না পড়ে পারে না। শুধু বর্ণনা ও সংলাপ দিয়ে এ আখ্যান রচনা করেননি শামসুদ্দীন আবুল কালাম। লোক-সংগীত ও কবিতা থাকছে প্রতিটি পরিচ্ছেদের আগে, ভূমিকা হিসেবে, ভিতরে তো আছেই নানা স্বরবৈচিত্র্য। আখ্যান তো আছেই, আখ্যানের বাইরেও আছে একটি ব্যাপকতর লোকনন্দনতত্ত্বের পরিমণ্ডল।

সম্ভবত এই পরিমণ্ডল রচনার জন্যই খুব সচেতনভাবে লেখক উপন্যাসটি রচনা করেছেন এক কাব্যময় সাধুভাষায়। অনেক আগে থেকেই বাঙালি মুসলমান লেখকের মান্য চলিত ভাষায় লিখেছেন তার মধ্যে সাধুভাষার এই বই যে একটু বিরূপ সমালোচনা পেয়েছিল তার খবর লেখকের ভূমিকাতেই পাই—"প্রসঙ্গত আমার এই জাতীয় রচনার ধ্রুপদী বাংলাভাষার সঙ্গে দেশের আঞ্চলিক ভাষার সমাহার ইঙ্গিতও (ঈস্পিত ও?—প.স.) ইচ্ছাকৃত; আপন জীবনসত্তাকে খুঁজিয়া লইবার জন্য এই মাধ্যম অতি প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি; নিছক 'অনাধুনিক' বলিয়া শ্রেণিভুক্ত করা সময় সময় অত্যন্ত স্থূল অধিকার বলিয়া মনে হয়।"

আমরা লেখকের সঙ্গে একমত। এ উপন্যাসের সমগ্র আবহের সঙ্গে সমন্বিত বর্ণনার ভাষা একমাত্র সাধুভাষা হওয়াই সম্ভব ছিল। উপরের ওই বহুস্বরিকতা ছাড়াও লেখক সাধুভাষাকে বর্ণনায় ব্যবহার করে তাঁর রচনাকে প্রমুখিত বা foregrounded করার প্রয়াস পেয়েছেন, ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছেন।

৪

তবু উপন্যাসে আখ্যান-কাঠামো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এবং সাধারণ পাঠকের কাছে 'গল্পটা কী দাঁড়াল' সেই বিবেচনাই শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের জনপ্রিয়তা নির্ধারণ করে।

এখানে *কাশবনের কন্যা*-র জয়ন্তী সংস্করণ নতুন করে পড়তে গিয়ে বর্তমান সমালোচক আখ্যানের বিবর্তন দেখে একটু বিমূঢ় বোধ করে। লেখকের ভাষা ও অন্যান্য প্রকরণ যেমন ঈপ্সিত ও ইচ্ছাকৃত, তাঁর আখ্যানবয়নও কি তাই? তিনি কি ইচ্ছাপূরক উপসংহার সম্পূর্ণ বর্জন করবেন বলেই এ উপন্যাসের পরিণতি এভাবে নির্মাণ করেছেন? বইটি পড়ে মনে হয় না যে লেখক একদিকে হোসেন-সখিনা বা হোসেন-মেহেরজানের উপাখ্যান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদিকে শিকদার-জুবেদার উপাখ্যান কোনো একটা সুখকর বা আকাঙ্ক্ষিত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। বরং মনে হয়, তিনি যেন ইচ্ছা করে ওই পাঠক-মনোরঞ্জক ও তৃপ্তিবিধায়ক পরিসমাপ্তি থেকে পলায়ন করেছেন, বা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেছেন। তাঁর লক্ষ্যই তা ছিল না। এসব সত্ত্বেও বইটির 'অসামান্য সাফল্য' আমাদের আখ্যান-বিন্যাস ছাড়াও পাঠকপ্রিয়তার অন্যান্য সূত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে।

আখ্যান খুব জটিল নয়। মূলত দু'জোড়া নায়ক-নায়িকার দুটি প্রায় সমান্তরাল উপকাহিনী এ উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। দুই নায়ক পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও নায়িকাদের পরস্পরের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। হোসেনের ক্ষেত্রে দুটি নায়িকা, সময়ক্রমে একে অন্যের অনুবর্তী—সখিনা আর মেহেরজান। শিকদারের ক্ষেত্রে একটি, জুবেদা। হোসেনের উপাখ্যানে হোসেন-সখিনার সম্পর্কের মধ্যে গ্রাম্য প্রেমের চেহারাটাও তত স্পষ্ট হয়নি। সখিনাকে বিয়ে করার কথা হোসেন ভেবেছে অনেকটা হঠাৎ কিশোরী সখিনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, নিজের সাংসারিক প্রয়োজনের কথা হিসেব করে। সখিনার বাবা গঞ্জে আলীর প্রতি তার নিজের বাবার অত্যাচারের স্মৃতিতে তার অনুতাপও হয়তো সখিনার প্রতি হোসেনের মনকে আর একটু নিবিষ্ট করে। কিন্তু তা ঠিক প্রেমের, এমনকি পূর্বরাগের পুরো বিস্তার পায় না। হয়তো ওই সমাজের বাস্তব তার অনুকূল ছিল না। সখিনার বিয়ে হয়ে যায়, অত্যাচারিত হয়ে স্বামীর ঘর থেকে সে ফিরে আসে, তার পরে সখিনার মা হোসেনের প্রতি মেয়ের অনুরাগের কথা জানতে পারে। কিন্তু ততদিনে হোসেন-সখিনার আখ্যান থেকে ছবদার মাঝির ইতিবৃত্তে ঢুকে পড়েছে। সে আর এ খবর পাবে না। যে এ খবর জানল, সেই বন্ধু শিকদার তাকে এ খবর দেবারও সুযোগ পাবে না। হোসেনের জীবনের এই দ্বিতীয় পর্বে তার সমানে আসবে মেহেরজান, এবং মেহেরজানও স্বামী-পরিত্যক্তা এবং গ্রামের পুরুষপ্রজাতির লোভে তার নিরাপত্তা যথেষ্ট অনিশ্চিত। তখন মুমূর্ষ ছবদার মাঝিকে পৌঁছে দিতে আসা সহানুভূতিশীল শক্তসমর্থ যুবক হোসেনের মধ্যে সে যে একটা মুক্তির সম্ভাবনা দেখবে তাতে কোনো বিস্ময় নেই। এখানে মেহেরজানের দিক থেকেই আকর্ষণের সূত্রগুলি প্রথমে তৈরি হয়। কিন্তু এখানেও সম্পর্ককে কোনো পরিণতিতে পৌঁছে দিতে ঔপন্যাসিকের অনীহা আমাদের বিস্মিত করে। হোসেন মেহেরজানকে এবং ছবদার মাঝির আখ্যান ছেড়ে চলে যায়, হয়তো নিজের এবং সখিনার প্রাক্তন জগতে ফেরার লক্ষ্যে। কিন্তু আমরা আর তার খবর পাই না।

উপন্যাসের শুরুতে মনে হয় এটা সম্ভবত হোসেনের গল্প, শিকদার বুঝি বা এক গৌণ চরিত্র হয়ে থাকবে। কিন্তু আখ্যান একটু এগোলে দেখা যায়, শিকদার-জোবেদার আখ্যান অনেক প্রাধান্য পেয়েছে। উপন্যাসের পঁচিশটি পরিচ্ছেদ। শুরুর দিকে তিনটি পরিচ্ছেদে হোসেন-সখিনার সূত্র আসে, শিকদার গৌণভাবে উপস্থিত থাকে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে হোসেনের জীবনে আসে ছবদার মাঝির সূত্র, সেখানে শিকদার নেই। পঞ্চমে শিকদার-জোবেদার গল্প একটু প্রাধান্য পাচ্ছে। কিন্তু এভাবে পৃথক পৃথক নির্দেশ না দিয়ে আমরা হোসেন ও শিকদারের দুটি উপকাহিনীর পরিচ্ছেদ অনুযায়ী তালিকা দিই—

১ হোসেন প্রধানভাবে বিবৃত, শিকদার গৌণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২ হোসেন
৩ হোসেন
৪ হোসেন-ছবদার মাঝি সূত্র আরম্ভ
৫ শিকদার
৬ হোসেন-ছবদার প্রসঙ্গ চলছে
৭ শিকদার
৮ শিকদার
৯ শিকদার
১০ জোবেদা (শিকদার-আখ্যানের অংশ)
১১ হোসেন-ছবদার-মেহেরজান
১২ শিকদার
১৩ শিকদার
১৪ হোসেন-মেহেরজান
১৫ হোসেন-মেহেরজান
১৬ শিকদার
১৭ জোবেদা (শিকদার-আখ্যান)
১৮ জোবেদা-শিকদার
১৯ শিকদার
২০ শিকদার
২১ শিকদার
২২ শিকদার
২৩ শিকদার
২৪ শিকদার
২৫ শিকদার

AMARBOI.COM

এই তালিকায় লক্ষ করি, ২৫টি পরিচ্ছেদের মধ্যে মোট মাত্র আটটিতে হোসেনের মোটামুটি প্রধান উপস্থিতি, বাকি ১৭টিতে শিকদারের গল্প। এতে পাঠক-সমালোচক সকলেই একটু বিভ্রান্তিতে পড়েন। প্রথম পরিচ্ছেদে এই প্রত্যাশা তৈরি হয় যে, হোসেনই এ উপন্যাসের নায়ক হতে চলেছে, শিকদার বড়ো জোর তার সহনায়ক মাত্র। কিন্তু সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকেই হোসেনের গল্পকে পার্শ্বিকতায় ঠেলে আস্তে আস্তে শিকদারের গল্প ছড়াতে থাকে। ফলে কে নায়ক কে উপনায়ক এ সম্বন্ধে ধাঁধা তৈরি হয়ে যায়। এবং দুটি উপাখ্যান আর মেলে না, শিকদার আর হোসেনের জীবনবৃত্ত পৃথক হয়ে যায়, যদিও প্রথম পরিচ্ছেদে অন্যরকম প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত দুটি বা আড়াইখানা প্রেম-সম্পর্কের কোনোটিতেই লেখক পাঠকের প্রত্যাশাপূরণ করেন না। কেন? লেখক কি এর মধ্য দিয়ে কোনো একটা প্রতিবাদ জানাতে চান পাঠক-প্রত্যাশার ছকবাঁধা সূত্রের বিরুদ্ধে? তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে জোবেদা ছাড়া আর কেউ তেমন প্রতিবাদী নয়। জোবেদা সখিনা ও মেহেরজানের তুলনায় অনেক বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জটিল, নিজের ইচ্ছা ও শক্তিতে বিশ্বাসী, কারও প্রত্যাশা না করে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তা যদি তার ধ্বংস ডেকে আনে তা হলেও। শিকদারের প্রতি তার 'হা রে পুরুষ!' উক্তিটি কবি-দার্শনিক-গায়ক, অর্থাৎ বাউলখ্যাপা শিকদারের প্রতি সংগত ধিক্কার—কারণ ইচ্ছাশক্তির এই প্রবণতা শিকদারের মধ্যেও নেই। বস্তুতপক্ষে সমগ্র উপন্যাসেই জোবেদা একটি অত্যন্ত সজীব চরিত্র। শিকদারের বন্ধু মনসব-সর্দার একটি ভালো টাইপ চরিত্র, খানিকটা কবি-র বন্ধু গুমটিম্যান রাজার মতো, কিন্তু এই একমেটে চরিত্রে জোবেদার জটিলতা নেই। শুধু রাজার চেয়ে তার প্রশাসনিক শক্তি ও সে সম্বন্ধে সচেতনতা অনেক বেশি, তা সে জাহিরও করে।

প্রতিবাদ কি এই ইঙ্গিতের মধ্যেও যে, ওই গ্রামীণ বাস্তবে পাঠকের ইচ্ছাপূরক কোনো ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়, ধর্মশাসিত ও লোকাচার পীড়িত ওই গ্রামীণ নিঃস্বতার মধ্যে ওই মানুষগুলির ক্ষেত্রে কোনো ইচ্ছাপূরণ ঘটে না—তাদের জীবন এমনই ভাঙাচোরা থেকে যায়, এবং তাদের নানাভাবে বাস্তব থেকে পলায়ন খুঁজে নিতে হয়—হোসেন যেমন মেহেরজানের সঙ্গ থেকে পালায়, শিকদার যেমন জোবেদার সঙ্গ থেকে। সে এমনিতেই স্থায়ী পলায়নের আশ্রয় পেয়েছিল তার সংগীত ও তত্ত্বচিন্তায়, কিন্তু তা তার ও জোবেদার যুগ্ম জীবনকে কোনো ইতিবাচক সমর্থন দিতে পারেনি।

কিংবা লেখক কি চেয়েছিলেন মৈমনসিংহগীতিকার কোনো একটি ট্র্যাজিক গীতিকার আদলে তৈরি করবেন তাঁর আখ্যান?

আমরা লেখককে 'সংশয়-সুবিধা' বা বেনিফিট অব ডাউট দিয়ে তাঁর মনের কথাটি বোঝবার চেষ্টা করছি—এর জন্য কেউ কেউ সমালোচক উইম্‌স্যাট-এর কথা ধরে আমাদের কাজকে intentional fallacy বলে আখ্যা দিতে পারেন। কিন্তু লেখক কেন এভাবে তাঁর আখ্যানকে গাঁথলেন তা বোঝবার প্রয়োজন আছে।

৫

অথচ গ্রন্থটি আখ্যাননির্মাণের পুথিগত রাস্তা এবং নিটোল গল্প বলার পথ পরিহার করেও প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছে। জয়ন্তী সংস্করণ যদি পঁচিশতম সংস্করণ হয়, তবে একটি উপন্যাসের পক্ষে তা তুচ্ছ ঘটনা নয়। ওই 'অসামান্য সাফল্যের' উৎস তাহলে কোথায় নির্দেশ করব আমরা? কেন সমালোচকদের পুথিগত ছিদ্রসন্ধান, সংগঠনগত ভারসাম্যচ্যুতি এবং ইচ্ছাপূরণকে উপেক্ষা করেও বইটি এমন সাফল্য পেয়ে গেল?

আমাদের ধারণা, এর পিছনে মূলত আছে দুটি কারণ। এক, এ উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনাগুলি পূর্ববাংলার জনজীবনের চরিত্র ও স্বভাবকে এমনই সহজ ও বাস্তব করে এঁকেছে যে, ওই নরনারী ও নিসর্গের সঙ্গে পাঠকের যুক্ত হতে মুহূর্ত দেরি হয় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে হোসেন সখিনা জোবেদা ছবদার মেহেরজান শিকদারের জীবন সম্বন্ধে এখন কিছুই জানি না, কিন্তু আমারও এদের অবিশ্বাস্যরকমের চেনা লেগেছে এবং এদের আশা-হতাশা-স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ ও নানা সুখ-দুঃখের কথা জানবার শুধু ইচ্ছেই হয়নি, মনে হয়েছে সেকথা জেনে আমি মানবিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি। অর্থাৎ আখ্যান নির্মাণে লেখক আমাকে খুশি না করার যে-প্রকল্পই গ্রহণ করুন না কেন, তিনি আমাকে এই আড়ালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকা মানুষগুলির তৈরি জীবনকথা পড়তে বাধ্য করেছেন। আরও অনেককেই করেছেন, নইলে বইটি জনপ্রিয় হল কী করে?

কোন উপায়ে বাধ্য করেছেন আমাকে? তা হল তাঁর বয়ান, গল্পটিকে যে ভাষায় এবং যে ভঙ্গিমায় ও প্রকরণে তিনি বলেছেন সেই উপায়টি প্রায় অনিবার্য ছিল। সাধুভাষায় লেখক লিখেছেন, এবং 'অনাধুনিক' হিসেবে সমালোচিত হয়েছেন—তার উল্লেখ আমরা পাই। কিন্তু মনে হয়, লেখক একটি গদ্য গাথাকাব্য হিসেবে উপন্যাসটিকে ভেবেছিলেন, এবং সে পরিকল্পনায় সাধুভাষা—যা কখনও সহজেই কবিত্বময় হয়ে ওঠে—তার সংগত স্থান করে নিয়েছে। সেই সঙ্গে জুড়েছে—আগেই যেমন বলেছি—লোকগীতি, প্রবচন, গ্রামীণ ভাষা, লোকশিল্পের আঙ্গিকে জয়নুল আবেদিনের ছবি—সব মিলিয়ে এক বিচিত্র বহুস্বরিকতা, কিন্তু গ্রামীণ নিত্যতার মধ্যে আশ্রিত বহুস্বরীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। এর অজস্র উদাহরণ তোলা যায়, আমরা সে চেষ্টা করছি না। পাঠক নিজেই পদে পদে ওই ভাষাবুনোট ও সংগীতময় অন্তঃস্রোতের মুখোমুখি হবেন। শিকদারের ভাষার কদাচিৎ বক্তৃতাধর্মিতাও এই প্রবাহকে ব্যাহত করতে পারেনি।[৫]

আর এটাও ঠিক, লেখক কোনো এক 'বঁধূ'-কে বা বঁধূদের সম্বোধন করে তাঁর আবেগঋদ্ধ নিবেদনে যেমন লিখেছেন যে, "এই দেশ, এই মানুষ, এই প্রকৃতি জীবনের এক তুলনাবিহীন রূপ; এই প্রেম জীবনের প্রতি প্রেমেরই কঠোর কোমল অধ্যায়। যদি মন চায়, সময় করিতে পারো, একবার তাকাইয়া দেখ, আমি কেবল তোমাদের সাদর আহ্বান জানাইয়া রাখিলাম।" তখন ওই সাদর আহ্বানটি দরদি পাঠকের চিত্তে অল্পবিস্তর সঞ্চারিত হয়। ফলে এ উপন্যাসটির পাঠ শুধু বিনোদন নয়, তাত্ত্বিক সমালোচনার দৃষ্টান্ত-সন্ধান নয়, তা দেশের নিসর্গ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা উজ্জীবনের একটা পাঠও হয়ে ওঠে। শিল্প ও জীবনের মধ্যে একটা অদৃশ্য বন্ধন তৈরি হয়।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. এই লেখকের বাঙালিত্বের ধারণা বিষয়ে দ্রষ্টব্য, 'বাঙালি কে?' ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ, ২০০৩, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ৯২-১০২ পৃ.

২. আধোরেখা আমাদের।

৩. দ্র. 'বাংলাদেশের উপন্যাস : আঙ্গিক বিবেচনা' খান সারওয়ার মুরশিদ (সম্পা), ১৯৮১, বাংলাদেশের সাহিত্য, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১০৫-১৮ পৃ.

৪. ওই, ১১৬ পৃ.

৫. এ লেখায় আমি অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী ও গোপা দত্ত ভৌমিকের দু'একটি সহায়তা পেয়ে উপকৃত হয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই গ্রন্থটি পরিমার্জিতরূপে আবারও প্রকাশ সম্ভব হইল প্রথম প্রকাশক এবং আমার বন্ধু ওসমানিয়া বুক ডিপোর স্বত্ত্বাধিকারী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সাহেবের অতুলনীয় সৌজন্যে এবং মুক্তধারার অক্লান্ত হৃদয় শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহার আগ্রহে ও সুজনসুলভ উৎসাহে। নানা দেশের বহু ব্যক্তি এই বইটি সম্পর্কে কেবল আগ্রহই প্রকাশ করেন নাই, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের জন্যও উদ্যোগী হইয়াছিলেন; ১৯৫৬ সালে জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা এজন্য আর্থিক সহায়তার বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন এবং জার্মান ভাষায় প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে, এবং অন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীমতী লীলা রায়ের আগ্রহ সত্ত্বেও বইটি আবারও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রস্তুতের পূর্বে কোনো অনুবাদ সঙ্গত মনে করি নাই। বইটির অসাধারণ সাফল্যের জন্য কেবল গুণগ্রাহীদের নিকটই আমি ঋণী নহি, আমার দেশ, দেশবাসী এবং তাহার জীবনবাদী জীবনসংগ্রামী সমস্তজনের নিকটও গভীরভাবে ঋণবদ্ধ হইয়া আছি। কতকগুলি ভাব ও ভাবনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ করিয়া তাহাদের কাব্যে ধারণের দুঃসাহস দেখাইয়াছি।

প্রসঙ্গত আমার এই জাতীয় রচনায় ধ্রুপদী বাংলাভাষার সঙ্গে দেশের আঞ্চলিক ভাষার সমাহার ইঙ্গিতও ইচ্ছাকৃত। আপন জীবন-সত্তাকে খুঁজিয়া লইবার জন্য এই মাধ্যম অতি প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি; নিছক 'অনাধুনিক' বলিয়া শ্রেণিভুক্ত করা সময় সময় অত্যন্ত স্থূল অধিকার বলিয়া মনে হয়।

AMARBOI.COM

শামসুদ্দীন আবুল কালাম
বৈশাখ, ১৩৯৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঁধুর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল
ঔষধে আর মানে না
চল সজনি যাই লো যমুনায়।
এই বঁধুর কাঁটা বিষম কাঁটা
ঠেকলে কাঁটা খসান দায়
চল সজনি যাই লো যমুনায়।
গৌর অঙ্গ ভূজঙ্গ হইয়া বুঝি
দংশি যাচ্ছে আমার গায়
চল সজনি যাই লো যমুনায়।
প্রেমের বিষে যখন তখন
বঁধুর বিষে প্রাণ যায়
চল সজনি যাই লো যমুনায়॥

AMARBOI.COM

বঁধু, আমি ভুবন ভ্রমিয়া অবশেষে জানিয়াছি, জননী জন্মভূমি বাস্তবিকই স্বর্গাদপি গরীয়সী। যত মালিন্যই তাহার অঙ্গে থাকুক, এই মাটি আমার আপন মা, এর কোল, এই বাতাস আমার নিশ্বাস, আর ঘন নীলরাজিনীমালার ঊর্ধ্বে এই আকাশ আমার ঐশলোক, যেখানে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহ-নক্ষত্রে, নিঃসীম নীলে কিংবা নিত্যনবরূপা মেঘমণ্ডলে আমার সকল জনম ও চরম লীলাভূমি অনাদি-অনন্তকাল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। একদিন আমি আপনাকে পৃথিবীর সন্তান ভাবিয়া সমস্ত সীমা-সীমানা অতিক্রম করিতে চাহিয়াছি; আমি ক্ষুদ্রকে সার করিয়া বৃহৎকে দৃষ্টিতে রাখিতে পারি নাই, আবার বিশাল বিপুল বৃহৎকে দেখিতে গিয়া সেই ক্ষুদ্রকেও অবহেলা করিয়াছি যাহার উপর নির্ভর ব্যতীত কোনো বৃহতের অস্তিত্ব নাই। আমি ঈশ্বরকে সর্বস্ব করিয়া মানুষকে দেখি নাই, আবার মানুষকে সর্বক্ষমরূপে পূজিয়া ঐশবিচ্যুত হইয়াছি। আমি ফকির হইয়াছি, বাউল হইয়াছি; জ্ঞানের উপক্রমণিকার কালেই অধীর হইয়া ভাবাবেগে সব ভাসাইয়া সংকীর্তনে মাতিয়াছি, জীবনের গূঢ় তত্ত্ব তাই আয়ত্তের বাহিরে, বোধেরও বাহিরে রহিয়া গিয়াছে।

অথচ এই ভুবনই আমাকে পথে নামাইয়াছে। কিন্তু আমার জন্মভূমির মতো ঠাঁই অন্য কোনোখানে দেখিলাম না। ভুবন আমাকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়াছে, আবার বাহিরও আমাকে সেই অন্তঃপুরের আহ্বানের দিকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। আমি কবি নই, বাউল নই, একজন অতি সাধারণ মানুষ। জানিয়াছি জীবন-জীবিকা কী নিদারুণ সংগ্রাম, প্রতিমুহূর্তের প্রাণস্পন্দন কত লক্ষ লক্ষ বিষয়ের সুসমঞ্জস গতিবিধির উপর নির্ভরশীল;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কথা সুর-স্বর ভরা সংগীত হইয়া ওঠে না, গীত-কথার মতো মনোহরণকারীও হইতে পারে নাই; জীবনের-ভুবনের অফুরন্ত শোভা-সৌষ্ঠব-সৌন্দর্যের মধ্যে আমরা প্রাণপাত করিয়াও যেন একান্ত হইতে পারি না। তবু, বিশ্বাস করো, চেষ্টার অবধি নাই। আর, বারংবারই মনে হয় তোমার সখ্যতার জন্য আমারও কিছু বলিবার আছে। তুমি হয়তো জীবিকার কঠোর চক্রে পিষিয়া পিষিয়া মরিয়া সার হইতেছ, হয়তো তাহার রূপের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহিবারও অবসর পাও না। তুমি নিজে বাঁচিয়া থাকিবার তাগিদেই হৃদয়-ঘরের বহির্মুখী বাতায়নগুলি বন্ধ করিয়া হয়তো একান্তই আপনাকে লইয়া ব্যস্ত, কিংবা হয়তো দেখিতে গিয়াছ পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছ সিন্ধু, কিন্তু কবি-কথার মতো ঘর হইতে শুধু দুই পা ফেলিয়া ঘাসের উপরে শিশির বিন্দুটির মধ্যে বিশাল ভুবনের প্রতিবিম্বটি দেখ নাই। একবার চাহিয়া দেখ, মনের বাতায়ন পথেই দৃষ্টি মেলিয়া দাও মুহূর্তকালের জন্য—সেই একটি মুহূর্তকাল তোমার হৃদয়ে অনন্তকালের ব্যাপ্তি আনিয়া ভরিয়া দিবে, তুমি মুগ্ধ হইবে।

দেখিও, মনে পড়িবে সেই কোনকালের মহাকবি কালিদাসের কথা : দূরাদয়শ্চক্র তাল-তমালবনরাজি নীলা, আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশি ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা। উত্তর হইতে দক্ষিণে পূর্ব হইতে পশ্চিমে, অঞ্চলে অঞ্চলে ইহার রূপ-বৈচিত্র্যে জীবনের চির যৌবনভার। আবার নিত্য নবরূপ ঋতুতে ঋতুতে। কোথাও রুক্ষ পাহাড়ের গাম্ভীর্য, কোথাও ঘন অরণ্য, কোথাও বা বাবলাগাছ কাঁকরভরা প্রান্তরের বুকে ভরা দ্বিপ্রহরেও রুদ্র রৌদ্রের নৃত্য, কিন্তু সবই উপেক্ষা করিয়া সবুজে-শ্যামে-হরিতে আলোকে ভরা খেতে-মাঠে জনপদে অপরাজেয় অফুরন্ত জীবন গান। মহাসমুদ্রের ঢেউ কোথা হইতে ধাইয়া আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে সোনালি সৈকতে, ঘন নারিকেলবীথি তাহার আবেগের স্পর্শ পাইয়া পৌঁছাইয়া দিতেছে যেন কোনো মহামন্ত্র আরও অভ্যন্তরের দেশে, শস্যশ্যামল খেতে তাই কত ঢেউ, মানুষেরও দৈনন্দিন জীবন-কর্মে সেই একই ছন্দ শতরূপে দৃষ্টিতে ধরা পড়িবে। দেখিও, কী ললিত ছন্দে চাষি বোনে ধান, মাঝি টানে নাও, বউ-ঝি কাদাজলে গোবরে লেপে তাহাদের ক্ষুদ্র মাটির ঘরের ভিত, কেমন করিয়া ভানে তাহাদের ধান, লতাইয়া দেয় সেইসব গৃহস্থালির অঙ্গাভরণের মতো পুঁই কি ঝিঙা, কত সবজির লতাপাতা ডগা। আমি মুগ্ধ হইয়া দেখি, তাহাদের তিনপাড় দেওয়া নীল বসন দুরন্ত বাতাস বিস্রস্ত করিয়া দিতে চায়, কখনও ডালপালার কৌতুকে মাথার ঘন দীর্ঘ কেশজাল ভাঙিয়া পড়িয়া সব লজ্জা ঢাকিয়া দেয়। তাহাদের গলার হাঁসুলি, কাদামাখা পায়ে খাড়ু-মল, শীর্ণহাতে সেই বালা-কাঁকন যাহার দ্যুতি অভিরাম, ঈষৎ আওয়াজে ও চতুর্দিকের সুর-শব্দের সঙ্গে যেন অনন্তকাল ধরিয়া একই লয়ে বাঁধা। তাহাদের বসনের তিনটি রূপালি রেখাও যেন দেশ-প্রকৃতি হইতে অবিচ্ছিন্ন। দেখ না, দেশের শ্যাম-নীল প্রকৃতি অঙ্গ ঘিরিয়া ঘিরিয়া নদীজলের রৌপ্যস্রোত কেমন লতাইয়া লতাইয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি আরও দেখিবে, তবে চল সেইখানে, সেইখানে কবি বলে 'মৃত্তিকা উপরে জলের বসতি, জলের উপরে ঢেউ, ঢেউয়েরই সাথে পবনের পিরিতি, নগরে জানে না কেউরে সখি, নগরে জানে না কেউ,' দেশ-প্রকৃতি সে এইখানে মাখনের মতো মাটির অঙ্গ সবুজ শস্যে-অরণ্যের আবরণে ঢাকিয়া, অসংখ্য খাল-বিল নদী-নালার সহস্র প্রকার সনাতনি হারের মালা পরিয়া বাস্তবিকই গৃহলক্ষ্মী রূপা বধূবেশে সজ্জিতা। অঙ্গে তাহার উদ্ভিন্ন দুরন্ত যৌবন-প্রাণ, লাবণি আবরণের বন্ধন মানে না, যৌবন-জ্বালায় তাহার আসন, তাহার চিত্ত কখনও বেপথু, কখনও অস্থির। ক্রমাগত তাহার প্রতীক্ষা প্রচণ্ড প্রকৃতি-পুরুষপীড়ন। ঘন নীল সমুদ্রপ্রান্তে তাহার গৌরপদের কাছে অজস্র বাসনা বারংবার মাথা কুটিয়া মরিতেছে। আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়া সোনার রৌদ্রে তাহার অঙ্গ তাতিয়া তাতিয়া ওঠে, বাতাসের কৌতুকে অঙ্গবসন খসিয়া খসিয়া যাইতে চায়, খেতে-মাঠে-জলে-স্থলে সব রূপ স্বর ও স্বর অহরহ বাসনাকেই আরও উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। সে যেন স্বয়ম্বরাসজ্জিতা, অথচ সহস্র বৎসরের সাধনার ধনের মতোই রূপবৈভবা, ঐশ্বর্যভূষিতা, চিরদিনের চিরকালের দয়িতা কুমারী রমণী। কাশফুলের চামর দুলাইয়া সংখ্যাতীতা সখিজনও তাহার আশে-পাশে সর্বক্ষণ ঘিরিয়া রহিয়াছে।

তারপর একদিন ওই সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসে এক রুদ্র পুরুষ, দস্যুর মতো, কখনও ঝঞ্ঝার রুদ্র বেশে, বন্যার বেশে; বেপথুব্যাকুলা সেই বধূকে যৌবন মদমত্ত মহাপ্রেমের ক্রীড়া কৌতুকে তাহাকে ক্লান্ত শ্রান্ত বিশৃংখল করিয়া আবারও উধাও হইয়া যায়। সেই বাসনা-বন্যার তুফান অপসারিত হইয়া গেলে সর্বংসহা বধূর মতো এই দেশ সুখাবেশে প্রথম গর্ভিণীর স্নেহ ও গরবে হয় অপরূপা জননীর মতো শান্ত। আকাশে তখন অজস্র আদরের সাদা মেঘ ভাসিয়া ভাসিয়া যায়, নভোনীলিমার আলো মমতা হইয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে, সেই বধূ সম্পদে-সৌষ্ঠবে সাজাইয়া তোলে তাহার সংসার; তাহার সকল জীবন কর্ম-ধর্ম অন্তর সংগীত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে আকাশে-বাতাসে প্রতিটি দিবসে রজনীতে দুঃখকে সে জয় করে, অঙ্গের সম্পদ সে খুশির আনন্দে সোনালি শস্যের আকারে অকৃপণভাবে ছড়াইয়া দেয়। তাহার একক প্রেম তখন মহাপ্রেমের রূপে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য ব্যাপক হইয়া যায়। কিন্তু ক্ষমা সেই রুদ্র প্রকৃতিকে সে সম্ভবত কখনও করে না! তাহার প্রেমের পৃথিবীর সহজ ও সরল, অথচ শৌর্য-বীর্য-মাধুর্যে ভরা। সেই জীবনাচারকে যাহারা ধ্বংস করিতে চায়, তাহাদের উদ্দেশে এখনও অজস্র কবি-কণ্ঠ নানা রূপে উচ্চারিত হয়।

কেন না তাহার প্রতীক্ষা সেই মানুষের জন্যে, প্রেম যাহার বীরব্রত, জীবন। এই দেশ, এই প্রকৃতির কোলে তাহার সন্তানেরা এই মৃত্তিকা রৌদ্রবাতাস-জল ছানিয়া কোলে মাখিয়া বাড়িয়া ওঠে, গড়িয়া ওঠে। তাহাদের কর্মে, তাহাদের কণ্ঠে সেই ভালোবাসারই সুর বাজে প্রতিনিয়ত। কখনও সে গভীর বিশ্বাসে উজ্জীবিত হইয়া বলে, হে ক্ষুদ্র মানুষ, তোমার ক্ষুদ্রতাকে বৃহতের মধ্যে লইয়া যাও, তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া যাও। কখনও তাহাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা-এর বাণী কানে সুধার মতো লাগে বলিয়াই তাহার মানে নিজেদের ধন্য মানে। ভালোবাসা ব্যাপ্ত হয়, কখনও কোনো কন্যার জন্য, কখনও রূপাতীত আরও ব্যাপকতর কাহারও জন্য। তখন কেবল আর মন বাঁধা পড়িয়া থাকিতে চাহে না আত্মসুখে, আসে নিজেকে বিলাইয়া বিশ্বপ্রেমে পাগল হইবার উন্মাদনা। দেশ-প্রকৃতিই তাহাদের সেইদিকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে।

এই দেশ, এই মানুষ, এই প্রকৃতি জীবনের এক তুলনাবিহীন রূপ; এই, প্রেম জীবনের প্রতি প্রেমেরই কঠোর কোমল অধ্যায়। যদি মন চায়, সময় করিতে পারো, একবার তাকাইয়া দেখ, আমি কেবল তোমাদের সাদর আহ্বান জানাইয়া রাখিলাম।

মনের মানুষ না হইলে
মনের কথা কইও না
কথা কইও না, প্রাণ সজনি।
মনের মানুষ না পাইলে
প্রাণের কথা কইও না।
আবার অসৎ এরই এমন ধারা
চোরের নাউ সাউধের নিশানা
মুখের কথায় সব সেরে যায়
কাজে কিছুই না
তুমি শিমুল ফুলের রং দেখিয়া
ঝম্প দিও না
মনের মানুষ না পাইলে
মনের মানুষ না হইলে
তোমার মনের কথা কইও না।

সবেমাত্র মৌসুমের শুরু। রাত্রি বহুক্ষণ যাবৎ দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ। সাধারণত এমন নিশুতিকালে গাঁও-গ্রামের নিস্তব্ধ আকাশে-বাতাসে কোনো দূর হইতে ভাসিয়া আসা বন্য শিয়াল কী কুকুরের ডাকাডাকি ছাড়া অন্যতর কোনো জীবনের সাড়া টের পাওয়া যায় না, আসমানের নক্ষত্র তারকাদল একটা অজ্ঞাত রহস্যালোকের মধ্যে টানিয়া লয় সর্বত্র আর সবকিছু। কিন্তু মৌসুমি বাতাস কেবলমাত্র উতলা হইয়া বহিতে শুরু করিয়াছে, নীচের সাগরের উপর হইতে টানিয়া আনিতেছে বিপুল জলকণাভরা মেঘমালা। প্রথম বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে মোহানা বাহিয়া উপরের দিকে আকুল-ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে মাছের ঝাঁক। এ সময় প্রায় সব গৃহস্থই ডিঙি ভাসাইয়া গাঙে নামিয়া আসিয়াছে। চর্তুদিকে অন্ধকার, মাথার উপর ঝিরঝির বৃষ্টি, সবখানে এত মানুষ যে ডিঙিতে ডিঙিতে প্রায় ঠোকাঠুকি লাগার মতো অবস্থা। বৃষ্টিজলের কণায় কণায় ইতস্তত হারিকেনের আলোগুলিও যেন ঘন কুয়াশার মধ্যে নিস্প্রভ। বৃষ্টির ধীরগতি ঝিরঝির শব্দ ছাড়া কোথাও আর অন্য কোনো স্বর নাই, সাড়া নাই। ডিঙির মানুষগুলি হাতের খোঁটজালের ফাঁদ গাঙে নামাইয়া

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তর্পণে বসিয়া থাকা ছাড়া কোনো অনর্থক বাক্যব্যয়ও করে না। শিকারের কালে সে নিয়ম নাই।

জীবনের দাক্ষিণ্য অপরিসীম। সমুদ্র হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়াইয়া পড়া ইলিশের দল আটকাইয়া পড়িতেছিল প্রায় সকলেরই জালে। এমন 'জোবা' সচরাচর পায় না বলিয়া শিকারিদেরও লোভ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কাহাকেও বা ডিঙির উপর একটার পর একটা মাছ উঠাইতে নেশার মতো পাইয়া বসিয়াছে। গাঙে ঢেউ ছিল না। তাহার কালো জল হইতে নীল রূপালি মাছগুলি ডিঙিতে উঠাইয়া ভরিয়া ফেলিবার আনন্দটাই বহুজনের কাছে মুখ্য লক্ষ্য। ডিঙির উপর সেই মাছগুলি প্রথমে কিছু ছটফট করিয়া ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হইয়া যাইতেছিল।

এ সময় এ অঞ্চলের সর্বত্রই এই ইলিশ মাছ ধরার উৎসব লাগিয়া যায়। কোনো বাড়িতে এমন পুরুষ নাই যে গাঙের দিকে বাহির হইয়া পড়ে না। বউ-ঝিরা তাদের ফেরার পথ চাহিয়া থাকে, মশলা বাটিয়া রাখে, তারপর পুরুষেরা ফিরিয়া আসিলে সেই রূপার মতো মাছগুলি নানাভাবে রাঁধিয়া ভাজিয়া খায়, মোটা চাউলের ভাতের সঙ্গে। বয়সে যাহারা বড়ো তাহারা মাছের লালচে অংশটুকু শিশুদের দেখাইয়া বলে : 'এইটুকু কি জানো? গোটা মাছটার মধ্যে এই জাগাটুকের লাহান মজা অন্য কোনোখানে নাই। হরিণের গোস্ত তো খাও নাই, এই জাগাটুকু সেই হরিণের গোস্তর লাহান মজা। একদিন যামু এ সুন্দরবনের জঙ্গলে। হরিণও ধরিয়া আনমু। আসলে কী জানো? এই ইলিশে আর হরিণে আছিল যেমন দোস্তালি, তেমনি রেষারেষি। হরিণের এই জাগাটুকু নিজের গা থেকিয়া কাটিয়া দিছিল ইলিশের। কেন জানো? দৌড়াড়ি হইয়াছিল দুইজনের মধ্যে। সাব্যস্ত হইছিল যে হারবে সে নিজের গা-এর একটু গোস্ত কাটিয়া অন্যরে দেবে। এমন যে হরিণ, সে-ও গেল ঠকিয়া। কী আর করে, চুক্তি যা হইছে তার তো আর খেলাপ করা চলে না। দিল কাটিয়া এই গোস্তটুকু ইলিশের।' এই সব গাল-গল্প, কথা উপকথা সহজাত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে পল্লবিত। সুন্দর হরিণ ক্রমাগত মানুষ ও পশুর তাড়া খাইয়া খাইয়া জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছে, এই মাছের ঝাঁকও একপ্রকার দিকদিশা হারা হইয়া উপরে উঠিয়া আসে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে গর্ভের ভ্রূণদল রক্ষার তাগিদটাই প্রধান কিনা তাহা লইয়া কেউই বড়ো একটা মাথা ঘামায় না।

অথচ শিকদার তাহার ব্যতিক্রম। যাহা লইয়া কেউরই কোনো ভাবনার অবকাশ নাই, শিকদারকে সেই সবই একরকম ব্যাধির মতো পাইয়া বসিয়াছে, একা মানুষ, নিজের জগতে বিভোর হইয়া ছিল, একমাত্র বন্ধু হোসেনও একা। সে-ই অনেক সাধ্য সাধনা, তর্কবিতর্ক এবং জোর-জবরদস্তি করিয়া তাহাকে লইয়া গাঙের এই শিকার-উৎসবে নামিয়া আসিয়াছে।

: নিজের জীবন রাখার মতো বড়ো কাম আমি আর অন্য কিছু দেখি নাই শিকদার। একের প্রয়োজনে অন্য, এই সৃষ্টির নিয়মটাই এই। তোমার মতো চিন্তায় বসলে কিছুই হয় না। কেউ আসিয়া এক থালা রান্ধাভাত তোমার সামনে আনিয়া দেবে না। আর কিছু না হউক, কিছু হাটে বেচিয়া কিছুকাল চাল-ডাইলের কড়ি জোগানো যাইবে।

সেই শিকদারই এক সময় দূরের দক্ষিণ হইতে আগাইয়া আসা স্টিমারের সার্চ লাইটের আভা লক্ষ করিয়া বলিল: চলো, এইবার ফিরিয়া যাওন যাউক, অনেকেই তো হইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেনও আরও একবার জালটা গাঙে নামাইয়া দিতে দিতে বলিল : বেজোড়টা সমান করিয়া লই। ঠিকই কইছ, ওই অত্তো বড় জাহাজটার দৌরাত্ম্যে বেশ কিছুক্ষণ আর কেউর ডিঙিতে একটাও উঠবে না।

গাঙের জলে ঝপঝপ চাকা খাবলাইয়া, ঘনঘন সিটি বাজাইয়া, সার্চলাইটের আলো ক্রমাগত এইদিক-সেইদিক ঘুরাইয়া স্টিমারটা একদিক হইতে দেখা দিয়া অন্যদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার দু-তিনটা তলা, সব আলোয় উজ্জ্বল। সেই আলোর ঘটায় দিশা খুঁজিয়া মাছ শিকারি ডিঙিগুলি অতি দ্রুত দূরে দূরে সরিয়া গেল। স্টিমার যে-তাণ্ডব জলে তোলে তাহার উপযুক্ত মোকাবেলা করার সাধ্য তাহাদের নাই জানিয়াই শিকারিদের ভিড় অবিলম্বে প্রায় মিলাইয়া গেল। তবু গাঙ্গের ঢেউ যেন খাল অবধি ধাইয়া আসিল। হোসেনের ডিঙি-চালনার দক্ষতা অপরিসীম, গাঙের ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠা ঢেউ গায়ে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িবার আগেই সে বাড়ির পথের খালের মোহনায় ঢুকিয়া পড়িল।

: আন্ধারে দিশা পাইলা না হয়তো, এ ঢেউ পাশাপাশি আসিয়া লাগলে এই ডিঙি মোচার খোলার মতো উলটাইয়া যাইত!

: আমি তো আগেই কইছিলাম—

কিন্তু শিকদারের কথা শেষ করিতে না দিয়া হোসেন নিজের ভাবনাটা ব্যক্ত করিতে চাহিল : এমন যে ইংরাজ তারাও ওই জাহাজগুলি এমন গরজ দেখাইয়া চালাইত না। ভার দিছে এখন দেশি সারেং-এর হাতে। ফলে দারোগার চাইয়া তার চোটপাটের দাপট হইছে বেশি।

: রাজ্য যাগো তারা তো গরম হইবেই। গাঙও দেখো না, এই সুযোগে ফুঁসিয়া উঠিয়া সকলরে কেমন ঠেলিয়া খেদাইয়া দিছে।

হোসেনের কানে সে-মন্তব্য পৌঁছাইল না, অথবা তাহার পছন্দ হইল না। অন্ধকারের মধ্যে হালের কাছে বৈঠা লইয়া সে নৌকার গতি নির্ণয়ে ব্যস্ত রহিল।

বৃষ্টি ইতিমধ্যে থামিয়া গিয়াছে, খালের দুইপাড়ের ঝোপঝাড়ও অন্ধকার, উপরের আসমান চোখে পড়িয়াও পড়ে না।

: হারিকলটা উসকাইয়া একটু সামনের দিকে বাঁধিয়া দেও শিকদার ভাই, তবু যদি কিছু চৌখে পড়ে।

শিকদার হাসিয়া বলিল : ওই জাহাজের লাইটে চৌখ ধাঁধিয়া গেছে। এই অন্ধকারই ভালো, বাতি উসকাইলে হয়তো আর কিছু চোখে পড়বে না।

হোসেন বুঝিতে পারিল কথাটা নেহাত বাজে বলে নাই শিকদার। অন্ধকারের মধ্যেও ঠাহর করা কষ্টকর হইলেও অসম্ভব নয়। পোকামাকড় কী ব্যাঙের ডাকাডাকি, কোনওখানে বা জোনাক পোকার জ্বলা নেভা, মাঝেমধ্যে পাড়ের দুই ধারে দৈত্যের মতো খাড়া কড়ই, পিঠাকড়া কিংবা আম-নারকেলের বাগান যেন দুই দিক হইতেই খালের উপর ঝুঁকিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের ডালপালা পাতা বাহিয়া বৃষ্টিজল তখনও গায়ের উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল।

: উস বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে তো! শিকদার ভাই, কিছু মনে করিও না, একবার তুমি একটু নাওখানা ধরো। আমি দেখি, তাওয়াটা নিভিয়া গেছে না কী! একটু তামাক সাজাইয়া শরীলডা গরম করিয়া লই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: মনে করা-করির কী আছে! তুমি থাকো ওইখানেই, আমি দেখতে আছি।

হুঁকায় গোটাকয়েক টান দিয়া হোসেন বলিল : সত্যই! আচ্ছা, কও দেখি, কী পাগলামিতে পাইছেলে! এরে তারে বিলাইয়াও তো অনেকগুলান থাকিয়া যাইবে।

: এই না ঠিক ছিল হাটে বেচা?

: গাঙে কেমন ভিড় দেখলা না? দশ বিশটা না পাইছে এমন মানুষ নাই। মানুষের গরজ না থাকলে বেচা-কেনারও দর ওঠে না।

: সেইসব তো আগেই ভাবন উচিত আছিল।

হুঁকায় আরও কয়েকটা টান দিয়া হোসেন আবারও বৈঠা হাতে তুলিয়া লইল; দেখন যাউক দেখন যাউক। হাটের ঘাটে জিয়ল মাছের তালাশে জালিয়ারাও আসে। খরিদ্দার তেমন না পাইলে তাগো নৌকাতেই তুলিয়া দেওন যাইবে। তাগো সব এই মুল্লুকে সেই মুল্লুকে চালান দেওয়ার লাইন আছে।

আঁকা-বাঁকা খালের মধ্যে আরও কিছুকাল অগ্রসর হইয়া হোসেন এক সময় ডিঙির গতি মুখ করিল : একটুকাল ইতস্তত করিয়া সে ডিঙিটাকে ভিড়াইল পাড়ের এক ধারে। বিস্মিত শিকদারকে কিছু বলিবার অবকাশমাত্র না দিয়া সে গোটা দুই মাছ হাতে ঝুলাইয়া পাড়ে উঠিয়া গেল।

: শিকদার ভাই, একটু সবুর আমি আসলাম বলিয়া।

: আরে, এমন আচ্‌ককা কোথায় চলল?

: এক বান্ধব বাড়ি, কেবল যামু-আসমু!

শিকদার অবাক হইয়া গেল : তিনকূলে যার কেউ নাই, তার আবার বান্ধব আসলো কোথা হইতে?

হোসেন তখন পাড়ের অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কিছু বলিল কি বলিল না তাহাও বোধগম্য হইল না।

কিছুক্ষণ এদিক সেদিক চাহিয়া শিকদার এলাইয়া পড়িল নৌকার গলুইয়ের উপর। খালের পাড়ের একটা কড়ই গাছের ডালপালাপাতা ভরা মাথাটা আকাশটাকেও তাহার চোখের আড়াল করিয়া রাখিল। কিন্তু বুঝিতে বেগ পাইতে হইল না রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ধীর গতি হালকা বাতাস বহুদূর হইতে ভোরের স্পর্শ লইয়া আগাইয়া আসিতে শুরু করিয়াছে। দুই ধারে তাল নারিকেল গাছগুলি পাগড়িপরা ভূতের মতো মাথা উঁচাইয়া খাড়া। কোথাও হইতে কিছু পাখি-পাখালির কাকলিও ভাসিয়া আসিল।

হোসেন বাস্তবিকই দেরি করিল না। ডিঙির পাড়া খুলিয়া সে আবারও খালের স্রোতে ভাসিয়া পড়িল।

: কী বিত্তান্ত, কোন্নে গেছিলা?

হোসেন সংক্ষিপ্তভাবে জানাইল : কইলাম না, এক বান্ধব বাড়ি।

: কই কোনোদিন তো তেমন কিছু কও নাই।

হোসেন অন্যমনস্কভাবে বৈঠায় টান দিল : এমন কিছু সম্বন্ধ না, সে অনেকদিনের কথা। আগে আছিল আমাগোই গাঁয়-গ্রামে। এখন এইখানে আসিয়া বসতি করছে। এত মাছ! দিয়া আসলাম তাগো কিছু। শিকদার ভাই, বৈঠাখান লইয়া তুমিও না হয় গোটা কয়েক ক্ষেপ দেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার বেশ কিছুক্ষণ বৈঠায় জল টানিয়া পিছনে ফিরিল : কেমন যেন ভাবনায় পড়লা হাওলাদার, বিষয়টা কী কও দেখি।

হোসেন হাসিয়া উঠিল : এই আন্ধারেও তোমার চোখ চলে! কী আবার বিত্তান্ত!

: নাহ, আছে একটা কিছু!

: হ,—হোসেন হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল : থোও কথা! তুমি বৈঠায় গোটাকয়েক জোর টান দেও শিকদার ভাই। জালিয়া নৌকার দেখা না পাইলে এত মাছ ঘরে রাখনেরও জায়গা নাই।

পুবের দিকটা প্রায় ফরসা হইয়া আসিতে শুরু করিয়াছিল। হাটে পৌঁছিয়া বাস্তবিকই তেমন কোনো খরিদ্দারের দেখা পাওয়া গেল না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া শেষ পর্যন্ত জেলে-ডিঙিতেই তুলিয়া দিল সব। নিজের জন্য রাখিল বটে, গোটা দুই, কিন্তু শিকদার নিজের জন্য একটা রাখিতেও অনিচ্ছা দেখাইল।

: না রে ভাই, এমন কাটা ধোওয়া রান্ধন আমার পোষাইবে না। কাটতে বসিয়া কেবলই ওর পেটের কাঁটায় হাত কাটিয়া ফেলি। আমার বাস্তবিকই তেমন কোনো আহইট নাই। বরং দুইটা পয়সা হইলে আমার চাউল ডাইলের খিচুড়িটা জোটবে।

: আহ, এই ইলিশের জন্য দুনিয়া পাগল।

শিকদার হাসিতে লাগিল : জানি জানি বইকী। কিন্তু সেই গীতের কথাই ভালো। শুনাইছিলাম তোমারে?

বাড়ির পথে ডিঙি খুলিয়া হোসেন বলিল : কত গীতগান, কোনটার কথা কইতে আছ ঠিক খেয়াল করিয়া উঠতে পারতে আছি না।

শিকদার গুন গুন করিয়া শোনাইল : সেই সে, মাছের মধ্যে মাছ সে না ইলিশা সে না মাছ, ও তোর রুই মাছ কে চাইছে, চাঁদা পুঁটি ধুরাই না মোদের সংসার রাখিয়াছে।

হোসেন হাসিয়া ফেলিল : হ, হ, এখন আমারও মনে আসছে। তবে ওই কথাগুলি না বাকিটুক। এরপর পরই সে গীতে আছে না, নারীর মধ্যে নারী সেই না গোরা সেই না নারী ও তোর পরী চাইছে কে, শুকনা কালা ভেড়ুয়া নারীই না মোদের সংসার রাখিয়াছে। তাই না?

শিকদার সায় দিল : হ, অনেকটা ওই রকমই। এক এক জনে এক এক বয়ান দিছে, কেবল আদত তত্ত্বটার দিকে কেউরই আর তেমন খেয়াল নাই।

হোসেন সে মন্তব্য গ্রাহ্যে আনিল না : তত্ত্ব-ফত্ত্ব থাউক। তুমি কও দেখি একটা বিয়া করলে কেমন হয়?

শিকদার অন্যমনস্কভাবে কহিল : করবে না।

: কী করবে না?

শিকদার তেমনই অন্যমনস্কভাবে বলিল : বিয়া। ক্ষেপছো! বিয়া করিয়া ঘরে আনিয়া সেই বউরে খাওয়াবা কী? ওই যে কথায় বলে নিজের শোওয়ার নাই জাগা হাউস হইছে কবিলারে সাধা। মোরগো মতো মানুষ হাওলাদার, যাগো চাল নাই, চুলা নাই, বোঝলা হাওলাদার, তাগো কেউ মাইয়া দেয় না। মাইয়ার বাপেও না মাইয়ারাও আংডি-চুংডি হেন তেন না পাইলে বিয়া বইবে না। হয় না, হয় না!

: সকল মাইয়ারাই কী তেমন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার বেশ কিছুকাল ভাবিল; এক সময় যেন আপনমনেই বলিল : যারা সেসব চায় না, হেরা কী যে চায় তা বোঝানের মধ্যে দেবতা দরবেশেরও নাই। মনের মতো কেউরে পাওন যায় না। বোঝলা হাওলাদার—গুণগুণ করিয়া শিকদার হোসেনকে তাহার এক গীতের কয়েকটি কলি শুনাইয়া দিল : দুনিয়াবিতে সকল পাওন যায় কেবল মনের মতো মানুষ পাওন দায়। হোসেন মনে মনে হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিল; মুখে আসিয়া গিয়াছিল বলে যে, যারা পায় না তারাই এমন আপছুছের গীত গান ধরে, কিন্তু সামলাইয়া গেল : দুর, একজনকে দিয়া সকল মাইয়া মানষের বিচার করণ ঠিক হয় না। কিন্তু ধরো যদি তেমন একজন পাওয়াই যায়?

শিকদার বৈঠা থামাইয়া এক মুহূর্ত কী ভাবিল, তারপর আবারও বৈঠা জলে নামাইয়া বলিল : মাইয়ার বাপ, যা হয় ভাই বেরাদার সে মাইয়া দেবে না তোমারে।

: যদি দেয়? অবস্থা-বৈগুণ্যও তো আছে।

শিকদার অনেকক্ষণ পর্যন্ত অবাক হইয়া রহিল।

: এমন আচুক্কা এ সব কথা কও যে?

হোসেন কিছু বলিতে উপক্রম করিয়া আবার সামলাইয়া লইল : নাই, এমনি কইলাম।

শিকদার একটু আশ্বস্ত হইল : হ, কও। এমন কইয়াই যা সুখ!

খালে তখন খালের জোয়ার উঠিয়া পড়িয়াছে, তাহার টানে ডিঙি তরতর করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। ইতিমধ্যে প্রভাতকালের আলোয় চতুর্দিক নিত্যদিনের পরিচিত রূপ লইতে শুরু করিয়াছে। সকাল বেলার হাওয়া চিরকালই শিকদারের কাছে, রাত্রি তাহার অসহ্য। অনেক প্রসন্ন হইয়া সে হোসেনকে ডাকিয়া কহিল : ছাড়ান দেও, হাওলাদার, ছাড়ান দেও। দুইমুঠ ভাত জোটানোর চেষ্টায় যাগো দিন কাটে তাগো ওইসব স্বপ্নন দেখিয়া লাভ নাই। রাত্তিরে যে চান্দ উঠে তা কার না পরাণ উতলা করে কিন্তু দিনের খরা রোদে সেই চিত্ত আর থাকে না। দিনের ঠাটাপড়া রৌদে পিঠ পুড়িয়া যায় না, তাতে জ্বালা না সুখ? রাত্তিরের মিঠা চান্দের হলক তখন মনে হয় মিছা স্বপ্ন। ঠিক কী না? আমাগোও বিয়া করা বউর সাধ সেই রকমই একটা ঠুনকা স্বপ্ন। অভাব দুঃখের জ্বালা ধরানিয়া দিনগুলোই মোগো জন্য সত্য। আর বেবাকই মিছা, একেবারে ডাহা মিছা। ওইসব লইয়া মাথা ঘামানোর কোনোই ফল নাই।

খালে জোয়ারের বেগ তখন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। হোসেন বৈঠার টানে একটু ঢিলা দিল। সে শিকদারের কথা কিছু শুনিল, কিছু শুনিল না। বলিতে চাহিল 'অভাব পীড়িত শ্রান্ত ক্লান্ত ঘর্ম-সিক্ত দিনগুলিই কী জীবনের একমাত্র সত্য? এমন অসহায় আর রুগ্ন দিনগুলি হইতে বাস্তবিকই কোনো পরিত্রাণ নাই? তা হইলে কোন আশায় তাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে? এই ডিঙি বাহিয়া চলিয়াছে? সত্য নয়, সত্য হইতে পারে না। তা হইলে দুনিয়া চলিত না। ঘোর দুঃখের মধ্যেও যে নিমগ্ন ভবিষ্যতের আশায়ই সে বাঁচিয়া থাকার প্রেরণা পায়, সংগ্রাম করে; কেউ হারে, কেউ জেতে। আমি অবশ্যম্ভাবীভাবে পরাজিত হইব, এই ভাবনা কোনোই ফল দেয় না। চাহিয়া দেখো পৃথিবীর দিকে, দিন কাহারও একই রকম কাটে না। শিকদারের সঙ্গে এইখানেই তাহার ঘোর তফাত। ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস সে কোনো মতেই ত্যাগ করিতে পারে না। তাহার সারা সংসার, বাপ-মা-ভাই-বোন যখন দুরন্ত ব্যাধির দাপটে দুই-রাত্রির মধ্যেই শেষ হইয়া গেল, সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, কোথাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সহায় নাই, চারিদিক হইতে দুর্ভাগ্যের তমসা তাহাকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল, তখন মনে হইয়াছিল বৈকী সেই অবস্থা হইতে আর পরিত্রাণ নাই; পিঠ এমনই ভাঙিয়া গিয়াছে যে আর কখনও সিধা হইয়া খাড়াইবারও উপায় নাই। সেই রাত্রিও তো কাটিয়া গিয়াছে। তখন দুই মুঠা ভাত প্রায় ভিক্ষা করিয়া জোটাইতে হইয়াছে। দিন যাপন নির্ভর ছিল অন্যের সাহায্য না হয় করুণার উপর। আজ সে ধীরে ধীরে সেইসব অতিক্রম করিয়া অন্তত নিজের পা-এর উপর দাঁড়াইতে পারিয়াছে। সেই ভাঙা বাড়িটাকেও ফের সাজাইয়াছে, জমিও আছে কয়েক বিঘা। বাড়ির সামনের দরজায় পুকুরটাকেও কাটাইয়াছে নতুন করিয়া, পাড়ে সাজাইয়াছে আম কাঁঠাল নারিকেল-সুপারির বাগান। খেত বাগানের কাম-কার্য যখন থাকে না, এই ডিঙিটাতেই ছই লাগাইয়া সে কেরায়া খাটিতে বাহির হইয়া পড়ে। গীত-গান সে-ও ভালোবাসে অবশ্য, সে উপলক্ষেই তো শিকদারের সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই সব আনন্দ দেউক, একটা পথের না হয় উপায়ের সন্ধান দেউক, তাহার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে কেন। অবশ্য এত করিয়াও হোসেনের জীবনে এখনও স্বাচ্ছন্দ্য নাই, গৃহস্থালি সংসারের বহনেরও সামর্থ্য নাই। তবু আর যাহাই হউক, দুই-মুঠা ভাতও এখন জোগাইতে পারিতেছে। যে অভাবে উপবাসে থাকে নাই সে এই দুই মুঠা ভাতের মূল্য বুঝিবে না। সুতরাং ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখা দরকার। এই যে সেদিন তাহার পায়ের পাতার এইখানে মস্তবড় একটা ময়না কাঁটা ফুটিয়া পাকিয়া টাটাইয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল—যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারে নাই, আহার্যও মনে হইয়াছে বিস্বাদ, ঘোর জ্বরেও পড়িয়া রহিল কয়েকটা দিন। এখনও দেখ, কাঁটাটা বাহির হইয়া গেলেও জখমটা এখনও রহিয়া গিয়াছে, কে জানে চাপাচাপি করিলে হয়তো এখনও পুঁজ বাহির হইয়া পড়িবে। এই কষ্টও তো দূর হইল। তখন মনে হইয়াছিল, দুনিয়া অন্ধকার, বাঁচিয়া থাকার আর কোনোই সম্ভাবনা নাই। কথা হইতেছে বিশ্বাসের, তাকৎ-এর বুকের হিম্মতের। চেষ্টায় মানুষ বড়ো হইয়াছে, আশা পূরণ করতে পারিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় একেবারেই। চেষ্টার হাল ছাড়িয়া দিতে সে কিছুতেই রাজি নয়। এই যে জোয়ারের জল এমন তরতর করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কোনো বাধা সে মানিতে চায়? ভাটার কালে এইরকম দুইকূলভরা জোয়ার বিশ্বাসই হইতে চাহিবে না। জোয়ারের এই গতিতে স্রোতও হয় রূপী হয় আর দুইধারেরও রূপ বাড়ায়। তোমার আমার জীবনেও এই রকম সম্ভব হইতে পারে না?' শিকদার এতক্ষণ হোসেনের কথাগুলি কিছু শুনিতেছিল, কিন্তু অনুমান করিতেছিল। মনের কথা গুছাইয়া বলিতে পারার সাধ্য তাহার নাই বলে, সব ভাবনা তেমন স্পষ্টও নয়।

কিন্তু শিকদার বন্ধুকে জানে বলিয়াই কখনও এইসব কথায় বিরক্তি বোধ করে না, অমনোযোগীও হয় না। একদিক হইতে দুইজনের মনোভাব উভয়ের কাজেই পরিপূরক বলিয়া তাহাদের বন্ধুত্ব কখনো ক্ষুণ্ন হয় নাই। এক সময় সে হাসিয়া জানিতে চাহিল : খালের কথা থাউক। জীবনের মধ্যেও তুমি জোয়ারটা দেখলা কোনখানে? আচ্ছা এইসব কী কও? তেমন দেখতেই হয় যদি আমি তো চতুর্দিকে কেবলই দেখি ভাটার টান। দশটা বছর আগেও গাঁও গ্রামের যে অবস্থা আছিল এখনও তেমন আছে? সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যা আছিল, সবই তো মিলাইয়া যাইতে আছে ধীরে ধীরে। এইটারে তুমি জোয়ারের সঙ্গে তুলনা দেও?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: না, না—সেই কথা না।—হোসেন একটু মাথা চুলকাইল, পাগড়ির মতো বাঁধা গামছার তলায় : না, আমি অন্য কথা কইতে আছিলাম!

: বেশ তো, বুঝাইয়া কও না?

হোসেন বেশ একটুকাল ইতস্তত করিল, এইদিক সেইদিক চাহিয়া খুঁজিয়া লইল কথা : আমি কইতে চাইছিলাম এই বয়সটার কথা। যত ডাঙার হইয়া উঠতে আছি, ততই এইসব মনে উদয় হইতে আছে। এত্তো বড়ো দুনিয়াবীর মধ্যে সাধ-আহ্লাদ মিটাইবার সুযোগ না হয় যদি সৃষ্টিকর্তা পয়দা করছে কী উদ্দেশ্যে? তুমিই কও না, নিশ্চয় এর একটা অর্থ আছে।

শিকদার হঠাৎ কোনো মন্তব্য করিল না, বিষণ্ণভাবে এক সময়ই হাসিয়া বলিল : দেখিও, তোমার মনও যেন কেউ আবার ফকিরালির দিকে টানিয়া লইয়া না যায়।

হোসেন হাসিয়া ফেলিল : নাহ্, তুমি আর মানুষ পাইলা না! দেখি তো তোমারেও, মুর্শিদি মারফতি ধরিয়া তুমিই বা কতটুকু আউগাইতে আছ। নাহ্, দুনিয়াদারির উপর কোনো বিতৃষ্ণা এখনও আমার হয় নাই।

শিকদার স্মিতমুখে জানিতে চাহিল : তোমার কি মনে কয় আমার মনও আর এই দুনিয়াদারির উপর নাই? দুনিয়াটারে ভালোবাসি বলিয়াই তো এখনও তক ফকির হইতে পারলাম না।

হোসেন জবাব দিল না। শিকদারকে একটু খোঁটা দিয়া সে মনে মনে লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল।

শিকদারই ব্যাপারটা হালকা করিতে চাহিল : না মর্দ, তোমার লক্ষণ ভালো না।

: তুমি ভুল বোঝলা!

: মোট্টেই না। আমি পষ্ট দেখতে আছি তুমিও ভাবের কথা শুরু করছ যখন, তখন তোমার কপালও বুঝিবা ফকিরালির দিকে ঠেলতে আছে কেউ।

: কেমন, কেমন!—: হোসেন আগ্রহ দেখাইল : ভাঙিয়া কও।

: ওই যে কেচ্ছা আছে না একটা। বাপে মাইয়ার বিয়া দিবে, কিন্তু মাইয়া কিছুতেই সেই বিয়া বইবে না। বাপে কত চোখ রাঙায়, কোঁদে, কাঁদে তবু মাইয়া অটল। একদিন তার কবিলা ফিসফিসাইয়া কয় কোন জোয়ানের দিকে মাইয়ার মন। বাপ শুনিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রয়, শেষে আপশোশ করিয়া কয়, হায়, হায়, আমার এমন মাইয়ার কপাল লেংড়া ময়জদ্দির দিকে ঠেলছে কেডায়? কেডায় আবার, কয় কবিলা, যার পয়দা তার হুকুমই ঠেলছে। বাপ আবার হাঁ করিয়া চাইয়া রয়, কয় পয়দা করলাম আমি, এখন হুকুম দিতে আইলো কেডায়? কবিলা শাসন করিয়া থামাইয়া দেয়, যার কপালে যেদিক টান পড়ছে, তার পিছে নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তার হুকুম আছে। বাপে কয়, আমি তাইলে কেবল চাইয়া চাইয়া দেখমু আমার মাইয়ার কপাল বাস্তবিকই ময়জদ্দির দিকে ঠেলছে? কিছুতেই তেমন হইবে না।

: হোসেন হাসিয়া উঠিল প্রায় ডিঙি কাঁপাইয়া : নিশ্চিন্ত থাকো শিকদার, নিশ্চিন্ত থাকো, আমার উপর সেইরকম কোনো হুকুমের আছর হয় নাই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঁধু হৃদয় যে আর মানে না বারণ
অঙ্গের যৌবন-জ্বালা না মানে শাসন ॥
শয়নে কন্টক ফোটে, জাগিয়া ব্যাকুল,
তোমারই পিরিতে বঁধু হইলাম রে আকুল
শাওনের মেঘের মতো পরান উতলায়
আমি কেমনে শাসন করি তায় ॥
তোমার অঙ্গের পরশে অঙ্গে ধরল জ্বালা
তোমার নাম হইয়াছে যে আমার জপের মালা
আমি জল আনিতে যাই নদীর ঘাটে
তুমি পবন হইয়া ঢেউ দেও তাতে
কলসি দূরে ভাসিয়া যায়
এখন কূল-কন্যার লাজ রাখা যে দায় ॥
তুমি এমন করিয়া ঢেউ দিও না,
ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না গো
তোমায় করি যে বারণ ॥

ইতিমধ্যে তাহারা বাড়ির ঘাটে পৌছিয়াছিল। শিকদারকে নামাইয়া দিয়া হোসেন নিজ ঘাটে চলিয়া আসিল।

মৌসুমি বৃষ্টির কাল, এই বৃষ্টি, এই রৌদ্র, বৃষ্টির মেঘ কাটাইয়া তখন বেলার রৌদ্র ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে চতুর্দিকে। হঠাৎ বেড়ো চোখে পড়ে; কিন্তু একই সময় সজীব করিয়া তোলে মন-প্রাণ। উঠানের এক ধারে জালটা মেলিয়া দিয়া হোসেন দাওয়ার উপর বসিয়া রহিল একটু কাল। দৃষ্টি আটকাইয়া রহিল হালটের অপর পাড়ের শূন্য বাড়িয়ালটার দিকে। সেই বাড়ির সখিনা এখন যেন সেই রৌদ্রের মতোই ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে।

শিকদারকে সে কথাটা খুলিয়া বলিতে সংকোচ বোধ করিয়াছে। সে-ও অবশ্য খেয়াল করিয়া থাকিবে জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের ফলেই ওই বাড়িয়ালটা এখন শূন্য। তাহার বাপ মুজফ্‌ফরই এক রকম জোর করিয়া উঠাইয়া দিল ওই ভিটা হইতে সখিনার বাপ গঞ্জে আলীকে, দায়-দেনা শোধ করিতে না পারার জন্য। মুজফ্‌ফরের উপর অন্য রকম চাপ পড়িয়াছিল। তবু সে যা-ই হউক গঞ্জে আলী কি সেই বিবাদ কোনোদিন ভুলিয়া যাইতে পারিবে!

মাত্র সাত আট বছর আগের বিষয়। যেখানে এখন হোসেনের ধুলট কৃষির খেত সেইখানেই ছিল তাহাদের ভিটা বাড়ি। হালটের উপর বাঁশের কেঁচকি দিয়া লম্বা সুপারি গাছের সাঁকো। তাহার উপর দিয়া নিত্য ছুটাছুটি, হালটের জলে ঝাঁপাঝাঁপি। কখনও বা পাড়ের সিঁদুরে আম গাছে না হয় জাম গাছে উঠিয়া নীচে দাঁড়ানো সখিনার দিকে লক্ষ করিয়া তুলিয়া দিত ফলগুলি। সিঁদুরে আমগুলি হাত ফসকাইয়া হালটে পড়িয়া গেলে নামিয়া সেইগুলি আবারও তুলিয়া আনিত ডুব দিয়া দিয়া। কেবল চাহিয়া দেখিতে পারিত না তাহার চালিতা খাওয়া। চৈত্রমাসে যখন ধানের খেতও ফাটিয়া চৌচির, হালটের জলও কমিয়া কমিয়া একেবারে তলায় গিয়া জমিয়াছে, তাহার মধ্যে ছোট ছোট পুঁটি, ট্যাংরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর চোলাগুলি মাথা তুলিয়া ছুটাছুটির আনন্দে মাতিয়া উঠে, সেইকাল—যখন চতুর্দিকে কেবল ঠাঠা রৌদ্রের খরা, বাতাসও বহে না, গাছের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপে না, সেই সময় তাহার চালিতা খাওয়ার ধুম। সেই চালিতার কোনটা যে কাঁচা আর কোনটা পাকা তাহা বুঝিয়া উঠিতে হিমশিম খাইয়া যাইত হোসেন। সখিনা সেই চালিতা এতখানি মরিচ আর এতখানি লবণ মাখাইয়া কচকচ না হয় চাকুমচুকুম করিয়া খাইত মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া। দেখিয়াও হোসেনের দাঁত শরীর শিরশির করিয়া উঠিত। কেবল কেবল সেই চালিতা পাড়িয়া কাটিয়া ছেঁচিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িত সে, শেষ পর্যন্ত বোকার মত রাগিয়া যাইত, ছুড়িয়া ফেলিত হাতের চালিতা আর দা; আমি আর পারমুনা' বলিয়া সাঁকো পার হইয়া বাড়ি চলিয়া আসিত। সখিনা অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত। তখন কে জানিত, এখন এতগুলি বছর বাদে তাহাকে আবার দেখিয়া হোসেন এমন চঞ্চল হইয়া উঠিবে?

এখন আরও স্পষ্ট হইয়া ওঠে নানারকম অতীত কথা; মনে হয় যেন এমন করিয়া আর কখনও দেখা হয় নাই।

সেই শেষ ফাল্গুনের কথা। বাড়ির উঠানের একধারের মাদার পলাশের গাছগুলিতে যেন হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার চাইতেও বেশি জ্বলিয়া উঠিল তাহাদের দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ, বিষয় সম্পত্তিগত নেহাত আদনা ব্যাপার লইয়া। ধুম কাজিয়ার সঙ্গে বাহিরের লোকজনও যোগ দিয়া ঘটনাটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। দুই পরিবারের মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। খালের ঘাটে সখিনার কাছাকাছি হইয়া হাসিবার দেখা করিলেও সে মুখ ঘুরাইয়া উঠিয়া চলিয়া যাইত। কিছুকাল পরেই চেষ্টা গেল গোটা পরিবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে আর হোসেন-এর বাপ মুজফ্ফর চাল-বেড়া ভাঙিয়া শূন্য ভিটামাটিকে চষিয়া খেত বানাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসাবাদ করিবে কী, বাপের তাড়নায় তাহাকেও সেই কর্মে যোগ দিতে হইল।

তবু খোঁজ খবর রাখিয়াছিল বলিয়াই একটা অজুহাত লইয়া গঞ্জে আলীর বাড়ি উপস্থিত হইয়াছিল। কিছুটা আগে ভাগে ঠিক করিয়া, কিছুটা ঝোঁকের মাথায়। এমন বন্ধু শিকদারের কাছে কথাটা বলি বলি করিয়াও নানা সমস্যাতে বলা হয় নাই। বিষয়টা এমন নয় যে ওই সখিনার অভাবে তাহার জীবন খাক হইয়া যাইতেছে, কিন্তু অমন তাজা একটা বউ সংসারে আসিলে হোসেনের তাকত-হিম্মত যেন আরও বাড়িয়া যাইত। সে নিজের জীবনটাকেও ওই বন্ধু শিকদারের মতো কখনও শ্রীহীন করিয়া তুলিতে চায় না, চায় নাই।

সেই শিকদারের সঙ্গেই দেখা। অন্যমনস্কভাবে এই দিক সেই দিক ঘোরাঘুরির কালে হয়তো একটু ফিটফাট হইয়া বাহিরে নামিয়াছিল বলিয়াই শিকদারের মুখে চোখে একটু রহস্যের হাসি খেলিয়া গেল। অথবা এমনও হইবে যে হোসেনই সেই রকম দেখিল; একবার যে আবারও গঞ্জে আলীর বাড়ির দিকে যাওয়ার কথা মনে হয় নাই তাহাও তো নয়, তবু সে শিকদারের কাছে ধরা পড়িতে চাহিল না।

: কোথায় আর যামু, তোমার ওই দিকেই রওনা হইয়াছিলাম।

: উহুঁ!—শিকদার তামাশায় মাথা দোলাইল : না, না মর্দ, ফাটকি দিও না। এমন সাজন গোজন-এর নিচ্চয় একটা তত্ত্ব আছে, উদ্দেশ্য আছে।

হোসেন অপ্রস্তুতভাবে মুখ নামাইল। এই রকম সবকিছুর মধ্যেই তত্ত্বের উদ্দেশ সব সময়ই যে তাহারও প্রিয় প্রসঙ্গ হইবে এমন মনে করার কোনো হেতু নাই। উঠানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একধারে সামান্য শাক-সবজির খেত মাচানগুলিকে পরিচর্যা করিতে গিয়া যে বেশ একটু বৃষ্টি-বাদলায় ভিজিয়াছে, উদলা গায়ে কাদামাটি ছড় আঁচড়ের খেয়াল রাখে নাই, এক সময় একটু শীত শীত বোধ হওয়ায় নিজেকে একটু সাফসুফা করিয়া পিরহানটা গায়ে তুলিয়াছে মাত্র; কোনোখানে যাইবার তেমন কোনো উদ্বেগ নাই। শিকদার অবশ্য তাহার সেই সব ব্যাখ্যায় কান না দিয়া 'সুজন বন্ধু যায় বাণিজ্যে যায়, ময়ূরপঙ্খী বাদাম খোলে, হংস যেমন পাখনা মেলে—' অথবা ওই জাতীয় কিছু গুনগুনাইয়া উঠিলে সে বাস্তবিকই খুব প্রীত হইত না। যে-উদ্দেশ্যে শিকদারের বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়াছিল, তাহাতে বহু রকম সংকোচের জড়তা আসিয়া গেল।

: চলো, সাঁঝ নামিয়া আসছে, ঘরের বারিন্দায় উঠিয়া বসন যাউক।

উঠানের একধারে আম-জাম-শিমুলের তলায় শিকদারের ছোটো ঘর; তাহার কোনো খানেই বিশেষ তেমন কোনো যত্ন নাই, মাটির 'হাতিনা'র উপর শনের মাদুরটারও টুটা-ফুটা দশা, কোন যুগের একটা কাঁঠাল তক্তার পিঁড়া সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হোসেন খুঁজিয়া বাহির না করিলে হয়তো কখনওই চোখে পড়িত না।

তবু বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া হোসেন তাহার ভাবনাগুলি শিকদারের সঙ্গে যাচাই করিতে চাহিল। ঘর-গৃহস্থালিই হউক কি একজন পুরুষ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই হউক একজন গৃহিণী না হইলে চলে না। শিকদারের তুলনায় হোসেন একজন হালকা মেজাজের কেউই হইবে বা, কিন্তু বেশ বুঝিয়া উঠিয়াছে, এইভাবে একা একা আর দিন কাটাইতে পারে না। এখনই সময়, বুঝিয়া-শুনিয়া একটা কিছু করিতে হয়। কোনোখানে তেমন কাহাকেও চোখে পড়ে না বলিয়াই সে গুঞ্জে আলীর কন্যা সখিনার কথাটা মনে মনে বিবেচনা শুরু করিয়াছে, তেমন কোনো বান্ধব তো কেউ নাই, তাই শিকদারের পরামর্শ ছাড়া আর যেন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

শিকদার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো মন্তব্য করিল না, একবার বিষয়টা তরল করিবার জন্য কিছু বলিবার উপক্রম করিয়াও থামিয়া গেল, তারপর হাঁটুর উপর দুই হাত বাঁধিয়া উঠানের একধারে নির্নিমেষে তাকাইয়া রহিল।

: তুমি হয়তো মনে করবা আমি ডুবিয়া ডুবিয়া পানি খাই, না হয় ওই সব কিছু। –হোসেন আরও একটু ব্যাখ্যা দিল : সেই রকম কোনো ঘটনা নাই। আসল কথা, ঘরে একটা মাইয়া ছেইলা না থাকলে কোনো শ্রী ছাঁদই যেন আসে না। আগে এমন দরকার বোধ করি নাই, এখন দিনে দিনে কেমন যেন অস্থির হইয়া পড়ছি। হ, এইরকমই বলা ভালো, কেমন চঞ্চল হইয়া পড়তে আছি। কী জানি, হয়তো এরই নাম হইবে সেই যৈবন, তুমি যার কথায় কও পদ্মপাতার উপর পানির মতো টলমল, এই কালে থির থাকন তার স্বভাবে নাই। আমি আসমান-জমিন, কোলা-খেত-মাঠ, খাল-বিল, ঘর-বাড়ি, মানুষ-জন, গাছ-গাছালি, জন্তু-জানোয়ার, পশু-পাখালি যেইদিকেই দেখি, একটা বাসনাই যেন চৈত-বৈশাখের ভাপের নাহান পুড়িয়া পুড়িয়া দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠতে চাইতে আছে। বিষয়টা সুখের না, একটা বিহিত করতেই হয়।

হোসেন জানে বইকী বিলক্ষণ, এইরকম একটা অভাববোধ হয়তো শিকদারেরও মনে আছে, কিন্তু জীবনে একটা ঘা খাইয়া সে আর কাহারও উপর বিশ্বাস আনিতে পারে নাই, পারিবে না। তবে সকল মেয়ে মানুষই যে একই রকম হইবে তাহার কথা কি পুথি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেতাবে আছে? যদি তাহাই হইত, চলিতে পারিত দুনিয়াজোড়া এত এত মানুষের সংসারধর্ম? সুখ কি কাহারও নাই, কিছুই নাই?

শিকদার মুখ ফিরাইয়া হাসিতে চাহিল, আবারও তাহার মুখে কোনো তরল কথা জোগাইল না; উঠিয়া সে দোতারাটা লইয়া আসিল; টুং টাং আওয়াজ তুলিয়া সে ধীরে ধীরে একটা গীত ধরিল :

সুজন বঁধু, প্রেম করিওনা না করিয়া ওজন।
ইলিশ মাছ কি বিলে থাকে
কিলাইলে কি কাঁঠাল পাকে গো?
বল্লা কি যায় মধুর চাকে
ভেঙ্গুর কি যায় মধুবন,
প্রেম পিরিতির এমন ধারা।
যেন জাতিসাপের লেজে ধরা।
উলটিয়া ছোঁ মারিলে
সখা, বাঁচবে না তোর এ জীবন!

হোসেন একটু অসহিষ্ণু ভাব দেখাইল : দূর, ওই সব প্রেম-পিরিতির কথা না বয়াতি ভাই, প্রয়োজন, আমি গরজের কথা কইতে আছি। তোমার কাছে শোনা গীতের কথা আমিও উল্টা করতে পারি :

ওরে রসগোল্লার স্বাদ পাবি কি তুই
চিটাগুড় খাইলেই
কিঞ্চিৎ মধু পাবার আশায়
ঝাঁপ দিলি তুই বল্লার বাসায়
তোরে বল্লায় কামড়াইলে!

বয়াতি ভাই, আমার চাইয়া এলেম-তালেম তোমার অনেক বেশি। ফস করিয়া কোনো কামকায্য তোমার স্বভাবে নাই। অনেক ইচ্ছা, অনেক কষ্ট তুমি মনে মনে সহ্য করার ক্ষমতা রাখো। আমার সেই শক্তি নাই, সত্য কি জানো, কোনটা মধুবন আর কোনটা বল্লা কি ভেঙ্গুর, সেইসব তবধও আমার মনে ভালো করিয়া পয়দা হয় নাই, বোধ করি হইবেও না। সেই জন্যই তো তোমার পরামর্শ চাই। এখন যে-বয়সের যা ধরম, তা মানিয়া না চললে আমারও আরও আউল-বাউল হইয়া যাওয়া ছাড়া গতি নাই! আমার মনে কয় না, দুনিয়ার সব মাইয়া মানুষের একই প্রকৃতি, একই স্বভাব। তারা সংসারের শোভা, তাগো ছাড়া এইরকম শূন্য শূন্য জীবন, এই রকম দিন গুজরানির কোনো অর্থ হয় না। তোমার মনে কোনো পুরানা কথা আমি খোঁচাইয়া তুলতে চাই না। তবু তোমার চুপ করিয়া থাকলে চলবে না। একটা পরামর্শ দিতে হয়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার দোতারাটা কোলের উপর হইতে সরাইয়া রাখিল; বেশ কিছুক্ষণ পরে হোসেন-এর দিকে সস্মিতভাবে তাকাইয়া বলিল : কেবল একটা মাইয়া মানুষ দিয়াই সংসার হয় না, একজন পুরুষ মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা হিম্মত-তাকতও বোধ করি যথেষ্ট না। তবু দুঃখ থাকে। সেই সুখ কেমন করিয়া কাটান যায় তা নিয়া আমারও তো জিজ্ঞাসার শেষ নাই।

: তত্ত্ব-কথা থাকুক, একটা সমূহ পরামর্শ চাই।—হোসেন আবারও অধৈর্য দেখাইল। শিকদার তাহার স্বভাবসিদ্ধভাবে আরও কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করিয়া ধীরে ধীর বলিল

: তুমি যেন অন্ধের কাছে পথের ঠিকানা চাইতে আছ। তবু বলি, কথাটা যখন এমন করিয়াই তোমারে আশ্রয় করছে বেশ একটু বিবেচনা দরকার। ফট করিয়া কোনো কিছু করা কি ঠিক হইবে? দেখো, শোনো, বেশ একটু খোঁজখবর লও। তোমার ইচ্ছার কথা বোঝলাম, কিন্তু ওই তরফের মনোভাবটাও তো বুঝতে হইবে!

আপাতত সেই বিষয়টাই হোসেনকে বেশি অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। হঠাৎ করিয়া কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার ইচ্ছা তাহারও ছিল না। প্রথাসম্মতভাবে, এইসব ক্ষেত্রে যেমন দস্তুর, সে ঘটকালির কথাও চিন্তা করিতে পারিত; কিন্তু তাহার অসীম সাহসের পিছনে যেন এক ভীরু শিশুচিত্তও লুকাইয়া ছিল। সখিনার বাপ-মা রাজি হউক বা না-হউক, সে যে অন্য কাহারও দয়িতা, সেই রকম একটা আঘাত যেন সে-ও এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছিল। সুতরাং নানারকম দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার পর সে স্বয়ং তাহাদের খোঁজখবর লইতে যাওয়াই মনস্থ করিল।

এক শিকদার ছাড়া জানাইবার মতো কেউ ছিল না, কিন্তু তাহাকেও জানাইল না।

গঞ্জে আলীর বাড়ির ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া উঠানের পাড়ে আসিতেই চোখ পড়িল, উঠানে ধান মেলিয়া দিতেছে সখিনা; কেবল পুষ্ট পুষ্ট ধানই নয়, সখিনাও যেন প্রখর রৌদ্রে তাহার চোখ ধাঁধাইয়া দিল। ঘন সুপারিবনের আড়ালে দাঁড়াইয়া, সখিনার সেই আধা-উবু হইয়া দুই হাতে ডাইনে বাঁয়ে ধান মেলিয়া দিবার ছন্দে সে এক রকম আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। সম্ভবত কোনো সময় কোনো শব্দ হইয়া থাকিবে, সখিনা তাহার উপস্থিতি টের পাইয়াই চমকিয়া গেল।

: আরে, তুমি ওইখানে? কী মনে করিয়া? কখন আইলা?

সখিনা কোনো উত্তরের অপেক্ষা করিল কি করিল না, গায়ের আঁচল মাথায় টানিয়া সে দ্রুতপদে ঘরের হাতিনার দিকে আগাইয়া গেল। তাহার হাতের চুড়ি বাজিল, পায়ের মল-এর ধ্বনি যেন আরও মুখর হইয়া উঠিল। আসো, আসো, বসো আসিয়া, মা-য়রে খবর দিই।

হোসেন ফস করিয়া বলিল ফেলিল : নাহ, বসার ইচ্ছা নাই।

: ক্যান?—সখিনা মুখ ফিরাইয়া উত্তর খুঁজিল।

তাহার সেই দৃষ্টি যেন বড়ো পুকুরের মতো টলটল, আরও গভীর, সেই দৃষ্টি পুকুরের মতোই বুকে কাঁপন ধরাইয়া বহিয়া গেল। হোসেন তবু বলিয়া গেল : ক্যান না! যা পর পর হইয়া গেছি; আমারে দেখিয়া অত্তো বড়ো ঘোমটা তো কক্ষনো টানিয়া দেও নাই!

: ও! সখিনা মৃদু হাসিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে উঠিয়া গেল; কপাটের আড়াল হইতে উঁকি দিয়া আরও বলিল : বসো, বসো তুমি, মা-য়রে খবর দিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই রকম কোনো ইচ্ছা থাকুক বা না-থাকুক, অন্য কিছুই করিবার ছিল না। কিছুকাল পরেই হাতিনার উপরকার কপাটের আড়ালে সখিনার মা-এর সাড়া পাওয়া গেল; মনে হইল পা-এর বাতের ব্যথা লইয়া কোনো রকমের স্বচ্ছন্দে বসিতে উদ্যোগ করিয়াছে। সখিনাও ঘরের মধ্যে থাকিয়াই তাহার সম্মুখে পানদান আর কয়েকটা পান আনিয়া দিল।

সাধারণ কুশলবার্তাদি জিজ্ঞাসার পর সখিনার মা তাহার শারীরিক বৈকল্যের দীর্ঘ ইতিহাস বলিতে শুরু করিল; কোথায় কোন কোন কবিরাজ কী ডাক্তার দেখানো হইয়াছে, কত কত হাত দর্শনি হইয়াছে এইটা-সেইটা বেচিয়া, কে কোন ঔষধ বা বড়ি না হয় পটপটি কোন কোন অনুপানের সঙ্গে খাইতে বলিয়াছে, সেই সব খুঁটিনাটিও তাহার বর্ণনা হইতে বাদ পড়িল না। সেইসব শিকড়-পাতা কি গাছ গাছালির বাকলের কোনো অভাব ছিল না পুরানো বাড়িতে, কিন্তু এই বাড়িতে কিছুই নাই; মানুষের আর এই জাতীয় ঔষধের উপর বিশ্বাসও বড়ো নাই।

হোসেন খুব মনোযোগ দিয়া সব শুনিবার ভান করিতেছিল বটে, কিন্তু কাছাকাছি আবডালে বসা সখিনার দিকেই দৃষ্টি যাইতেছিল ঘুরিয়া ঘুরিয়া; মনে হইল সে-ই একসময় মা-এর হাত ঠেলিয়া পানদানটা আগাইয়া দিল।

: তা এখন এমন ডাঙর জোয়ান, ঘর-সংসার নিশ্চয়ই করছ—জিজ্ঞাসা করিল সখিনার মা। সেইদিন যখন মাছ দিয়া গেলা তখন ভালোমতো সংবাদ লইবারও সুযোগ হয় নাই। তা কোথায়, ছেলেমাইয়া হইছে?

হোসেন একটু বিব্রত বোধ করিলেও দৃষ্টি ফিরাইয়া মাথা নাড়িল : বিয়াই করি নাই চাচি, এ সব ঘর-সংসারের ভাগ্যে সকলেরই হয় না।

: সেইটা কী কথা! একেবারে পথের ফকিরও তো কেউ তোমাদের কইবে না।

হোসেন একটা পানের খিলি আঙুলে ভাঁজ করিয়া বলিল : যা দিনকাল পড়ছে চাচি, এখন দুইবেলার ভাত জোগানই দায়। খাওয়ামু কী বিয়া করিয়া?

সখিনার মা একটুকাল বিস্মিত হইয়া রহিল : শোনো, কী আজব কথা। কত ঘর-সংসার দেখি, দেখতে আছি চতুর্দিকে, তোমার লাহান জোয়ান মানুষ কে কোনখানে সংসার-ছাড়া পড়িয়া রইছে? হঠাৎ সখিনার দিক হইতেও একটা শ্লেষ ভরা প্রশ্ন আসিল : ক্যান, বউ বুঝি কেবল খাইতেই ঘরে আসে? হোসেন একটু সময় লইয়া ধীরে ধীরে বলিল : সেইখানেই তো কথা। ভালো অশন-বসন, আঙটি-চুঙটি, বাহারের পালঙ্ক, কত রকম চাহিদা, দেখি তো চতুর্দিকের অবস্থা।

সখিনার দিক হইতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ আসিল : জ্বী না, সব মাইয়া ছেইলাই তেমন আহট লইয়া সংসারের যায় না। যায়ও যদি তার জন্যও ডেনার জোর রাখতে হয়। এখন আর সেইদিন নাই, সকলরেই সংসার সাজাইয়া গুছাইয়া লইবার ভার নিতে হয়।

সখিনার মা বলিল : তা চিন্তা ভাবনা ভালোই; তবে এখনও বিবাগী হইয়া থাকন কোনো ভালো লক্ষণ না। এই-ই তো সময়, দেখিয়া-শুনিয়া একটা ভালো মাইয়া ঘরে আনিয়া সব কিছু গুছাইয়া লইতে মন দেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন মাথা নিচু করিয়া মেঝের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া রহিল; অনেক চিন্তা-ভাবনার পর একটু হাসিতে চাহিল : হে, চাচি, যেমন কপাল লইয়া জন্মাইছি, তাতে আমার মতো গবির-গুর্বারে কে-ই বা কার ভালো মাইয়া দিতে চাইবে?

সখিনার মা গালে হাত দিল : এইটা কোনো কথা হইল? তুমি বসো বাজান, খাওয়া-দাওয়া করিয়া যাবা, সখিনার বাপেরও কাম-কায্য থেকিয়া ফিরিয়া আসার সময় হইল। গরিবের ঘর, তবু দেখি কিছু ভালো-মন্দর কী জোগড় করন যায়।

হোসেন আপত্তি উঠাইল : না, না, চাচি, আমারে এমন আস্তিকের কোনোই প্রয়োজন নাই। ত্বরাত্বরি বাড়ি ফিরতে হইবে, অনেক কাম-কায্যের উদ্বেগ আছে।

কপাটের আড়ালে থাকিয়াই সখিনা একটু অভিমান দেখাইল : তবে আইলেনই বা ক্যান এমন খোলা পাহায় দিয়া? মন বসে না, সেই আসল কথাটা কইলেই হয়!

হোসেন একটু চমকাইয়া গেল। সখিনা কি বাস্তবিকই সেই কথাগুলি বিবেচনা করিয়া বলিতেছে? মন চাহিল বলিয়াই তো সে আসিয়াছে, না কি অন্য কিছু? মন তো চায় সে সব কিছু ঢিলা দিয়া একদম অবশ হইয়া বসে মাথার পিছনে দুইহাত বাঁধিয়া এই হাতিনার উপরেই নেতাইয়া পড়ে, আর সখিনা সেই ছোটকালের মতো নানান কথা বলিয়া যাউক, রাত্রির অন্ধকার আরও তাড়াতাড়ি নামিয়া আসুক, মিটিমিটি করিয়া তারা নক্ষত্র জ্বলে উঠুক আকাশে, এইদিক সেইদিকের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে জোনাকির দল আসুক ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কিন্তু সেই শক্তি যেন আর জীবনে কোথাখানে নাই। মন বসিত, যদি সে পারিত আবার সেই শৈশব দিনের সব রকমের কল্পকথা অবাধে সখিনার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পাইত। সেই যে কত কত ছাড়া বাড়ির জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া ফলমূল তালাশ করা, এইখান-সেইখান হইতে সব ভয় বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া জঙ্গলের হোনকাইচ খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিছা মিছা রত্নের ভাণ্ডার সাজানো, খালের জলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া মাছ ধরার উল্লাস, এই রকম দিনে খালের অথবা বিলের পাশে পাশে কাশফুলের গুচ্ছভরা ঝোপে ঝাড়ে ডাহুকের ডিম না হয় কেয়াফুলের সন্ধান, কেবলই খুঁজিয়া ফেরা কোনখানে আছে কোন পাখির বাসা, কোনখানে থাকে ব্রহ্মদৈত্য আর কোনখানেই বা প্রলয়ঙ্কর আজদহা অজগর— এইসব তো এখনও মনে হয় মাত্র অল্প কিছুদিনের ঘটনা। এখনও তো তাহার স্বপ্ন মনে পড়ে শীতদিনের ভোরবেলায় সখিনা জিহ্বা বাহির করিয়া খেজুর গাছতলায় দাঁড়াইয়া থাকিত; উপরের গাছের মাথা হইতে এক ফোঁটা রস পাইলেও সে মহা হৈ চৈ করিয়া অসাধারণ তৃপ্তির ভান দেখাইত; একবার সেই রসের ফোঁটার সঙ্গে একদল মিষ্টিলোভী পিঁপড়া তাহাকে কী না ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একবার কাউফলের স্বাদে সে যে কেমন মুখ বিকৃত করিয়াছিল তাহা এখনও হোসেন স্পষ্ট মনে করিতে পারে। হোসেনের মন বসিত যদি সে আবারও দেখিতে পারিত সখিনা সবুজে পালে হরিত ভরা কলাবতীর ঝড়ের আড়ালে লুকোচুরি খেলিতে ব্যস্ত, যদি দেখিত সেই পুরানো বাড়িয়ালের পাশ হইতে নুইয়া পড়া আমগাছের ডালে চড়িয়া সে-ও বৈশাখী বাতাসের মতো উদ্দাম হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবোল-তাবোল গান জুড়িয়া দিয়াছে। তাহারে মন বসিত, বাস্তবিকই সেই সখিনার সঙ্গে এখনকার এই তরুণীর সকল সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইত। এখনও এইখানে 'আহ্বান' আছে, কিন্তু হোসেন নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না কেন সে তাড়া হুড়া করিয়া বাড়ির পথ ধরিল।

পথে গঞ্জে আলীর সঙ্গে দেখা। হোসেন খেয়ালই করে নাই। গঞ্জে আলীই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গে গাঁ-গ্রামের বড়োমিঞা কিসিমের আর একজন গোলটুপি পড়া কেউ। নজর, ছুঁচালো করিয়া তাহার পরিচয় নিবার জন্য উৎসুক্য হইয়াছিল।

: বান্ধব, বান্ধব, সেই পুরানো বাড়ির লাগ বরাবর পড়শি।—গঞ্জে আলী সেই বড়োমিঞার উৎসুক্য এড়াইয়া হোসেন-এর খোঁজ খবর লইল।

হোসেন একটু বিস্মিত হইল তাহার আন্তিক-আহ্বান-এর পীড়াপীড়ি লক্ষ করিয়া : পাগল না কী, এই ভর দু-পহরে এত কড়া রৌদ্র মাথায় লইয়া না খাইয়া যাবা এইটা কোনো কামের কথা! আসো, আসো—গঞ্জে আলী তাহার হাতে ঝুলান খালুই উঁচাইয়া দেখাইল : খোঁড়ল হাতাইয়া কত্ত বড় বড় কই মাছ পাইছি দেখো, খাইয়া-দাইয়া ধীরে সুস্থে যাইও।

হোসেন একটু ইতস্তত করিল। গঞ্জে আলীর এইরকম সমাদর তাহার প্রত্যাশারও অতীত। সামান্য জমি-জমার বিষয় লইয়া কী বিবাদটাই না বাঁধিয়াছিল। খালপাড়ে তাহাদেরই বাড়ির একটা প্রান্ত মাত্র। গঞ্জে আলীরও কোনো ঠাঁই নাই দেখিয়া মুজফ্ফরই তাহাকে সেইখানে থাকিতে দিয়াছিল। দুই জনেই কেরায়া নৌকার মাঝির কাজ করিয়াছে, কিন্তু মুজফ্ফরের শরীরটা খারাপ হইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মেজাজটা যেন আরও বিগড়াইয়া গেল। গঞ্জে আলী অনেক সহ্য করিয়াছে; তাছাড়া সম্ভবত অন্য কোনো কারণও ছিল যা হোসেন কখনও আন্দাজ করিতে পারে নাই।

সেই সময় বড়োমিঞা ধরনের লোকটি আগাইয়া আসিল : আরে মিঞা এই ডো তোমার দোষ, তুমি মানুষের গরজ বোঝো না। যখন বাড়িতে কাম-কায্য থাকে তখন কি আর আহার বিহারে মন দেওন যায়, আমারেও ত্বরাত্বরি ফিরতে হইবে। তোমারও মনে কয়—হোসেনের দিকে চাহিয়া সে একটা সিদ্ধান্তও দিয়া দিল; খেত-খামারের কাজে ঢিলা দেওয়া যাইবে না, কি কও মিঞা?

হোসেন-এর পক্ষে মাথা দোলাইয়া সায় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

গঞ্জে আলীও আর পীড়াপীড়ি করিল না : বেশ, বেশ, কাজে-কর্মে মন থাকা খুবই ভালো কথা।

: নিশ্চয়, নিশ্চয়। বলিল সেই বড়োমিঞা কিসিমের সেই লোকটি।

: তবে আসিও আর একদিন, খুব শিগগির শিগগিরই, কেমন?

: আচ্ছা।—হোসেন আবারও মাথা দোলাইয়া খালের পাড়ে বাঁধা নৌকার দিকে পা বাড়াইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নর চায় নারীসঙ্গ
নারী চায় নর
একে দেখো করি আছে
অন্য জনে ভর।
এই ভাবে সাজিয়াছে
জগৎ-সংসার
কর্মশক্তি না থাকিলে
সকলই অসার।
প্রেম-প্রীতি হাসিয়া ওঠে
নিজ প্রয়োজনে
সকলই মিলাইয়া যায়, বঁধু,
অভাব-অনটনে
গৃহস্থের গৃহ চাই
ঘরনির সুখ
কর্মশক্তি না থাকিলে
জগৎও বিমুখ।
ভবি চায় এক ভাব
মন চায় আন
দুই ক্ষুধা মিলাইলে
গুণীর সন্ধান ॥

AMARBOI.COM

বাস্তবিক পক্ষে হোসেন বাড়িতে কোনো 'উদ্বেগ রাখিয়া' আসে নাই। বরঞ্চ কোনো বিশেষ কিছু করার ছিল না বলিয়াই তাহার দুর্ভাবনা বাড়িয়া চলিয়াছে। একটা ঘর, আর তাহার আশে-পাশে সামান্য, অতি সামান্য কিছু 'রাগ' মাটি, যেখানে একসময় ছিল নেহাত ঝোপঝাড় অথবা ময়লা ফেলার ঠাঁই। বাপের অসুখে মায়ের মৃত্যুতে ছোট হালের জমিটি হাতছাড়া হইয়া যাইবার পর, কোনো উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই চিলতা ঠাঁই-এর উপরেই সে কিছু শাক-সবজির খেত বানাইয়াছে। তবে তাহা দিয়া তো আর জীবন চলে না, কেরায়া নৌকা লইয়া গঞ্জে ঘাটে চড়নদার তালাশ করার কাজটাই এখন মুখ্য। চুরির ভয়ে সবজিখেত একেবারে ছাড়িয়া রাখিয়া যাওয়াও সম্ভব না। হোসেন যতই চিন্তা করিয়াছে কেবলই দেখিতে পাইতেছে গৃহস্থালির পেশাও সংসার পরিবার ছাড়া সম্ভব করার উপায় নাই। নিজের ঘর-বাড়ির দিকে চাহিয়া তাহার মনের অস্থিরতা আরও বাড়িয়া যায়। ঘরের চাল বদলানো দরকার, মুলিবাঁশের বেড়াগুলিও খসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে; ভালো কাদা জোগাড় করিয়া ভিটাটাকেও মজবুত না করিলে চলে না। তা না হইলে হয়তো আরও একটা বন্যার কালে একেবারে গলিয়াই মিলাইয়া যাইবে। কেরায়া নৌকাখানির ছইও আবার মজবুত করিয়া বাঁধিতে হইবে, খোলের বাইরে 'গাব'-এর পালিশ দিয়া বেশ একটু সংস্কারও দরকার। সে কাজেও একটা সাহায্যের হাত চাই। অথচ শৈশবকালে দেখিয়াছে এইসব কাজে কখনওই তেমন কোনো বেগ পাইতে হয় নাই। একজনের কাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগ বাড়াইয়া দশজন আসিয়া যোগ দিয়াছে। যে কোন কাজ যেন এক একটা উৎসবের উপলক্ষ বলিয়া মনে হইয়াছে। ঘর ছাওয়া অথবা নতুন করিয়া বানানো, পুকুর পরিষ্কার, খেতে হাল দেওয়া কিংবা ধান কাটা-বাছাই, নৌকা ডিঙি তৈরি, এমনকী মাছ ধরতে গাঙে কি বিলে যাওয়া, চৈত্র-বৈশাখ খেতে-মাঠে নোতুন ওঠা পানির মধ্যে মশাল জ্বালাইয়া মাছের শিকার— কোনো কাজই এককভাবে অথবা উৎসবহীনভাবে সম্পন্ন হয় নাই। যার পক্ষে সেইরকম উৎসব অথবা যথাযোগ্য আদর-আস্তিকের সুযোগ নাই, তাহার জন্য উদ্বেগ দেখাইবার মানুষেরও ঘাটতি পড়িয়াছে।

দুনিয়াভরা এত মানুষ থাকিতেও চতুর্দিকে চাহিয়া তখন কাহাকেও আর চোখে পড়ে না যাহার দিকে পা বাড়াইতে ইচ্ছা হয়। ঘুরিয়া-ফিরিয়া বারংবারই মনে হয় শিকদারের কথা; সে কখনও যে-কোনো প্রয়োজনে হোসেনকে বিমুখ করে না; কিন্তু তখনকার মতো তাহার বাড়ির দিকে যাইতেও মন চাহিতেছিল না; ভয় হইল, হয়তো নেহাত আদনা বিষয় লইয়া কথায় বসিলেও কোনো না কোনোভাবে সখিনা প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িবেই। বারংবারই মনে হইতে লাগিল, তাহার ঘর-দুয়ারের যে ছিরি, তা কোনো কন্যারই মন ভুলাইতে পারিবে না। তাহাকে বধূবেশে এই ভাঙাঘাটে নামাইয়া লওয়া, এমন অযত্নে পড়িয়া থাকা উঠানের উপর দিয়া বাজাইয়া সে ধীরে ধীরে তাহার ওই মনে গিয়া উঠিবে, এমন কল্পনার বাস্তবিকই কোনো অর্থ নাই। খেত নাই, খামার নাই, কোন বলে সে এই ভগ্নশ্রী সংসারকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে? একমাত্র একটা স্থির সংকল্প আর নিজ বাহুবলের প্রয়োগ ছাড়া অন্য কোনো পন্থা চোখে পড়িল না।

এই সময় হঠাৎ দেখিল তাহার অন্য এক বন্ধু আমজাদের কেরায়া নৌকাটি খালের অন্য একধারে বাঁধা; গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে সন্তর্পণে দোল খাইতেছে। যেন কোনো গৃহস্থ বউ নিজ অঙ্গ মাজিতেছে নিরালা ঘাটে; হোসেন যেন একটা কূল পাইয়া গেল।

আমজাদের বাড়িতে উঠান ভর্তি ছেলেমেয়ে, ঘর-গৃহস্থালির চেহারাও অন্যরকম; অনেক ডাকাডাকির পর সে বাহির হইয়া আসিল; গামছাটা কাঁধে বিন্যস্ত করিয়া রাখিতে রাখিতে একগাল হাসিয়া বলিল : শেষ রাত্তিরে আসছি, বড়ো জোর ঘুমে পাইছিল, তেমন কিছু কানে যায় নাই।

: আরে মর্দ, তুমি যে কখন আসো কখন যাও কিছুই টের পাওন যায় না!—হোসেন তাহার সঙ্গে একটু আড়ালে সরিয়া গেল : আরও কয়েকদিন তালাশ করছি। তাজ্জব হইয়া কেবল ভাবি সব সময়ই তো বাহিরে বাইরে, ঘর-পরিবারের জন্য সময় মেলে কখন?

আমজাদ হাসিতে লাগিল : কী করা, সবই করতে হয়! স্বামীধর্মও। সবে এখন মৌসুম পড়ছে, তায় ডেনায় যতক্ষণ জোর আছে ততক্ষণ ফায়দা উঠাইয়া লইতে হয়। কেবল মাঝে মধ্যে এক আধটা রাত্তির বাড়ি আসা ছাড়া অন্য কোনো হাউস-বিলাস নাই।

হোসেন একটুকাল তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করতে চহিল : তা কেমন চলছে কাম-কারবার?

আমজাদ একটু মাথা চুলকাইল : ওইখানেই তো অসুবিধা। মানুষের আগের মতো আসা যাওয়া নাই। গাঁও-গ্রামের যে মানুষরা একবার গিয়া শহরে নামতে পারছে তারা কেউ আর তেমন নামিয়া আসে না। যে-ঘাটেই যাই, এক চড়নদারের জন্যে রাজ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের মধ্যে যেন কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। ওরই মধ্যে বুদ্ধি খাটাইয়া চড়নদারের জোগাড়ে সময় লাগিয়া যায়, আর ন্যায্য রোজগারটাও তেমন হয় না। তবু আছি, টিকিয়া আছি এখনও। দেখি তো, কেবল রিজিক দেনেওয়ালার জন্য বসিয়া থাকিলে কাম আউগায় না। তুমি কী ঠিক করলা?

: নৌকাখানের একটু মেরামতের দরকার পড়ছে। তারপরই আসিয়া যামু।

হোসেনের একবার ইচ্ছা হইল নিজ নৌকাটা দেখাইয়া আমজাদের সহায়তা চায়, কিন্তু দমন করিয়া লইল : কোন ঘাটে কখন আছ জানতে আইলাম। এ কামে তোমার কাছে অনেক এলেম তালেম নেবার আছে।

আমজাদ ধীরে ধীরে বলিল : আসিয়া যাও, জানোই তো সব হালচাল। বাদবাকি সবও ঠেকিয়া ঠেকিয়া রপ্ত হইয়া যাইবে। আরও দুই দুইটা পূর্ণিমাতক নলছিটির ঘাটেই আছি। ছোটো ছোটো ক্ষেপ লইয়া এদিক-সেদিক যাই, তবে একদিন দেখা পাবাই।

: তুমি কেবল একটু ঘাট-মাঝিরে বলিয়া রাখিও। তা না হইলে হয়তো নৌকা ধারে কাছে ভিড়াইতেও দিবে না। তার সঙ্গে বন্দোবস্তের সাহায্য চাই।

আমজাদ সংক্ষিপ্তভাবে মাথা নাড়িল। ইতিমধ্যে ছোটো একটি মেয়ে তাহার ভাইকে কোলে লইয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেছিল।

আমজাদ শিশুপুত্রটিকে কোলে লইয়া বাড়ির দিকে একবার ইঙ্গিত করিয়া হাসিল : ধারে-কাছে পায় না খুব একটা, তাই ডাকাডাকি লাগাইছে। হোসেনও হাসিতে চাহিল : বেশ, বেশ, যাও, তোমারে আর আটকাইয়া রাখতে চাই না।

: তা তেমন কোনো আদর-আস্তিকও গ্রহণ করলা না!

: হইবে, হইবে, অন্য সময় হইবে।

আমজাদ পুত্রকন্যাদের ভিড় লইয়া অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। হোসেনও খালপাড় হইয়া শিকদারের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল। শিকদার এবং আমজাদ বাস্তবিক দুই প্রান্তের দুইজন। একজন নিজের ঘর-পরিবারের জন্য কোনো হুঁশ না রাখিয়া বাহিরের জীবন লইয়া ব্যাকুল, আর অন্যজন সেই বাহিরকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া তাহার অন্তঃপুর লইয়া আকুল। শিকদারের অফুরন্ত অবসর আছে বলিয়াই সামাজিকতারও ফুরসৎ আছে।

সে তাহার বারান্দার একধারে একমনে কী সব লইয়া ব্যস্ত ছিল; সামনে কিছু কলাপাতা, হাতে খাগের কলম; হোসেনকে দেখিয়া সরাইয়া রাখিল।

সে খুশিমুখে হোসেনকে সমাদর করিয়া বসাইল : আমিও ভাবতে আছিলাম, একবার তোমার ওইদিকে যাই। কেন যেন মনে হইতে আছিল তুমি একটু উদ্বেগের মধ্যে আছ।

: হ। ঠিকই!—হোসেন মাথা নাড়িয়া আরও বলিল : আমজাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইয়া আসলাম, আর অনর্থক দেরি না করিয়া কেরায়ার কামে রওনা দিতে চাই।

: ভালো, খুউব ভালো কথা। বোধ করি মনটা একটু শান্ত হইছে।—শিকদার একটু ইতস্তত করিয়া বলিল : তুমি যদি চাও গঞ্জে আলীর কাছে আমিই সম্বন্ধ লইয়া যাই। তোমায় সুখে-শান্তিতে দেখলে আমারও আনন্দ পাইবে। হু, বিষয়টা লইয়া আমিও চিন্তা করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন প্রথমে বেশ একটুকাল অবাক হইয়া রহিল; অনেকক্ষণ অবধি বাহিরের দিকে তাকাইয়া শিকদারের কথাগুলি মনে মনে পর্যালোচনা করিতে লাগিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল : তা হইলে তো ভালোই হইত। এই সমস্তে তোমার তেমন আর বিশ্বাস নাই বলিয়াই কথাটা তুলি নাই। তবে প্রস্তাব না, তাগো ইচ্ছা-অনিচ্ছাটা কী জানিয়া আসতে পারলেই ভালো হয়। ইতিমধ্যে আমার তো মনে হইতে আছিল, তুমি ঠিকই কও, যারগো কোনো তেমন অবস্থা নাই, তেমন বিশেষ আশা-ভরসাও নাই। তারগো সব লোকাচার মানিয়া চলন সহজ বিষয় না। কার্যত কিছুই হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখার সুখটুকুই কপালে লেখা আছে। হ, সেই তোমার কথনই কইলাম!

শিকদারের সম্মুখে আসিয়া হোসেন যথাসম্ভব সংযতভাবেই কথাবার্তা বলে; আর যাই হউক কিংবা যে যাই বলুক, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সঙ্গত মনে হয় না। কোনো পাঠশালায় বা বিদ্যালয়ে যাইবার সুযোগ তাহার হয় নাই, কিন্তু মনে হয় জীবনই তাহাকে অনেক কিছু শিখাইয়াছে; তাহার সম্পর্কে অন্যান্যদের কথাবার্তার সময়ও সে একটা সম্ভ্রম লক্ষ করিয়াছে, হয়তো অন্য সকলের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিবার আগ্রহটাই সকলের কাছে তাহাকে এমন আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছে। শিকদার এই গ্রামে থাকিয়াও, তাহাদেরই মতো একজন হইয়াও এক স্বতন্ত্র মানুষ। এই স্বাতন্ত্র্য, এই জগৎ-জীবন সম্পর্কে তাহার ধ্যান-ধারণা অন্যরকম কেন হইল, সে-প্রশ্নের কোনো মীমাংসা হোসেন কখনও পায় নাই। এইটুকু কেবল জানে যে শিকদারের বহু পুরুষের বাসিন্দা ছিল ওই শ্রীহীন ঘর-বাড়িয়াল। কত রাজা-রাজ্য আসিল, গেল, তাহারা কেউই শিকদারের মতো সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনিতে পারে নাই। সে বলে না বটে এই পৃথিবী মায়া, এই সংসার কুহক, কিন্তু যেন ইহার মধ্যে থাকিয়াও, নাই, কোনো এক বিশেষ কারণে সে তাহার জীবনও অস্তিত্বকে ক্রমাগতই গুটাইয়া লইয়া একরকম নিভৃতবাসী হইয়াছে। সেই কারণটা সকলের কাছে এক রসাত্মক গল্প; হোসেনও শুনিয়াছে বইকী, কিন্তু সেই কারণটা সকলের কাছে সরাসরি উত্থাপনের সাহস পায় নাই।

লোকে জানে এক শৈশব-প্রেমের ব্যর্থতা তাহার জীবনে এমন ঔদাস্যের মূল। কেউ বলে আরও কত কী। শিকদার যে জানে না তা নয়, কিন্তু কোন শক্তি বলে সে সমস্ত কিছু উপেক্ষা করিয়া এমন অটল রহিয়াছে ভাবিয়া হোসেনের বিস্ময়ের কূল নাই। অত্যন্ত নিকট হইতে জানিয়াই সে এই মানুষটিকে সম্ভ্রম করিতে শিখিয়াছে; তাহার সম্মুখে সে নিজেকে যথাসম্ভব শুদ্ধভাবে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

: যদি বলো, আমি এই বিহানেই যাই। এইসব বিষয় লইয়া কোনো বাধ্যবাধকতা মঙ্গলের বিষয় হয় না। তোমার ঘর-সংসার হইলে আমারও যখন-তখন নানান খিদা মিটাইয়া লইবার একটা সুযোগ হইবে। আমার নিজেরও এইরকম অকর্মণ্য জীবনটার উপর বড় অশ্রদ্ধা আসিয়া গেছে।—শিকদার যেন নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টাতেই অন্যদিকে মনোযোগ দিতে চাহিল।

: বেশ, তাই হউক,—হোসেন উঠিয়া পড়িল : ইতিমধ্যে আমি নৌকাটার মেরামতে মন দিই।

: সে-ই ভালো, সে-ই ভালো।—শিকদার বাড়ি হইতে অনেকদূর অবধি হোসেনের সঙ্গে সঙ্গে আসিল : বিহানবেলাটা ওইদিকে যাইবে, কিন্তু বৈকালে হয়তো বা তোমার কাম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কায্যে কিছু জোগান দিতে পারমু; বেলা পড়িয়া না আসলে এখনই কামে লাগিয়া যাওন যাইত।

না, না, এমন কোনো ত্বরাত্বরি নাই।—হোসেন তাহাকে বাড়ি ফিরাইয়া দিল : শিকদার ভাই, ওই সখিনারে না পাইলে আমার জীবনও যে আন্ধার হইয়া যাইবে এমন কোনো দুশ্চিন্তাও আমি করি না। আমি লড়াকু-লাঠিয়ালদের পোলা, কোনোখানেই হার মানতে আমার মন চায় না। এই যে জীবন জীবন বলিয়া জতুর্দিকে এত সব কথাবার্তা শুনি, কিছু তার বুঝি বা বুঝি না, কিন্তু একটা লড়াইর জন্য বড় উচাটন হইয়া উঠতে আছে দিনকে দিন। কী লাভ হইবে সেই লড়াই করিয়া যার কোনো পষ্ট অর্থ বুঝি না, কোনো ঠিকঠাক করা উদ্দেশ্যও দেখি না, একবার মন চায় একটা মাইয়া-মানুষ, একবার মনে হয় বিষয়-সম্পত্তি, কখনও আবার মনে কয় সব কিছু ছাড়িয়া-ছুড়িয়া কোনো শহরে-বন্দরে গিয়া উঠি। নিজেরে লইয়া একটা মহা জ্বালায় পড়ছি!

শিকদার হাসিতে চাহিল : ভালো, ভালো। জীবনের একটা লক্ষ্যও দরকার, উদ্দেশ্যও চাই। আমার তো মন বলে থির বান্ধনের কাল এখনও যায় নাই।

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে খালপাড়ের গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সন্ধ্যায় সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে নামিয়া আসিয়াছে। হোসেন অনুরোধ করিল : একটু বসো শিকদার ভাই, বুঝি বা না বুঝি, তোমার সঙ্গে কথা বলিয়া সুখ পাই।

শিকদার ইতস্তত তাকাইয়া আবারও বলিল : দেখো না চাহিয়া চতুর্দিকে, দুনিয়ার কোনখানে আর অন্য কারো মধ্যে চাঞ্চল্য নাই, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, তরুলতা, আসমান-জমিন, গাঙ কী সমুদ্দুর কোনখানে কি-ই বা থির হইয়া আছে? দেখি, পোয়ামি মা-এর পেটের শিশুও চঞ্চল হইয়া ওঠে বাহিরে আসার জন্যে, জন্মকাল হইতে তামাম জীবনভর একটা না একটা চাঞ্চল্য তার স্বভাবধর্ম হইয়া যায়।

: হ, হইবে বা!—হোসেন একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল : তোমার সব কথা বুঝিয়া ওঠার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তুমি বয়াতিভাই, তুমি! মাঝে-মাঝে মনে কয় তুমিই যেন স্রোত ভুলিয়া দুমুড়ি কালের লাহান তবধো হইয়া আছ। না হয়, এই যে জগৎ সংসার, কেবলই অবিচল তার পাড়ে খাড়াইয়া আছ। আমার বিলক্ষণ মনে আছে তোমার একটা গীত। কিন্তু ওই ভাব লইয়া কেবলই যেন থামিয়া যাইতে হয়।

: কোন গীত?

: সেই যে আমার রূপ দেখিয়া ভরিয়া গেছে দুই আঁখি—

শিকদার খুশি হইল; এক সময়ে সে নিজেই তাহার সুর ধরিল :

রূপ দেখিয়া ভরিয়া গেছে দুই আঁখি
আমি আর আমার কথা বলব কী!
বোবায় যেমন স্বপ্ন দেখে
মনের আগুন মনেই রাখে
অন্তরে তেমনই লাইগাছে আগুন
বাহিরে জল ঢালিলে আর হবে কী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন তবু বলিল : বুঝি, তোমার কাছেই শুনছি ঢেউ-এর উপর ঢেউ থাকে, বাতাসের মধ্যে বাতাস, স্বর-এর মধ্যে সুর। তোমার মনে কোনো রকম আঘাত দেওন আমার উদ্দেশ্য না, কিন্তু তোমাদের সংসারী দেখলে আমিও বড়ো সুখী হইতাম বয়াতি ভাই!

শিকদার হাসিয়া উঠিয়া পড়িল : মনে হয় ওই আমজাদের বাড়ি ঘুরিয়া আসিয়া তোমার আর একলা একলা সংসার করণের সাহস হইতে আছে না! উঠি, সন্ধ্যা নামিয়া গেছে, জীবজগতের নিয়ম মানিয়া চলতে হয়।

কখনওই শিকদারকে নিজ প্রসঙ্গ লইয়া মুখর হইতে দেখে নাই কেউ, না শুনিয়াছে তাহার নিজ মুখে কোনো ইতিবৃত্ত। লোকমুখে যাহাই প্রচলিত থাকুক, বউঝিরা যা লইয়াই কৌতূহলী হউক, হোসেন কখনও সেই সব গাল-গল্পে বিশ্বাস আনিতে পারে নাই, মনে হইয়াছে শিকদারের মধ্যে অসাধারণ কোনো শক্তি আছে, হয়তো তা এমন কোনো বিচক্ষণতা যা হোসেন উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না।

লোকশ্রুতি এক সময় এই গ্রামের একটা কন্যা সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়াছিল শিকদারের; তাহারই প্রেরণা উদ্দীপনায় শিকদার কবিয়াল হইল বটে, কিন্তু সেই কন্যা তাহার ঘরে আসিল না। অর্থ-বিত্তকেই সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া সে নিজেকে অন্যত্র বিকাইয়া দিল। সকলের ধারণা সেই ঘটনার পর হইতে শিকদার নিজকে সব ঠাঁই হইতে সরাইয়া লইয়াছে; কোনো মেয়ে মানুষের উপর তাহার আর কোনো বিশ্বাস নাই, ভরসাও নাই।

আবার অন্য কেউ সেই সব কথা একান্ত বেহুদা বলিয়া উড়াইয়া দেয়, বলে এই দেশের মাটিই বড়ো পিচ্ছিল, বহুজনই কোনো না কোনোভাবে একবার পড়িয়া গিয়া আর কখনও খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। কেউ বা বলে, শিকদারের মতো মানুষেরা এইসব মুলুকের জীবনের সঙ্গে লড়াইতে ব্যর্থ হইয়াই নানারকম ভাব-তত্ত্বের আড়ালে-আবরণে কেবলই নিজেদের লুকাইতে চাহিয়াছে। সেই সব আলোচনাও হোসেন খুব একটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না; শিকদারকে সে খুব নিকট হইতে জানে; তাহার সম্পর্কে কোনো সাধারণ রসাত্মক আলোচনা তাহার কখনই সহ্য হয় না। এখন যে সে নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গঞ্জে আলীর বাড়ি যাইতে মনস্থ করিয়াছে তাহাতে হোসেন মনে মনে খুবই কৃতজ্ঞতাবোধ করিতে লাগিল।

তবু নানারকম অস্থিরতায় সেই রাত্রে ঘুম আসিতে চাহিল না চোখে; একসময় সে বসিল আসিয়া বাহিরের হাতিনায়; উঠানের উপরকার তারাভরা আকাশের দিকে চাহিয়া। চতুর্দিকে তখন নিঝুম, কেবল একটা উচ্চিংড়া ভিতরে কোন ফোঁকর হইতে ডাকাডাকি করিয়া সেই নিঃস্তব্ধতাকে খণ্ড-বিখণ্ড করার চেষ্টা চালাইতেছিল। আরও পোকামাকড় ডাকাডাকি করিতেছিল চতুর্দিকে, কিন্তু সেই উচ্চিংড়াটার ঔদ্ধত্য অসহ্য মনে হইল, সে একসময় পিড়ার কাছে তাহার অবস্থান অনুমান করিয়া লাঠি দিয়া খোঁচাইয়া স্তব্ধ করিয়া দিল। কিন্তু একটুকাল পরে মনে হইল সেইটা আরও কোনখান হইতে মুখ বাহির করিয়া আরও জোরে-শোরে ডাকাডাকি শুরু করিয়াছে। কেবল সেইটা একা কেন, চতুর্দিক তাহাদের সংখ্যা শুমারেরই বা সাধ্য আছে কার। সামান্য এক পশলা বৃষ্টির পর পরিষ্কার আকাশ-বাতাস তবু অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা না গেলেও মনে হয় অকস্মাৎ যেন সেই জীব জগতের কাহারও চোখে ঘুম নাই; সবাই সকলকে ডাকাডাকি করিয়া একটা মহা হট্টগোল লাগাইয়া দিয়াছে। চৈত্র-বৈশাখের ঝিঁঝিও এমন তারস্বর বলিয়া মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়িল একদিন শিকদারই বলিয়াছিল আদতে এত চেঁচামেচি নাকি তাহাদের জোড় বাঁধিবার জন্যই ডাকাডাকি। মানুষ তো না, সুতরাং লাজ-শরমের কোনো বালাই নাই!

আর শুধুই কী তাহারা? পুঞ্জ পুঞ্জ জোনাকির দলও বাহির হইয়া পড়িয়াছে কোথাও হইতে; কয়েকটা ব্যাঙও ডাকিতেছে এই দিকে সেই দিকে। মনে হয়, কিছুক্ষণের মধ্যে তাহাদের ডাকাডাকিতেও রাত্রি ভরিয়া উঠিবে। কানে আসিল দূর হইতে পাতিশিয়াল আর কুকুরের আওয়াজও। উঠানের পাশে আমগাছের ডালপালার পাতাগুলিও হঠাৎ কী সব কথাবার্তা ফিসফাস করিয়া বাতাসে ছড়াইয়া দিতে শুরু করিয়াছিল।

হোসেন সমস্ত অলস ভাবনা মন হইতে তাড়াইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তবু চোখে পড়ে গরিবঘরের টুটাফাটা ফাঁক দিয়া বাহিরের আকাশ। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল মনের সবরকম গোপন কামনা বাসনাগুলিকে দেখার জন্য সমস্ত দুনিয়া যেন কৌতূহলে অদম্য হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রিটা কোনো রকমে কাটাইয়া সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল নৌকা সাজাইবার কাজে। খোল-এর জমা জল সেঁচিয়া ফেলিতে না ফেলিতে ছোটো নৌকাখানি একটা বড়ো হাঁসের মতো গরবিণিভাবে দুলিতে লাগিল। কিছু মেরামত আর রং করার জন্য শুকনা পাড়ে টানিয়া তুলিতে বেশ বেগ পাইতে হইল। হাঁসগুলি যেমন ডানাঝাড়া দিয়া পুকুর হইতে নরম পাড়ের উপর হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া আসে সেই রকম দূরের কথা, বরং বারংবার অবাধ্য পশুর মতো এক এক ঠায় স্থির হইয়া আটকাইয়া যাইতে চাহিল। একসময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে হোসেন বেশ একটু চোটপাটও দেখাইল : এই জন্যই তো গলুই-পাছায় কোনো সাজ জোটে নাই!

মুখচোখের ঘাম মুছিয়া সে আবারও যখন নানারকম দড়ি-দাঁড়ায় ঠেকাইয়া নৌকাটাকে মোটামুটি একটা সন্তোষজনক ঠাঁইতে তুলিয়াছে, এইসময় চোখে পড়িল শিকদার ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার পদক্ষেপ ধীরগতি, মুখচোখও নিত্যদিনের মতো স্বভাব-বিষণ্ণ। এক দৃষ্টে বহুক্ষণ লক্ষ করিয়াও তেমন কোনো ফলাফল আন্দাজ করা গেল না, কেবল দেখিল মাথার উপর প্রথম রৌদ্র সত্ত্বেও শিকদার ছাতাটিকে বন্ধ অবস্থায় বগলে রাখিয়াই পথ চলিতেছে, কিছু বলিবার জন্য আগাইয়া গিয়াও হোসেন যেন কথা গুছাইয়া লইতে পারিল না।

সম্ভবত শিকদারও কী বলিয়া শুরু করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, হোসেনের উপর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া সে নৌকাটাকে দেখিতে লাগিল।

: খাওয়া-দাওয়া হইছে?—দৃষ্টি সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল হোসেন।

শিকদার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়িল : নাহ্, তবে তার সুযোগ আছিল অবশ্য। আমিই দেরি করিতে চাই নাই।

হোসেন হাসিতে চাহিল : আমার সেই বিহান থেকিয়া আর কিছু পেটে পড়ে নাই। তুমি হাতমুখ ধুইয়া জিরাও, আমিও একটু পয়-পরিষ্কার হইয়া লই একটা ডুব দিয়া। যা আছে কিছু এক সাথে মুখ দেওন যাইবে।

শিকদার আপত্তি করিল না : সে-ই ভালো।

হোসেন একসময় আবারও জিজ্ঞাসুমুখে সরাসরি তাহার দিকে তাকাইল।

: বলি, কাজে-কামে বাহির হইলে অনেক অভাব মিটানোর সুযোগ হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: বয়াতিভাই?—হোসেন অনন্তভাবে দাবি জানাইল : কোনো রকম সুখবরের প্রত্যাশা আমি করি নাই। আসলে বিষয়টা কী?

: কী আর!—শিকদার হাতের ছাতাটিকে একধারে রাখিয়া খালের জলের ধারে নামিবার উদ্যোগ করিল : কন্যার সম্বন্ধ অন্য জায়গায় ঠিক হইয়া গেছে, এখন কেবল বিয়া পড়াইয়া উঠাইয়া নেওন বাকি। গঞ্জে আলীর লাহান ভিত-ভূঁইছাড়া মানুষের পক্ষে রাজি না হইয়া উপায়ই বা কি ছিল? যারা তারে ঠাঁই দিছে, কাজ দিছে রিজিকের তারাই স্বয়ং সম্বন্ধ দিছে। এই রকম প্রতিপক্ষের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদের সাধ্য কেউরই হইবে না।

হোসেন আর কোনো প্রশ্ন করিল না।

: একটা ক্রোধ আমারও হয়, কিন্তু কী করা? কোনও উপায় দেখি না। শিকদার ধীরে ধীরে আরও বলিল : গাছের ফল, পুষ্করিণীর মাছ, খেত-খামারের সেরা জিনিস, এমনকী ঘরের ঝি-বউরেও কর্তাব্যক্তিদের ভোগে নেওয়ার নিয়মটাই সত্য হইয়া আছে। কী সুন্দর এই ভুবন, কত সম্ভার তার চতুর্দিকে! পথে আসতে আসতে দেখলাম, কত মানুষ কত রকম কামেকায্যে ব্যস্ত, কত নিষ্ঠা। তবু সব ভালো ভালো জিনিসের উপর তারগো অধিকার যেন কক্ষনো হইবার না। কিন্তু কোনো প্রতিকার দেখি না, কোনো কিছু করণের দেখি না। তুমি কিছু প্রত্যাশা করো নাই, কিন্তু আমারও খুব ইচ্ছা হইছিল এই বিষয়টা আবারও পরখ করিয়া দেখি। নাহ, নতুন কিছু নাই। সব একই রকম রইছে, তোমার আমার মতো মানুষের উপর সব অবস্থা-ব্যবস্থা যেন কেবলই চোখ রাঙাইয়া আছে।

হোসেন অনেকক্ষণ অবধি মুখ নিচু করিয়া কী চিন্তা করিল বহুক্ষণ; তারপর এক সময় মুখ তুলিয়া হাসিতে চাহিল : জানোই তো, আমি একটু গোঁয়ার মানুষ। কেবল চৌখ রাঙানি দেখিয়া দেখিয়া জীবন-যাপনের ইচ্ছাও আমার নাই। বুঝছি, আমার রিজিক, আমার হক আমার নিজেরই জোগাড় করিয়া লইতে মন দেওয়াই সুকায্য হইবে।

গাঙরে, তোমার যে মতি বোঝন ভার
তুমি এই কূল ভাঙিয়া ওই কূল সাজাও
ক্ষণেক হাসাও, ক্ষণেক কান্দাও,
এমন করিয়া খুশি মেটাও কার?
গাঙরে, তোমার মতি বোঝন ভার ॥

মাবুদরে, তোমারে যে মতি বোঝন ভার
এই গাঙে যেমন লক্ষ সোতের ধারা
তেমনি মোরা এই ভবেতে হারা
চলতে আছি কোন ঠিকানার পার?
গাঙরে, তোমার মতি বোঝন ভার ॥

নিজ গাঁ-গ্রামের অভ্যস্ত পরিবেশের বাহিরের ভুবনকে যেন চোখ মেলিয়া দেখারও অবকাশ হয় না। খালের মুখ অন্য এক জগতের ফটক। মোহানায় পৌঁছিবার আগেই তাহার রূপরসবর্ণগন্ধ যেন চতুর্দিক হইতে ধাইয়া আসে; নদীস্রোতের প্রান্তকালের অসংখ্য সৈন্যবাহিনী ঢেউ-এর মাথায় সওয়ার হইয়া, গর্ভ হইতে ফুঁসিয়া জাগিয়া হোসেনের ছোটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌকাখানি টানিয়া লইয়াছে; দেহের সবটুকু শক্তি বৈঠায় রাখিয়া একাগ্রভাবে দিকদিশা ঠিক রাখিয়া ভাসিয়া পড়িতে বেশ একটু সময় লাগিয়াছে। ডাঙার উপরে হাতের ছড়ি নাচাইয়া কী লাঠি ঘুরাইয়া যে যতই প্রতাপ দেখাউক, গাঙ-এর দুর্ধর্ষ শক্তির কাছে তাহার মূল্য বড়োই সামান্য বলিয়া মনে হয়। এইখানে কেবলমাত্র বৈঠার জোরে আর কৌশল করিয়া সমস্ত প্রতিকূলতা কাটাইয়া ওঠার মধ্যে হোসেন একটা গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছে।

মৌসুমি মেঘে ছাইয়া পড়িতেছে বিপুল আকাশ, আর গাঙও উঠিয়াছে আরও ফুলিয়া ফাঁপিয়া; স্রোত বহিয়া চলিয়াছে প্রচণ্ড বেগে। প্রাথমিক বৈরিতার মনোযোগ ত্যাগ করিয়া সে হোসেনকে কেবল ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রৌদ্রে ধাঁধাইয়া উঠিতেছে মাঝে মধ্যে ঢেউ-এর চূড়া, কখনও বা এইদিক সেইদিক 'উলাস' দিয়া উঠিতেছে, শুশুক, দুইধারের বন-বনানী যেন নিঃশব্দে গাঙ-এর গতিবিধি দেখিতেছে। এক পাড় দর্পভরে আগাইয়া আসিয়াছে তো অন্যপাড় আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে। খোলামেলা গাঙে স্রোত আর বাতাস সবসময় একই মুখি হয় না। হঠাৎ ঢেউ জাগিলে নৌকার দিক ঠিক করিয়া কাটিয়া বাহির হইতে হয়। এই স্রোতে নামা, তাহার উপর সওয়ার থাকা, তারপর ইচ্ছামতো কূলের বন্দর গঞ্জের ধারে নোঙরের সাফল্যলাভ রীতিমতো কঠিন হইলেও হোসেন কিছুমাত্র দমে নাই। যেই ঘাটে আমজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আশা করিয়াছিল, সেইখানে নৌকা 'পাড়া' লাগাইবার ঠাঁই-এরও অভাব। গঞ্জটি ছোটো, কিন্তু সেখানে যত না চড়নদার তাহার তুলনায় অনেক বেশি ভিড় কেরায়া নৌকার। সারা গাঙ তোলপাড় করিয়া সেইখানে বিরাট একটা জাহাজ আসিয়া থামে দিনে দুইবার; অল্প কিছু যাত্রী ওঠা নামা করে; সপ্তাহের হাটেও বেশ একটু ভিড় জমিয়া ওঠে তবে ঘাটের সর্দারি করে যে মাঝি তাহার সঙ্গে বুঝ-বন্দোবস্তের লাইন না থাকিলে যাত্রী সংগ্রহ আদৌ সম্ভব হয় না! তাহাদের হুকুম হাকাম না মানিলে মন না জোগাইয়া চলিলে নৌকাও ভিড়ানো যায় না ঘাটে; একদল নির্কর্মা লোক সবসময় চরের মতো সবদিকে চোখ রাখিতেছে। নৌকাটিকে একটু দূরে বাঁধিয়া হোসেন একবার সমস্ত ঘাটটা ঘুরিয়া আসিল।

নৌকার গলুইতে বসিয়া পায়ের কাদা ধুইবার কালে খেয়াল হইল পাশের নৌকাটির মাঝি আলাপে উৎসুক। সে পাটাতনের উপরে ছোটো একটি উনানে ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়াছে; একটু লাকড়ি গুঁজিয়া সে হোসেনের দিকে ফিরিয়া বসিল।

হোসেনের তুলনায় তাহার বয়স অনেক, সারামুখে গোঁফ-দাঁড়ি। রুগণ। কী প্রশ্ন সে করিয়াছিল হোসেন ঠিক বুঝিতে পারে নাই। জিজ্ঞাসুমুখে তাকাইলেও মাঝি আর সে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল না; কেবল উপরের ডাঙার দিকে একটা ইঙ্গিত করিয়া বলিল : চড়নদার না জোটলে হাট-বাজারের দিকে আউগানও যায় না।

মুড়ি-বাতাসার একটা ছোট পোঁটলা গামছায় বাঁধিয়া কোমরে জড়াইয়া লইয়াছিল হোসেন; পাটাতনের উপর পা মুড়িয়া বসিয়া সে তাহার এক মুঠা মুখে পুরিল।

: নতুন আইলা বুঝি?

হোসেন সংক্ষিপ্তভাবে মাথা দোলাইল : জ্বে!

: আমি সেই কবে থেকিয়া চড়নদারের আশায় আছি!—বৃদ্ধ মাঝি আরও একটু কাছে সরিয়া আসিল : কী আর করি! চড়নদারেরা বাছিয়া নৌকায় ওঠে। আমার নাহান বুড়ারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ো একটা আমলে নেয় না। কী আর করি! বসিয়া বসিয়া বেশ কিছু মাছ উঠাইলাম বড়শিতে। সেইগুলান বেচিয়াই খাওনের জোগাড় করছি। খাবা একমুঠ আমার সঙ্গে?

হোসেন একটু অবাক হইয়া রহিল; তারপর মাথা দুলাইল : না, না!

মাঝি তবু বলিল : অনেক, অনেক মাছ জুটছিল, রাঁধছিও ভালো করিয়া, চড়নদার না পাইলে কী করা। মাঠের কাছে তো সক্কলে বড়শি নামাইয়া বসছে। তাই আমি আরও একটু নামায় গেছিলাম, ওই ঘোঁজাটার কাছে। জাল-টাল ফেলার সুবিধা তো নাই, ডাঙার উপরের সকলকেই চৌখ রাখে। সামান্য সূতির বড়শি নামাইয়া বসলাম। আর বসতে না বসতেই টপাটপ টপাটপ এক একটা উঠাইতে লাগলাম। পাঙাশ ট্যাংরা। মনে কয় ঝাঁক বাঁধিয়া আমার বড়শির চাইরধারে ঘিরিয়া আসছিল। তবে বেশিক্ষণ ওইদিকে নৌকা লইয়া থাকতে পারি নাই। কেউর চোখে লাগিয়া যাওনের ডর আছিল, তায় চড়নদারের জন্য উদ্বেগ। এখন বৈকালের স্টিমারের আশায় আছি। দেখতেই আছ তো আসমানের অবস্থা, ঝড় দেয়ইর কাল ধাইয়া আসতে আছে। মনে কয় এই শরীর লইয়া তার মধ্যে আর ক্ষেপ দেওয়ার কাম করণ যাইবে না। আর এই ঘাটেও তেমন সুবিধা নাই, নৌকা বান্ধার জন্য এখন চর দখলের লাহান কাজিয়া-বিবাদ লাগিয়া যায়।—ভাতের হাঁড়িটা একবার পরীক্ষা করিয়া মাঝি আরও বলিল : আমি যখন পয়লা এই ঘাটে, তখন এত নৌকা আদতেই আছিল না, আর চড়নদারও আছিল নানান গাঁও-গ্রামের বড়ো বড়ো মানুষ। তাগো কৃপায় কেবল কেরায়ার পয়সাটাই না, ভালো-মন্দ অনেক কিছু জুটিয়া যাইত। নৌকা ছাড়ার আগে বাজার করিয়া আনতেন তাঁরাই, কিছু রান্নাবান্না হইত, কিছু লইয়া যাইতেন ঘর পরিবারের জন্য। সেইসব ঘর বাড়িতেও হয় অনেক আদর-আস্তিক, না হয় উপরি কামকার্য জুটিয়া যাইত। এখন সেইসব মানুষেরা আর তেমন এইসব দিকে আসা-যাওয়া করে না। যে কয়জনই বা আসে যায়, তারগো উপর যেন তামাম মুল্লুক কাউয়ার লাহান ঝাঁপাইয়া পড়ে। ফলে এখন ঘাটে মাঝির সঙ্গে বুঝ-বন্দোবস্তটাই বড়ো হইয়া ওঠছে। তারে আগাম কিছু না দিলে সে আমলেই নেয় না। তোমার ডেনার জোর আছে, নৌকাখানও ভালো, তবে আগে ওইদিকে লাইনটা লাগাইয়া রাখো। তা হইলে আর কোনো চিন্তার কারণ থাকবে না।

মাঝি একটা মাটির বাসনে ভাত-মাছ সাজাইয়া হোসেনের দিকে বাড়াইয়া দিল। হোসেন বেশ একটু সংকোচের সঙ্গে বাসনটা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু তাহার এমন আপ্যায়নের কারণটা বিশেষ অনুমান করিতে পারিল না।

: আরে, খাও খাও মিঞা। ত্বরাত্বরি মুখে দেও, বৈকালের স্টিমারের সময় হইয়া আসতে আছে।—মাঝি নিজের আহারে মন দিয়া আরও বলিল : এই আমাগো লাহান নামার মানুষেরা কখনও একলা খাইতে বসে না।

হোসেন একটু রসিকতার চেষ্টা করিল : এই কারণেই বোধ করি খাওয়াইয়ার সংখ্যা বাড়ছে।

মাঝি হাসিয়া ফেলিল : হ, হ, কথাটা মন্দ কও নাই।

হোসেন ভাত-মাছ মাখিয়া আরও বলিল : আর ফাঁকি-ফিকির করিয়া উপায়-এর অবস্থা-ব্যবস্থা অন্যে লুটিয়া নিতে আছে। দুই মুঠ খাওন জোগানের জন্য কোনোদিকেই যেন আউগান যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: ঘাবড়াইও না মিঞা।—মাঝি অভয় দিতে চাহিল : গাঙে কুমির, ডাঙায় বাঘ কবেই বা না আছিল এই মুলুকে? আমি তো দেখতে আছি, যত দিন যায় ততই এই যুদ্ধটা আরও ঘোরতর হইয়া আসে। ওই যে কইলাম চর-দখলের কথাটা, এখন সব বিষয়ই ওইরকম হইয়া গেছে। কী আর করা! ঘর-সংসার আছে বলিয়াই এখনও একরকম লাঠি ঘুরাইতেই হয়।

অথচ হোসেন আবারও লক্ষ করিল মুখে যতই বলুক, মাঝির সেই বয়স সম্ভবত আর নাই; কিন্তু সবরকম বাধা-বিপত্তি অসুবিধা অনটন কাটাইয়া উঠিবার জন্য আগ্রহ অপরিসীম। বৈকালের স্টিমারের কোনো যাত্রী আদৌ তাহার ভাগ্যে জুটিবে কিনা সে বিষয়ে ঘোর সংশয় থাকিলেও সে কেবলই তা দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে। চতুর্দিকে ধাইয়া চলিতেছে সবকিছু, আকাশের মেঘ, গাঙের স্রোত, ডাঙার উপরে ঘাটে-গঞ্জে নানারকম ব্যস্ততা, এমনকী চরের উপরে পাখি-পাখালিও স্থির নাই; কাদাখোঁচা ছোটো পাখিটাও এত বড়ো গাঙের পাড়ে পাড়ে চলিতেও বিশেষ ভয় পাইতেছে না, গাঙের স্রোতের বা ঢেউগুলির রীতি-প্রকৃতি যেন তাহারও ভালোভাবেই জানা আছে।

মুখে একগ্রাস আহার তুলিয়া হোসেন বলিল : আহ, আপনার রান্নাটা বড়ো ভালো হইছে!

মাঝিও খুশি হইল : সবই কপালগুণ! ভাগ্য! এইটা জোটে তো সেটা জোটে না। এত তালাশ করলাম তবু কোনোখানেই কচুর লতি চোখে পড়ল না। পাশে সেইসব দিতে পারলে আরও মজা হইত। আমি কী রাঁধতে জানি। দায়ে ঠেকিয়া করতে শিখছি। আমাগো যা অবস্থা তাতে নুন আনতেই পান্তা ফুরাইয়া যায়!

হোসেন তাহার হাসিতে যোগ না দিয়া আবারও বলিল : নাহ, খুউব ভালো খাইলাম।

: সবই ভাগ্য! এখন একটা ভালো খেপ পাইলেই হয়। ওইটাও ভাগ্য, তবে তার জন্য কেবল অপেক্ষায় থাকাই যথেষ্ট না।—মাঝি গলা নামাইয়া বলিল : আমি কয়েকটা মাছ ঘাট সর্দারদেরও দিয়া আসছি। তবে তারে এমন খুব একটা খুশি মনে হইল না। তার এক চেলা গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কয়, এইসব মাছের এইদিকে অভাব আছে নাকি, আরও কয় কেন জিয়ল মাছ লইয়া আসি নাই! এমনি খাই বাড়ছে উনাগো যে এইসব আর মুখে রোচে না। আমার কাছে তাজ্জবের বিষয় এইটা যে গাঁও-গ্রামে থাকতে এইসব মানুষের মুখে তিতপুঁটিটাও জুটত না। বুঝলা, আবার এই ঘাটে আসতে হইলে আমারে জিয়লমাছ লইয়া আসতে হইবে। ওই মাছ কয়টা না দেওনই ভালো আছিল!

হোসেন গাঙপাড়ের নৌকাগুলির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া ধীরে ধীরে বলিল : কৌশল করিয়া বড়ো হইছে, ক্ষমতা লইছে।

: থাউক—মাঝি হাত উঠাইয়া মানা করিল : মানিয়া যাওয়াই ভালো। এই সব কথা কেউ একবার ওনাগো কানে উঠাইলে আর এই ঘাটে ঠাঁই হইবে না। এই তো দেখো, এত নৌকা, এত মাঝি কিন্তু সককলে একজনে আরেকজনের কাঁধে পাও দিয়া উপরে উঠতে চায়। তা না হইলে এই ঘাটের কামকাজে সককলেরই কিছু না কিছু উপায় থাকত।

হোসেনও অন্যমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিল : হ, বোধ করি আপনারও উনারে মাছগুলান দেওন ঠিক হয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ মাঝি একটু অপ্রতিভ বোধ করিল, কিছুক্ষণ উসখুস করিয়া বলিল : হ, একরকম ঝোঁকের মাথায়ই আউগাইয়া দিতে গেলাম। ওই যে কইলাম কিছু না দিয়া থুইয়া পারি না। কাছ দিয়া যাইতে আছিলাম মাছগুলান বেচনের আশায়, তার দলবদলের চোখ পড়ল, তাই আগ বাড়াইয়া দিতে গেলাম, আর অন্য বিবেচনা করি নাই।

হোসেন পাড়ে নামিবার উদ্যোগ দেখাইল : চলেন, দেখন যাউক ভাগ্যে কী আছে! ঠিকই কইছেন, আশায় আশায় কেবল নৌকায় বসিয়া থাকলেই কেউই আর ডাকিয়া জিজ্ঞাস করবে না। উপস্থিত না থাকলে চাল-চালিয়াতরা আরও সুবিধা পাইয়া যায়। আমি দেখি যার রিজিকের চিন্তা তারই করতে হয়!

ছবদার খুব একটা উৎসাহ দেখাইল না : কী-ই করার আছে এমন কুহকে। অদৃষ্ট বুঝি লেখা আছে সেই জনম হইতে। ভাটায়-জোয়ারে বর্ষায়-খরায় এতটুকু এই ডিঙি এত এত টাল খাইয়া যায়, ভাগ্যে যা আছে তারে কে কেমন খণ্ডায়।

হোসেন একটু অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল : একটুকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল : এইটা কোনো কথা হইল মাঝি! এর মাইনি এই যে যা হইবে, আমার কোনো চেষ্টার কোনো ফল নাই?

ছবদার মাঝি একটু ইতস্তত করিল : তারপর পাড়ে নামিতে বলিল : বুঝি না, কোনো দিন বোঝারও সাধ্য হয় নাই। বিদ্যাবুদ্ধি যারগো আছে, যারা লিখন পড়ন জানে, তারা কয় মনুষ্য বড়ো ক্ষুদ্দুর, উপরের হুকুম ছাড়া নাকি কিছুই হয় না, কোনো কিছু বদলাইবার কিছুমাত্র সাধ্য মানুষের নাই। পুথিয়াল বলে, সেই একই সূর্যচন্দ্র নক্ষত্র পৃথিবী, তার তলে ঢেউ নাচে জনম অবধি। আমরা ঢেউ হইয়া পাড়ে উঠতে চাই মাটি খামচাইয়া, তবু সোতে ভাসিয়া যাই।

হোসেন জোরের সঙ্গে মাথা দোলাইল : এই কথা পছন্দ হইল না মাঝি, আমি মানিয়া লইতেও পারি না। কেমন যেন আমার এক কবিয়াল বন্ধুর কথার মতো শোনাইল। আমি এই ডেনার, এই মাথার উপর আস্থা রাখি। এমন কবিয়াল-পুথিয়ালরা কেমন যেন আউলাইয়া দেয়। ভাবের কথায় ভবি ভোলে না, আছে সে থাউক মনের মধ্যে। এই দেহের আহার জোগাইতে হয় আগে, তারপরে সব কাব্য-কথা। আমি লড়াইতে নামছি, এখন আর পিছন ফিরতে চাই না।

ছবদার মাঝিও নামিয়া আসিল : বোধ করি বয়সই হইয়া গেছে! দুনিয়াটা ঠাহর করিয়া এখন কেমন যেন ভয় পাইয়া যাই। লড়াই করতে তো আমিও রাজি। কেবল পথের দিশা পাই না। দাস-এর ভাগ্য মানিয়া লইছি বলিয়াই তো এখনও তক প্রাণে বাঁচিয়া আছি।

পাড়ে থকথক কাদা, পায়ের গোড়ালি অবধি ডুবিয়া যায়। শুকনার কাল হইলে পাশে হাট বসিত, মনোহারী দ্রব্যের দোকান বসিত চতুর্দিকে, আর বিরাট বিরাট শামিয়ানা টাঙাইয়া জীবন-যৌবনের উদ্দেশ্য-আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিত বড়ো বড়ো মহাজন। এখন কেবল কাদাখোঁচা পাখিগুলি ভয়ে ভয়ে তাহাদের আহার খুঁজিয়া ফিরিতেছে পুচ্ছ নাচাইয়া, তবু সে-ও সাবধান।

এমন যে কাক, তাহারাও সম্ভবত গঞ্জের শোরগোলের আগে পাশে ভিড় করিয়াছিল; মনে হইতেছিল কোনো মহোৎসবে যেন সারা ভুবনকে সচকিত করিয়া রাখিতেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনের কোকিল আর ডাকিস না রে
ও সে কদম্বডালে
প্রাণ বঁধু নাই যে মোর ঘরে রে
এ বসন্ত কালে।

কতদিন হইয়াছে বঁধু গিয়াছে ছাড়িয়া
মনেরে বুঝাইয়া রাখি প্রাণেতে বাঁচিয়া
না জানি কার সে গুণে গিয়াছে ভুলিয়া।

সে আসবে বলে আমি রইয়াছি সাজিয়া
নিশীথে জাগিয়া থাকি পন্থপানে চাইয়া
যৈবন কাটিছে অকালে।

আগে যদি জানতাম রে কোকিল
পিরিতের এত জ্বালা
নিতাম না আর গলেতে রে
প্রেম-কলঙ্কের মালা ॥

গীত-গান শিকদারের না পেশা না নেশা। কিন্তু তাহার ছেলেবেলা হইতেই সে সেইদিকে প্রবণতা দেখাইতে শুরু করিয়াছিল।

এই সময় বেশ জম-জমাট ছিল তাহাদের ঘর-গৃহস্থালি। খন্দের সময় রবরবা হইয়া উঠিত সব। উঠানের একধারে অহোরাত্র ধান মাড়াই-মলাই হইত একপাল গোরু জুড়িয়া, কামলা লাগানো হইত পায়ে দলিয়া ধান মাড়াইবার জন্য। অন্য একধারে বড়ো বড়ো টেকদানে সিদ্ধ হইত ধান। আর তাহারই ফাঁকে অবসরে পুঁথি-পড়া ছাড়া কি ধাঁধার আসর বসিত নিত্য নিত্য। এইসব বিষয়ে দাদা করমালীর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। তাহারই কোলে বসিয়া কখনও মুখে মুখে ধাঁধার ছড়া বানাইয়া কখনও বা অন্য অন্য কামলা বা জন-মুনশীদের মুখে শোনা গীতের কয়েক চরণ অবিকল গাহিয়া সে সকলকে অবাক করিয়া দিত। একবার পৌষমাসে একদল কবিয়াল-বয়াতি আনা হইল অন্য কোনো মুলুক হইতে; খাতির করিয়া তাহারা কিশোর শিকদারকে দোহার করিয়া লইল। যতদিন তাহারা ছিল শিকদার আর তাদের সঙ্গ ছাড়িতে পারে নাই। তাহারা বিদায় হইয়া যাইবার পরও শিকদারের গায়ক খ্যাতি রহিয়া গেল। দাদা করমালী একটা দোতারা বানাইয়া ছিলেন শখ করিয়া যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন সন্ধ্যাবেলা তন্ময় হইয়া একটার পর একটা গীত শুনিতে চাহিতেন। মাঝে মধ্যে গ্রামের আরও অনেকে সেইসব আসরের ধারে কাছে আসিয়া বসিত। সেই সব গীত-গানের বেশিরভাগই কবিয়াল-বয়াতিদের মুখে শোনা, কিন্তু দাদা-দাদিরাও জানিত, কিছু সে নিজেও ইতস্তত ঘুরিয়া ফিরিয়া সংগ্রহ করিয়াছিল। কবিয়ালদের সংসর্গে তাহার একটা বড়ো লাভ হইয়াছিল লিখন-পঠনের তালিম; কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হইবার আগেই একটা দূরন্ত ধাক্কায় সবকিছু টাল-মাটাল হইয়া গেল। একদিকে প্রচণ্ড মহামারিতে উজাড় হইয়া গেল সমস্ত পরিবার, অন্যদিকে জমিজমাও হাতছাড়া হইয়া গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা-রাজ্য বদলাইবার গণ্ডগোলে; কিশোর শিকদার বড়ো একা পড়িয়া গিয়াছিল। আত্মীয়কূল যাহারা সেই মহামারিতে টিকিয়া গিয়াছিল, তাহারাও যতটা শিকদারের বিষয়-আশয় গ্রহণ করিল, সেই অনুপাতে তাহার দিকে বিশেষ একটা মনোযোগ দেখাইল না। একদিন সব ত্যাগ করিয়া শিকদার নিজের পুরাতন ঘর-বাড়িতেই ফিরিয়া আসিল। একে একে বেশ কয়েকটি বছর ঘুরিয়া গিয়াছে পরে, কিন্তু সেই 'ছাড়া' ঘর-গৃহস্থালিকে আবারও গুছাইয়া সাজাইয়া লইবার সাধ্য সামর্থ্য তাহার হয় নাই। ভাঙা বাড়ি-ঘরের একধারে দাওয়ায় বসিয়া সে-ও মাঝে মধ্যে গীত-গানের পত্র-পুথিগুলি নাড়াচাড়া করে, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনো সমাধান খুঁজিয়া পায় না, দাদা করমালীর দেওয়া সেই শখের দোতারাটাও একধারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকে; শিকদারও অন্যমনস্কভাবে বাহিরের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া আরও উন্মনা হইয়া যায়।

ফলে এক এক সময় ঘর-গৃহস্থালির সাধারণ কাজকর্মেও অঘটন ঘটিয়া যায়। আহার্য প্রস্তুতের সময় একঠায় উনানের কাছে বসিয়া থাকিলেও হয় রান্না পুড়িয়া না হয় গলিয়া আহারের অযোগ্য হইয়া ওঠে, তবুও তাহার জন্যও শিকদারের কাছে জগৎ-সংসার অর্থহীন বলিয়া মনে হয় না। উনানের উপর হাঁড়ির মধ্যে কিছু চাউল, কিছু সবজি আর কয়েকটা লঙ্কা পেঁয়াজ ছাড়িয়া দিয়াই সে মহাকীর্তির আনন্দ অনুভব করে; তারপর এক সময় পোড়া বা গলা যাহাই পাতে নামাউক কোনো রকম আপশোশ সে কখনওই করে না; বাড়তি কিছু থাকিলে উঠানের পাখি-পাখালিগুলিকেও দিতে-থুইতে তাহার ভুল হয় না। কেবল কিছুই জোটে না যখন সেই সময় বিষয়-সম্পত্তির কথা মনে উঁকি দিয়া যায়, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। একদিকে শৈশবকাল হইতে সে শুনিয়া আসিতেছে, বিশ্ব-সংসার আপন নিয়মে চলিতেছে, মানুষের উদ্যোগ আয়োজন তাহার কোনো কিছু বদলাইতে পারে না; অন্যদিকে যেই সমস্ত জমি-জমা-সম্পত্তি বংশসূত্রে তাহার নিজস্ব হইবার কথা, তা এখনই আত্মীয়কুল অথবা অন্যান্যের ভোগ-দখলে, সে কখনও যা কোনোভাবেই মুক্ত করিয়া লইতে পারিবে না। জোর-জবরদস্তি অথবা দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে কখনও নিজেকে জড়াইতে উৎসাহবোধ করে নাই। সে ক্রমাগত গীত-গানের চর্চার মধ্যেই তখনও নিজেকে ব্যস্ত রাখিতে চাহিতেছিল। কিন্তু ইদানীং এ বিষয়েও তাহার মধ্যে একটা স্থবিরতাবোধ জমিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছিল। বুকের মধ্য হইতে গলায় যত সুরই আসুক তাহার সঙ্গে উপযুক্ত কথা মিলাইতে গিয়াই গোল বাঁধিয়া যাইত; কোনো কথাই যেন আর মনঃপূত হইতে চাহিত না। কিছু অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ পাইয়াছিল সে বয়াতির কাছে। একদিন মহা উৎসাহে লেখার জন্য তালপাতা আর কালিও প্রস্তুত করিয়াছিল নিজে, খাগের কলম বানাইয়া লইয়াছিল পরম যত্নে, কিন্তু অগ্রসর হইবার কালেই তাহার সমস্ত উৎসাহ নিভিয়া যাইতে শুরু করিল। একদিকে নিজের অতৃপ্তি, অন্যদিকে খেয়াল হইল বাস্তব জীবনে সেইসব গীত-গানের ভাবাবেগ অথবা কথার আদৌ কোন মূল্য নাই।

এইসব বোধ তাহাকে ক্রমাগত অসামাজিক করিয়া তুলিতেছিল। যাহার জীবনে আনন্দ নাই, উৎসাহ নাই, কোনো উদ্দেশ্য নাই; তাহার নিকটে আসিতে কেউই কোনো আগ্রহবোধ করে না। সে নিজেও বুঝিতে পারে দুনিয়ার মানুষের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা লইয়া আপন করিতে গিয়া সে নিজেই এখন অপাংক্তেয় হইয়া রহিয়াছে। তুষের আগুনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো একটা কষ্ট তাহার বুকের মধ্যে ধিকিয়া ধিকিয়া জ্বলে, কিন্তু তাহার কবল হইতে মুক্তির কোনো উপায়ই সে পাইতেছিল না।

হোসেন বলিয়া গিয়াছিল তাহার ঘর-বাড়ির দিকে দৃষ্টি রাখিতে। শিকদার ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে হোসেন চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখে নাই। তাহার ছোটো বাড়ি-ঘরের সব ঠাঁইতে কিছু না কিছু ফলাইবার আগ্রহ তাহার অপরিসীম। নিজের পৃথিবীর চতুর্দিক খুঁড়িয়া-চুঁড়িয়া সে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর। শিকদারের মনে হয় সে যেন একই রকম যুদ্ধের মেজাজ লইয়া এখন বৈঠা হাতে গাঙে নামিয়াছে। উঠানের দুই ধারে সবজিখেত, ঘরের বারান্দার চালে কচি লাউলতার বিস্তার, নানারকম ফল-ফলারির গাছে বাড়িয়া ফুটিয়া উঠিবার আকুতি লক্ষ করিয়া শিকদারের বারংবারই মনে হইতে লাগিল হোসেনকে সাহায্য করা দরকার। তাহার নিজের জীবনে শ্রী-ছাঁদ না-ই থাকুক, কিন্তু হোসেনের উদ্যমে যথাযোগ্য সহায়তা করিতে পারিলে তাহারও আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না। এক সময় নিজের সঙ্গেই অনেক যুক্তিতর্ক করিয়া সে আবারও গঞ্জে আলীর বাড়িতে উপস্থিত হইল।

সে কোথায় কী কাজে গিয়াছে; কিন্তু তাহার কবিলা প্রত্যাশার অতীত খাতির-যত্ন দেখাইল। ঘরের কপাটের আড়াল হইতে পান-সুপারি ঠেলিয়া দিয়া সে মৃদুস্বরে বলিল : গেদির বাপের মন-মেজাজ ভালো নাই আইজ কাইল, কেবলই কাজ-কামের ধাঁধায় কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সংসার যেন তার পক্ষে বড়ো জ্বালা হইছে।

: কেন, নতুন করিয়া আবার কী হইল?—শিকদার পানের থালাটা গ্রহণ করিয়া উৎসুক্য দেখাইল বটে, কিন্তু কপাটের অন্যপ্রান্ত হইতে কোনো জবাব আসিল না; সাড়াশব্দে সে টের পাইল সম্ভবত সখিনাও তাহার মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

: নতুন কী আর হয় আমাগো নাহান গরিব-গুর্বার সংসারে! এক জট খুলতে যাইয়া আরেক জটে বাঁধিয়া পড়নই কপালে লেখা আছে।—কথার মাঝখানে স্বরপরিবর্তন করিয়া ধমক দিল কাহাকে : তুই যা এখান হইতে। কইলাম তো অন্য কোনো কামেকার্যে মন দিতে। আমারে দুইটা কথা কইতে দে। ওনার কি তামাকের অভ্যাস আছে?

: না, না।—শিকদার শশব্যস্তে বলিল : আপনে ব্যস্ত হইবেন না। হোসেন আপনাগো খুবই আত্মীয় জ্ঞান করে। আমিও সেই রাবিদে একটু খোঁজ-খবরের জন্য আসলাম।

: কোথায় সে? এই কিছুদিন যাবৎ তারে একবার বোলাইয়া আনার মানুষও পাইলাম না। আমরা মাইয়া মানুষ, অন্তঃপুরের বাসিন্দা। ইচ্ছামতোন সবকিছু কি আর সাধ্যে কুলায়।

: কেন, কী বিষয়?—শিকদার আবারও ঔৎসুক্য দেখাইল : নাও লইয়া বাহির হইছে, তবে তেমন দরকার পড়িয়া থাকলে খবর দেওয়া অসম্ভব হইবে না।

: নাহ্, এখন আর কোনো লাভ নাই। যা হবার হইয়া গেছে। ভাগ্যের বিষয় কেউ আর কখনও খণ্ডাইতে পারে না। আমার কেবল আপশোশের কথা এইটাই যে মাইয়া মানুষ করলাম এত ছিদ্দত করিয়া, তবু তার বিয়া-শাদীর বিষয়ে আমি যেন পর হইয়া রইলাম। কী হয় মানুষের ঘর-পরিবার মুল্লুক দিয়া যদি হাসিয়া খেলিয়া বাঁচিয়া থাকনের সুযোগ না পাওন যায়?—গঞ্জে আলীর কবিলা আরও বিস্তৃতভাবে বলিল : গেদির বাপে যুক্তি দেখাইল মানুষ কত আর মুল্লুক বদলাইতে পারে? একদিন না একদিন তারে এক রাজ্যে থির হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, এক না এক রাজা মানিয়া লইতে হয়। আমিও বিশেষ কোনো ওজরআপত্তি তুলি নাই। তখন তো আর মাইয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনোরকম দুশ্চিন্তার কারণ হয় নাই। এখনই না মাইয়ার কাছে শুনি কত বড়ো হাড়ে-হারামজাদার ঘরে মাইয়ারে তুলিয়া দিছি। মাইয়া সেই যে বাপের বাড়ি বেড়াইতে আসার নাম করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, আর ওই বাড়ির দিকমুখি হইতে চায় না। এই সঙ্কটে সকলেই বড়ো অশান্তিতে আছি।

শিকদারের মুখে অনেকক্ষণ অবধি কোনো কথা জোগাইল না; মুখ নিচু করিয়া সমস্ত বিষয়টা বুঝিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল।

: গোড়ার দিকে মাইয়ার অমতের ভাব আমরা খুব আমলে আনি নাই। একটা ঠাঁই ঠিকানার যুক্তিতে অন্য সব বিষয় গৌণ হইয়া গেল। এখন তো নানান বিপদ আরও বিষম হইয়া দেখা দিছে। এখন সেইসব ভাবনায় গেদির বাপ আরও আউল বাউল হইয়া এইদিক-সেইদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে আছে।

শিকদার উঠানের দিক হইতে দৃষ্টি ঘুরাইয়া হঠাৎ জানিতে চাহিল : হোসেনকে তালাশের কারণটা কী আছিল?

গঞ্জে আলীর কবিলা বেশ একটু সময় লইল জবাব দিতে : এখন আর সেই সব বলার কি কোনও লাভ আছে। উঠাইয়া লইয়া যাওনের আগেই মাইয়ার কাছে যা টের পাইলাম, যেমন তার মনের কথা ঠহর পাইলাম, তখনই হোসেনের কথাটা মনে উদয় হইছিল কিন্তু কিছু করণ গেল না। এই জগৎ-সংসারের রীতিনীতি বদলাইয়া ফেলনের জন্য অবলা মাইয়া জাতির এমন কী-ইবা শক্তি আছে!

অকস্মাৎ শিকদার নিজেকেও একটু অপরাধী বোধ করিতে লাগিল; ভাবিতে শুরু করিল যে নিজ অভিজ্ঞতা দিয়াই পৃথিবীর সমস্ত স্ত্রী-জাতের উপর কোনো চূড়ান্ত ধারণা সঙ্গত হইতে পারে না; ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। সখিনাকে সে চেনে না, জানে না, অথচ তাহার প্রতিও সে সহানুভূতি বোধ করিল।

: এইসব বিষয় আগেই বোঝন উচিত আছিল!'—কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে কী হয় নাই, আর গঞ্জে আলী কবিলাই বা কোন বৃত্তান্ত দিতে শুরু করিল, সেইসব দিকেও আর খুব একটা মন দিতে পারিল না শিকদার; একটু ইতস্তত করিয়া কেবল বলিল : হাওলাদারের এখনও সাক্ষাৎ নাই। এইবার আমারেও উঠতে হয়।

: কপাল, সবই কপাল!—কেবলই আপশোশ করিতে শোনা গেল গঞ্জে আলীর কবিলাকে; শিকদারকে উঠানে নামিতে দেখিয়া সে-ও কপাটের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল; আর ঘরের বাহিরের বেড়ার কাছেও একটি কিশোরী মেয়েকে উঁকি দিতে দেখা গেল!

শিকদার দৃষ্টি ফিরাইয়া বাড়ির পথ ধরিল : দ্বিতীয়বার ফিরিয়া দেখিবার সাহস পাইল না; মনে হইতে লাগিল সে বুঝি বা আরও কোনো দুর্জ্ঞেয় সমস্যার মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে। তবুও কয়েক পা অগ্রসর হইয়াও তাহার গতি শ্লথ হইয়া পড়িল। গঞ্জে আলীর কিশোরী কন্যা এবং তাহার এককালের সঙ্গিনী জোবেদার মধ্যে সামঞ্জস্যের বিষয়গুলি খেয়াল করিয়া সে বেশ কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মুখ তুলিলে সে যেন এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাইবে বৈশাখের এক তপ্ত মধ্যাহ্নবেলা। গাছ-গাছালি ঘেরা বাড়িয়ালের একধারে ছুটিয়া গিয়াছে শিকদার আর অন্যদিক হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁচল উড়াইয়া আসিয়াছে জোবেদা; কাছের পুকুরে আকাশ যেন আরশিতে মুখ দেখিতেছিল। এখনও যেন স্পষ্ট কানে ভাসিয়া আসে জোবেদার চাপা কণ্ঠস্বর : এই, গলা উঠাইও না কবিয়াল, মনে কয় চতুর্দিক নিঝুম হইয়া কান পাতিয়া রইছে।

বাড়িয়ালের পিছনে, আমবাগানের ধারে, আইলের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল দুইজনে; উপরে ডালপালার মধ্যে মাঝে-মধ্যে মর্মরস্বর, সামনের ধানখেত শুকনা 'নাড়া'র গোড়াগুলি লইয়া ধূ ধূ করিতেছে, আরও দূরে কোথাও একটা চলতি নৌকায় লগি রৌদ্রে ঝকঝক করিয়া উঠিতেছে বারংবার; কেবলই মনে হইতেছিল কোন দূর দক্ষিণ হইতে উদ্দাম হাওয়া খুব শিগগিরই ধাইয়া আসিতেছে, মেঘের দল আগাইতেছে দল বাঁধিয়া, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমগাছের ডালে ডালে ভর-বাড়ন্ত কচি আমগুলির মধ্যে চাঞ্চল্যের আর সীমা রহিবে না। আইলের উপর হইতে পা ঝুলাইয়া বসিবার কালে সাবধান করিয়া দিয়াছিল শিকদার; একধারে পুরানো শামুকের আর কচ্ছপের ডিমের বাসাগুলির দিকে ইঙ্গিত করিয়া সাপের গর্তের কথা বলিয়াছিল; তৎক্ষণাৎ ভীতভাবে তাহাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিয়াছিল জোবেদা; পরক্ষণেই লজ্জা পাইয়া উঠিয়া গিয়াছিল; বাড়িয়ালের আড়াল হইতে সে-ও যেন একইভাবে উঁকি দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল। শিকদার হাসিতে চাহিল; কিন্তু পারিল না। কয়েক পা চলিবার পর আবারও যেন সেই দিনক্ষণ অন্যদিক হইতে চোখে পড়ে; মনে হয় সময় ও স্থানের সমস্ত প্রতিকূলতা এড়াইয়া সব কিছুই যেন অবিকল রহিয়া গিয়াছে।

AMARBOI.COM

আইলের অন্য আরেক ধারে বসিয়াছে দুইজন, খুবই কাছাকাছি। দুপুরের আহারের পর এক গাল পান খাইয়া মুখ লাল করিয়া তুলিয়াছে জোবেদা; ঠোঁট দুইটি পাকা মরিচের মতো উজ্জ্বল লাল। শিকদার বারংবার তৃষিতের মতো দেখিতেছিল, এটা-সেটা কত কথা, কিন্তু কোনোটাই যেন জমিয়া ওঠে না। দূর দিগন্তের দিকে অনেকক্ষণ অবধি চাহিয়া থাকিয়া একসময় জোবেদা বলিয়া উঠিয়াছিল : দূর ছাই, কিছুই আর ভালো লাগে না।

শিকদারও মাথা দোলাইয়াছিল : হ, আমারও তাই! শুনবা নোতুন বাঁধা গীতটা?

: নাহ, এখন না! জোবেদা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল : চাপা গলায় গীত-গান ভালো লাগে না। তুমি যখন আসরে বসিয়া গলা ছাড়িয়া গীত ধরো তখনই না আমার ঠিক এইখানে—বুকের উপর হাত দিয়া জোবেদা বলিয়াছিল : কেমন একটা উথাল-পাতাল শুরু হইয়া যায়। অন্য মানুষজন ধারে-কাছে থাকে বলিয়াই সামলাইয়া উঠিতে পারি। হ, এমন নিরজনে বড়ো ভয় হয়!

এক পশলা হাসি ছড়াইয়া জোবেদা বাড়ির দিকে যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; গলা নামাইয়া জানাইয়াছিল : বেলা পড়িয়া আসতে আছে এখনই চতুর্দিকে লোকজন বাহির হইয়া পড়বে। জানি তো, কোন বাড়িতে আইজ সন্ধ্যায় আসর বসবে, আমার শুনতে ভুল হইবে না! হ, দেখমু, আমারে আউলাইয়া দেওনের লাহান কেমন ক্ষমতা তোমার আছে!

অথচ তাহাকে কোনো রকম 'আউলাইয়া' দিবার কোনো ইচ্ছা শিকদারের ছিল না। সেই সন্ধ্যার আসরে আরও আবেগ প্রকাশ দূরে থাকুক, বরং সে খুবই সংযতভাবে তাহার সকল গানগুলি পরিবেশন করিয়াছিল। তবে গানের আসরে একটা বাতির সম্মুখে বসিয়া তাহার বারংবারই মনে হইতেছিল চতুর্দিকে কেউ কোথাও নাই, দেহমনের কোনো গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুপ্তস্থান হইতে অন্য কেউ উঠিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত-চৈতন্য আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কী বা কে যে সেই সব গীত-গানের উদ্দীষ্ট তাহা সে নিজেও পরিষ্কার বুঝে নাই, কার খুশিতে ঘোর আন্ধারের মধ্যেও তারার বাতি জ্বলে, কার দুঃখ লইয়া মোতির মেলা বসে বিহান-বেলায় দূর্বাঘাসে, কার জন্য ঝড়-তুফান-দেয়ই-ঠাটা উপেক্ষা করিয়া ধাইয়া চলে যুবক-যুবতীর গোপন চৈতন্য—সেই সব সে নিজেও কখনও খুব একটা 'তবধে' আনিতে পারে নাই। অথচ নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া নিঃস্ব করিয়া দিবার একটা আকাঙ্ক্ষাই যেন বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। আসরের শেষে, যখন দোতারাটি পিঠে ঝুলাইয়া নিজ বাড়ির পথে চলিয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ অন্ধকারের মধ্য হইতে জোবেদা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সম্মুখে : কোনো কথা নাই, সম্বোধনও নাই, সবেগে সে শিকদারকে নিজের দেহের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া আবারও অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল। শিকদারের পক্ষে কোনো কিছু বলিবারও অবকাশ হয় নাই, সে দেয়ও নাই।

আউলাইয়া গেল শিকদারই স্বয়ং। বেশ কয়েকদিন আর দেখা পাইল না জোবেদার, কত ঘোরাঘুরি করিয়াছে তাহাদের বাড়িয়ালদের কাছাকাছি, পাছদুয়ারের আম-জাম গাছের বাগানে। তখন 'খন্দের কাল'। হাট-মাঠ-ঘাট ভরভরাট, কখনও কোথাও আর কোনো নির্জনতা নাই। শিকদার ভাবিয়াছিল, হয়তো ঘর-গৃহস্থীর কাজকর্মেই জোবেদা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেও নিজের সামান্য সংসারের দিকে মনোযোগের প্রবণতা অনুভব করিয়াছিল! এই সময় হঠাৎ একদিন কানে আসিল জোবেদার সম্বন্ধের কথা। প্রথমটা একটা বিমূঢ় বোধ করিলেও সে আর অন্য কোনো বিষয়ে মন বসাইতে পারিল না।

একদিন দেখা হইল পুকুরঘাটের কাছে। তখন ভর দু-প্রহর বেলা। পাছদুয়ারের পুষ্করিণীতে স্নান-সমাপন করিয়া জোবেদা ঘরে ফিরিতেছিল; কাঁখে কলসি; দূর উপরের আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল কতকগুলি অক্লান্ত চিল; প্রখর রৌদ্রের মধ্যে চতুর্দিকের প্রকৃতিকে বড়োই অসহায় দেখাইতেছিল। কেবল শিকদারের উপস্থিতিই নয়, সদ্য সিক্ত বসনও যেন জোবেদার গতিরোধ করিয়া দিল। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সে নিজের বসন সংবরণে ব্যস্ত হইয়াছিল।

: ছি! এরকম পাছদুয়ারে ঘোরাঘুরি করো ক্যান তুমি?

শিকদারের মুখে কথা জোগায় নাই, মুখ নামাইয়া একসময় বলিয়াছিল : অনেকদিন তোমার দেখা পাই না।

জোবেদা কাঁখ হইতে কলসিটা নামাইয়া রাখিয়াছিল; অন্য কোনো কথা না খুঁজিয়া সে আবারও সেটা তুলিয়া লইল : রোজ রোজ দেখা হওনেরই বা এমন কী কথা আছে? কোনো কড়ার নাই। আর আমিও তেমন আর বাহির হইতে পারি না। কিছুদিন ধরিয়া সককলেই যেন আমারে আউগলাইয়া রাখছে, মনে কয় যেন হাঁস-মুরগির ছানার লাহান। একটু চৌখের আড়াল করলেই ওই চিল-শকুনের লাহান কেউ ঝাঁপ দিয়া লইয়া যাইবে! এই রকম ডাঙর না হওনই বোধ করি ভালো আছিল!

শিকদারের মুখে কথা জোগায় নাই। গীতগানে কথা বা সুর সাজাইতে না পারার মতো একটা অখুশি মনে ক্রমাগত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল; কেবল এক সময় বলিতে বাধ্য হইল : একটা কথা শুনলাম বলিয়াই এমন করিয়া তোমার জন্য উদ্বেগ বোধ করছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোবেদা একবার তাহার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া বলিয়াছিল : উদ্বেগের কী আছে। মাইয়াছেইলা হইয়া জন্মাইলে একদিন পরের বাড়ি যাইতেই হয়। তুমি পথ ছাড়ো, আমারে এখন ঘরে যাইতেই হয়। কেউ কোনোখান থেকিয়া দেখিয়া ফেলাইলে আমার বাপ-চাচা আমারে জ্যান্ত পুঁতিয়া ফেলাইবে।

শিকদার ধীরে ধীরে তাহার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সুরে আর ছন্দে কথা সাজায় সে, কিন্তু সেইদিন অসংলগ্নভাবে কেবল বলিতে চাহিয়াছিল : এমন যে হইতে পারে, সেই কথা কক্ষনো আমি চিন্তাও করি নাই।

জোবেদা কয়েক পা অগ্রসর হইয়া মুখ ঘুরাইলও : সেইখানেই তো কথা। মনে কয় তোমার আর অন্য কোনো সাধ নাই, সাধ্যও নাই।

শিকদার তবুও তাহার কাছে আগাইয়া গেল : এইটা কী কইলা?

: ঠিকই কইছি! আঁচলটাকে আবারও মুখের কাছে টানিয়া লইয়া জোবেদা বলিল : সককলেই কয় ঘর সংসারের উপর মমতা নাই বলিয়াই তোমাগো বংশ এমন সহজে উজাড় হইয়া গেছে। তোমার কোনো উদ্বেগ বাস্তবিকই থাকলে তুমি সেই মতো উদ্যোগ আয়োজন করতা। কেবল গীত কথা দিয়া ভরণ-পোষণ হয় না। সককল বাপ-মা-ই চায় নিজ নিজ মাইয়া ভালো পাত্রে দিয়া অবস্থার উন্নতি। তোমর কথা কেউরই বিবেচনায় আসে নাই, আর আমিও কিছু করতে পারি না। তুমি যাও, যাও মিছামিছি আর অন্যের রোষের কারণ হইও না।

সেই তখনকার স্তব্ধতা যেন আর কখনও কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হয় নাই শিকদার; অনেক দিন রাত্রি এই বিষয় লইয়া বিচার-বিবেচনা করিয়াছে, কখনও কখনও দেহমনের সমস্ত আকুতি, ব্যথা এবং বেদনাকে গীত-গানে মিটাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে, তারপর জীবনের সমস্ত বহিরঙ্গের দিকে একটা অতি নিদারুণ ঔদাস্যবোধ তাহার সমস্ত চিত্ত চেতনাকে আশ্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল।

দাদা করমালীর কথা মনে পড়িত। খুব ছোটো বয়সে তাহার সব কথাবার্তা চাল-চলন বুঝিতে পারি নাই; এখন বয়স হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জগতের নানা বিষয় লক্ষ করিয়া বারংবার তাহার কথা মনে হয়। উঠানের একধারে তিনি দোতারা কোলে লইয়া বসিতেন। বাড়িয়ালের মধ্যে ধানমলা, ধান বাছাই কিংবা সংসারের কোনো কাজ-কর্মই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিত না। একমনে অজস্র গীত-কথার স্রোতের মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া তিনি গল্প শুরু করিয়া দিতেন।

: দেখিস একবার ভালো করিয়া চাইয়া ব্রহ্মপুত্রের দিকে, ওই গাঙে ভাসিয়া আসছি নীচে। গাঙের ঢেউ যেমন পাড় খাবলাইয়া উপরের পাড়ে উঠতে চায়, থির হইতে চায়, তেমনই আমরাও এমনই একটা জন্ম-মৃত্যুর চক্করে বাঁধা পড়িয়া গেছি যে উদ্ধারের উপায়ও জানি না।—পরক্ষণেই তিনি চক্ষু মুদিয়া গাহিয়া উঠিতেন :

এই লীলাখেলা সব সাঙ্গ হবে।
যেথাই হইতে আইসেছিলে সেথা যাবে
ধন দৌলত সব পইড়ে রবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর কথা আর কেই বা কবে
কেবল অন্তর্যামী রাখবে তোরে অন্তরেতে।

শিকদার আজও পর্যন্ত তাহাকে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। সংসারে স্বাচ্ছল্য ছিল, আর কোনো গুরুতর পরিশ্রমও করমালীকে কখনও করিতে হয় নাই; নানারকম ভাব এবং তত্ত্ব-কথা লইয়া দিনাতিক্রমণ তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই; সংসারের ভাঙনও ছিল তাহার কাছে অবধারিত। কিশোর শিকদার বারংবারই বুঝিতে চাহিয়াছে কে সেই অন্তর্যামী, কে-ই বা সকল মানুষের ভাগ্য আগে হইতেই নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, কিন্তু কখনও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, নানারকম লোকবিশ্বাস অনুসরণ করিতে করিতে একটা ধাঁধা তাহার সমস্ত চিত্ত-চৈতন্যে আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে-মধ্যে তাহার গীতগানের প্রবৃত্তির মধ্যেও একটা সংশয় জাগিয়া ওঠে। দোতারাটাকে ঠেলিয়া রাখিয়া সে জগৎ সংসারের সব রূপ সব সত্যকে নতুন করিয়া দেখিতে বাহির হইয়া যায়। জোবেদার সঙ্গে সেই সাক্ষাতের দিন হইতে শিকদারের সমস্ত উদ্যম যেন নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল। কী কারণে সে এমন বর্হিভূত হইয়া রহিয়াছে?

: আরে, কবিয়াল যে! এইদিকে কোথায়?

শিকদার ভাবনায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; খেয়াল করিল, দুইজন দেহাতি মানুষ তাহাদের পথ চলিতে চলিতে থামিয়া পড়িয়াছে; একটা যথাযোগ্য উত্তরের চেষ্টা করিয়া সে পাশ কাটাইয়া যাইতে চাহিল।

: আরে; খাড়াও না কবিয়াল! তোমার সঙ্গে দেখা হইয়া যাওয়া তো একটা ঘটনা। —দেহাতীদের একজন সমাদর দেখাইল : আইজকাল তোমার যে আর সাড়াশব্দও পাওন যায় না। শুনি, কেউ ডাকলেও আর যাও না!

অন্য দেহাতীও জানিতে চাহিল উৎসুকভাবে : ক্যান, ক্যান বিষয়টা কী?

: কী আর!—তাহাদের সরাসরি দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে চাহিল শিকদার : অনেকদিন আর নতুন কোনো গীত বাঁধনের সুযোগ হয় নাই।

: ক্যান, ক্যান?

অন্যজন তাহাকে বিব্রত দেখিয়া হাসিতে চাহিল : এইটা কোনো কথা হইল কবিয়াল! তোমার আসরে হাজির থাকা আমি কক্ষনো কামাই দেই নাই। কেবলি তো শুনছি নিত্য নতুন গাহন শুনাইতা। এই রকম উঠতি কালেই ক্যান যে এমন করিয়া আউলাইয়া গেলা। শোনো, একটা তারিখ ফেলাইয়া দেই, তুমি আসো, একটু আমোদ-আহ্লাদও হইবে।

অন্য দেহাতি এইদিক-সেইদিক চাহিয়া সঙ্গীকে সাবধান করিয়া দিতে চাহিল : তুমি আর সময় পাইলা না। গান-বাজনার উপর গুনাহগিরির ধমকগুলানরে যে আর খেয়াল রাখতে আছ না। তেমন কিছু করতে গেলে আগে গাঁও-গ্রামের প্রধানগো লগে কথাবার্তার দরকার আছে।

শিকদার যথাসম্ভব সৌজন্য দেখাইয়া আপন পথ ধরিল : আমার যাইতে হয় এখন বড়ো উদ্বেগের মধ্যে আছি। আইজকাইল আর তেমন কোনো চর্চা নাই।

সেই দেহাতি মাথা নাড়িয়া আপশোশ করিল : এইটা ভালো কথা না কবিয়াল, এইটা ভালো কথা না। আমাগো লাহান গরিব-গুর্বা মানুষের হাউশ-আহ্লাদ মিটানোর একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অছিলাও তো চাই। তোমার মতো গুণী মানুষের এমন করিয়া নিভিয়া যাইতে দেখতে পারি না।

তাহার সঙ্গী তাহাকে ভৎর্সনা শুরু করিল : দূর মর্দ, তোমারই দেখতে আছি আর বুঝ-হিসাব নাই।

শিকদার আর কোনো রকম অধিক কথাবার্তায় জড়াইয়া পড়িতে চাহিল না।

: তবু একদিন আসিও কবিয়াল, তোমার গীতগানে কাঁদিয়া-কাটিয়াও একটা সুখ হয়। পথ চলিতে চলিতে শিকদার আবারও উন্মনা হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ইচ্ছা হইল ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সে কিছু বলে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল কোনো কথাই সে যেন গুছাইয়া বলিতে পারিবে না। বরং অনর্থক আরও জটিলতা বাড়িয়া উঠিবে, সকল কথার একটা সরলার্থই সম্ভবত সকলের কাছে সত্য হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আরও কিছু ব্যথা-বেদনাও যে তাহার অন্তর জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল, সেই সব কথা হয়তো কেউ বুঝিয়াও উঠিতে পারিবে না। আর তা বলিয়াও কোনো লাভ নাই।

কন্যা তোমার মতি বোঝন ভার
তুমি এইকূল ভাঙিয়া ওইকূল সাজাও
ক্ষণেক হাসাও ক্ষণেক কাঁদাও
এমন করিয়া খুশি মিটাও কার
কন্যা, তোমার মতি বোঝন ভার।

গাঙের কূলে বাঁধলাম বাসনা
সেই সোহাগও যখন ভাঙেরে
কে কার তা তো আর শুধায় না
কন্যা, তুমি গাঙেরই লাহান বহো রে।
কন্যা, ধৈরযে ধৈরযে বহো
কন্যা, ধৈরযে ধৈরযে চলো রে ॥

AMARBOI.COM

হোসেন-এর বরাত ভালো, কেরায়ার জন্য বাহির হইবার পর একটা দিনও বেকার বসিয়া থাকিতে হয় নাই, হয় তাহার শক্ত সমর্থ জোয়ান শরীর দেখিয়াই চড়নদারেরা আগাইয়া আসিয়াছে, অথবা হয়তো বা নৌকার ছইয়ে শিকদারের কারুকাজই তাহাদের আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে। নিজের জন্য সে কোনো বিশেষ কিছু করে না বটে, কিন্তু অন্যের জন্য যেন নিজেকে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতে চায়। নৌকাখানিকে আরও বাহারি করিয়া তুলিবার বিষয়ে হোসেনই বাধা দিয়াছিল, চুরি হইয়া যাইবার বাস্তব সম্ভাবনার দিকে শিকদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে রোজগার জুটিতেছিল হাতে, আর চড়নদারদের কৃপায় বেশ দুইবেলা আহারও জুটিতেছিল উপরন্তু। দিনমানে গাঙে গাঙে স্রোত কিংবা ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধ, আর রাত্রিকালে যাত্রীদের ঠিকানায় বিশ্রামও জুটিতেছিল। প্রথমদিকে ক্রমাগত বৈঠা বাহিয়া সারা শরীর ব্যথায় ভরিয়া উঠিলেও সে আমলে নিতে চাহে নাই; কেবলই মনে হইয়াছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার ক্ষান্ত দিলেই তাহাকে আবার নিজ দুঃখ-কষ্টের বিবরে ঢুকিয়া পড়িতে হইবে। বরং নিত্য নতুন চড়নদারদের সাহায্যে সে জগৎ-জীবন সম্পর্কে অনেক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সুযোগ পাইতেছিল। প্রত্যেককেই মনে হইত ডাঁহা ডাঁহা চড়নদার, ভুবন জুড়িয়া তাহাদের কত রকমের কায়-কারবার, কত বিচিত্র ঘর-সংসার। ক্রমাগত ব্যস্ত থাকিয়াই তাহারা অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়া তুলিতেছে; হোসেনেরও মনে হইত সে একবার একটু ঢিলা দিলেই বিশ্ব সংসারের নানারকম সমস্যা আর ভাবনা চতুর্দিক হইতে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। এখনও গাঙে ভাসিয়া পড়িবার সময় এক আজলা জল মাথায় তুলিয়া সমীহ দেখায়, কোনো কিছু আহারের কালে কণামাত্রও আগে নিবেদন করে গাঙেয় উদ্দেশে, অথচ চক্ষু তুলিয়া চতুর্দিকে তাকাইয়া ভাব বিভোর হইবার কোনো উদ্যোগ দেখায় না; কেবল মনে হইয়াছে, গাঙের উথাল-পাতাল ভাব, বাদলা হাওয়া আর নানারকম দুশ্চিন্তাকে একবার প্রশ্রয় দিলেই তাহাকেও পাইয়া বসিবে; যথাসম্ভব অন্যান্য কোনো বিষয় আমলে না আনিয়া সে ক্রমাগত এক ঘাট হইতে আর এক ঘাটে আসা যাওয়ায় ব্যস্ত রহিয়াছিল; কিন্তু একদিন হয়তো চারিদিকে ভালো করিয়া না দেখিয়াই গাঙে নামিয়াছিল।

গ্রামদেশের অভ্যন্তরে এক ক্ষেপ দিয়া সময়মতো সে গাঙে ভাসিয়া পড়িয়াছে; ইচ্ছা জোয়ারে ভর করিয়া কাছাকাছি ন্যামতীর ঘাটে গিয়া অন্য কোনো চড়নদারের আশায় নৌকা বাঁধিবে, কিন্তু অঝোর বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া গেল। কোনো রকমে একটা ছোটোখাটো ঘাটে গিয়া পৌঁছাইল বটে, কিন্তু সে ঠাঁই অপরিচিত এবং সেইখানে যে কোনো রকম ক্ষেপ জুটিবে তার কোনো লক্ষণই ছিল না। বৃষ্টিটা থামিয়া আসিবার পর যখন সবদিকের ঝাপসা ভাবটা মোটামুটি কাটিয়া গেল, সেই সময় এইদিক-সেইদিক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল কাছাকাছি একটি নৌকার উপর; কেমন পরিচিত বোধ হইল। সেটিও এক বৈঠার নৌকা, বাদলা বাতাসে পাড়ের কাছে অসহায়ভাবে দোল খাইতেছিল; আর নোঙরের লগিটা নরম কাদার মধ্যে একদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে, মনে হইল কিছুক্ষণের মধ্যেই উন্মূল হইয়া যাইবে। নৌকার মধ্যে কাহাকেও চোখে পড়িল না। উকিঝুঁকি দিয়া মনে হইল ছইয়ের নীচে পাটাতনের উপর মাঝিই হয়তো বেখেয়ালে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু কয়েকবার ডাকাডাকি করিয়াও কোনো সাড়া মিলিল না। হোসেন একটুক্ষণ ইতস্তত করিয়া নিজের কাজে মন দিতে চাহিল। ছই-এর একাংশ গলুইর উপর টানিয়া আহার্য প্রস্তুতের বিষয়ে মন দিবে, এমন সময় সেই নৌকাটির দিকে আবারও মুখ তুলিয়া তাকাইতে হইল; সম্ভবত সেইদিক হইতে একটা অস্ফুট আওয়াজও ভাসিয়া আসিতেছিল। হাতের কাজ ফেলিয়া হোসেন আস্তে আস্তে সেইদিকে আগাইয়া গেল।

: ও মাঝি?

মাঝিই সম্ভবত ছইয়ের মধ্যে কাঁথা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল। এক ডাকে সাড়া মিলিল না। অথচ নৌকাটির পাড়া ঠিক না করিলেই নয়। লগিটাকে পাড়ে মজবুতভাবে পুঁতিয়া সে আগাইয়া গেল ছইয়ের তলায়। কাঁথার তলায় লম্বা হইয়া শোওয়া লোকটির সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল; আরও কয়েকবার ডাকাডাকির পর মুখের উপর হইতে কাঁথা সরাইতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল, লোকটি পরিচিতই বটে, এই যাত্রায় প্রথম গাঙে আসিয়া যাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

: ছবদার মাঝি!

জীর্ণ তাহার শরীর, কিন্তু চোখ-মুখ ফোলা, প্রচণ্ড জ্বরে সে প্রায় অচৈতন্যভাবে পড়িয়া রহিয়াছে; দুই চোখ লাল, তাহাতে কোনো দৃষ্টি নাই, ঠোঁট যদিও নড়ে, মুখে কোনো বোধগম্য ভাষা নাই। কী করিয়া সে তাহার তালাফি করিবে হোসেন ভাবিয়া পাইল না। পরিচিত কোনো ঘাট হইলে হয়তো সে এমন বিমূঢ় বোধ করিত না। এক সময় সে নিজেকেও নিজে শাসাইল, মিঞা, কতবার বলিয়াছিলাম, নিজের কাম ছাড়িয়া অন্যদিকে চাহিও না।

অথচ সেই ছবদার মাঝি প্রথমদিকে তাহার প্রতি বেশ কয়েকবার ঈর্ষার চোখে তাকাইলেও কিছুক্ষণের মধ্যে শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম কেরায়া লইয়া বাহির হইবার সময় সে হোসেনকে গাঙের বড়ো বড়ো ঘোলার কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছে, আর বলিয়াছে কোন গাঙে কোন সময় অকস্মাৎ ডাকাত দেখা দিতে পারে, কেবল নৌকা বাওয়া জানিলেই হয় না, অনেক বিচার বিবেচনা করিয়া গাঙে নামিতে হয়। এখন, তাহাকে এমন কাতর অবস্থায় দেখিয়া কোনো অবহেলা করাও সম্ভব হইল না। একটু শুশ্রূষার পর সে আবারও জানিতে চাহিল : এখন কেমন বোধ করতে আছেন মাঝি? কোনো ঔষধপত্রের ব্যবস্থা আছে? নাই? কবে থেকিয়া এমন করিয়া পড়িয়া রইছেন?

অনেক চেষ্টার পর হোসেন তার অর্ধস্ফুট কথা এবং নানারকম ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া জানিতে পারিল, কতদিন ধরিয়া সে এমন অসুস্থ হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে তা তাহার নিজেরও খেয়াল নাই, ঔষধ দূরের কথা, বেশ কয়েকদিন কোনো দানাপানিও তাহার পেটে পড়ে নাই, অবস্থা এমন যে তাহার পক্ষে যেন আর উঠিয়া বসিবার সামর্থ্যও নাই, নিশ্চয়ই তাহার অন্তিম ঘনাইয়া আসিয়াছে, আরও কিছু কথা যা হোসেন কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে বাহিরের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া ছবদার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল : এইখানে এমন ব্যারামে পড়িয়া রইছেন, একটা লোকজনও আসে নাই এইদিকে? ঘাট যখন আছে, ধারে কাছে মানুষ জনও তো থাকার কথা। আর যা-ই হউক, একটা দুইটা চড়নদারেরও কি উদ্দেশ পাওন যায় নাই?

ধীরে ধীরে ছবদার মাঝি আবারও জানাইল সৃষ্টিকর্তাই স্বয়ং হোসেনকে এমনকালে কাছে পাঠাইয়া থাকিবে। এক চড়নদারের পীড়াপীড়িতে এবং ডবল ভাড়ার লোভে সে অসুস্থ অবস্থাতেই গাঙে ভাসিয়া পড়িয়াছিল; কোনোরকম দায়-উদ্ধার করিয়া সে আবারও সেই বড়ো বন্দরের দিকে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল; কখন কি অবস্থায় সে যে কোনখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই খেয়ালেরও সুযোগ হয় নাই।

: আমি যাই একবার উদ্দেশ লইতে, দেখি, কবিরাজ ডাক্তার কেউরে পাই কিনা— হোসেন পাড়ে আসিয়া সেই ঘাটের লোকালয়ের দিকে আগাইয়া গেল। ছোটো ঘাট, তেমন নৌকার ভিড়ও নাই, না বড়ো জনপদ। হয়তো-বা আবহাওয়ার প্রতিকূলতার জন্যই কিছু ব্যবসায়ীর নৌকা না হয় গহনার নৌকা সেইখানে সময়-অসময়ে আশ্রয় নেয়; ঘাটের উপরে দোকান-পশরা কিংবা লোকজনের ভিড়ও তেমন নাই। এইদিক-সেইদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খোঁজাখুঁজি করিবার পর একটা খালের মুখে একজন দেহাতিকে তাহার গোরু টানাটানি করিয়া খালে নামাইতে দেখা গেল।

প্রথমদিকে হোসেন নিজের উপরেই একটু অপ্রসন্ন বোধ করিয়াছিল। শিকদার যখন যাহাই বলুক, যাহার নিজের ভুবন নাই, তাহার কাছে ভুবন-সংসারও নাই; থাকিয়াও থাকে না। আবার ভুবন-সংসার দেখিতে গেলে নিজজীবনেই বিড়ম্বনার অবধি থাকে না, গাঙে নামিয়া আর দুইপাড়ের দিকেও তাকাইতে চায় না হোসেন, সময়-সুযোগও তেমন হয় না। তাকাইলে কী দেখিবে? দুইপাড়ের সার-বাধা গাছ-গাছালি যেন এক রকম ওত পাতিয়া নিথরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তা-ও যেন তাহারই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া। হোসেন মুহূর্তমাত্র অমনোযোগ দেখাইলে তাহারা যেন লেজা-বল্লম লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে। স্রোতের ঢেউ-এর তুলনায় আরও বহুগুণ শক্তি লইয়া তাহাকে নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিবে। সুতরাং হোসেন সাবধানে চলিয়াছে।

কিন্তু ছবদারকে সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। একসময় তাহার নিজের বুড়ো বাপের মৃত্যুর কথাটা মনে পড়িয়া গিয়াছিল। বারংবারই মনে হইতেছিল বুড়া হইলে মানুষ কেমন অসহায় হইয়া পড়ে; সংসারের তাজা-তাগড়া মানুষেরা তাহাদের উপেক্ষা করে, তাচ্ছিল্য দেখায়, বিশেষ করিয়া যখন তাহারা রুগ্ন হইয়া পড়ে। বড়ো হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ করিয়াছে এই দক্ষিণের দেশে জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকাই একটা প্রতি মুহূর্তের যুদ্ধ। বিরূপ প্রকৃতি, বিরূপ যেন আসমান ও জমিনও, আর ততোধিক বাধা-বিপত্তির ঢাল-বল্লম লইয়া হিংস্র মানুষ। সেই যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া আহত-নিহত অথবা পঙ্গুদের দিকেও মনোযোগের অবসর মেলে না। সেই রকম সুযোগ করিতে পারে নাই বলিয়া হোসেন নিজের বাপেরও কোনো সহায়তা করিতে সক্ষম হয় নাই। ছবদার মাঝির অবস্থা দেখিবার পর তাহার নিজের মনই বারংবার বলিতেছিল, এর সহায় হও, এর বুকে বল দাও। সঙ্গে সঙ্গে, প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে মনে হইতেছিল, এমন সহজে জীবন লইয়া ছিনিমিনি করার সুযোগ কাহাকেও দেওয়া যায় না। এই জগৎ, কাজ, কর্তব্য হইতে কাহাকেও ফট করিয়া তুলিয়া লইয়া যাওয়া এতই সোজা? কে বা কী-ই সেই মৃত্যু নামক জিনিস? সে আসিয়া দাবি করিলেই আত্মসমর্পণ করিতে হইবে? সৃষ্টিকর্তার কী এই-ই ইচ্ছা যে ছবদার এমন করিয়া বিদেশ-বিভূঁই-এ শেষ হইয়া যাউক, আর তাহার গোষ্ঠীও উপায়হীনভাবে তাহার পরিণামের অনুসরণ করুক? কেন বানাইয়াছে সৃষ্টিকর্তা তাহা হইলে এই পৃথিবী? সব আশা ত্যাগ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকার ইচ্ছা হোসেনের কখনও ছিল না।

অনেক তালাশ করিয়া এক কবিরাজের দেখা পাওয়া গেল; কিন্তু তাহার আবার কখনও বাদলা-বাতাসের, কখনও কাঁদা-পাকের ওজর-আপত্তি রোগীকে তাহার দুয়ার-দরবারে লইয়া যাইবার হুকুম-হাকাম; অনেক সাধ্য-সাধনা আর লোভ দেখাইয়াও যদিও বা ছবদারকে দেখানো গেল কিন্তু সে কোনো ভরসা দিতে পারিল না। কিছু ঔষধ পটপটি দিয়া সে কেবল কহিল মরনের বুঝি সময় হইয়া আইছে। বুড়ারে আপন বাড়িতে লইয়া যাও।

তারপর হোসেন আবারও কাদা- পেড়া ভাঙিয়া ঔষধপত্র সংগ্রহে এবং তত্ত্ব-তালাফিতে ব্যস্ত রহিল : ছবদার মাঝি একটু কথা বলিবার মতো অবস্থায় আসামাত্র সে জানিতে চাহিল : কোনখানে, কোন গ্রামে আপনার বাড়ি মাঝি? কেমন করিয়া যাইতে হয়? এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজকর্মের তেমন জোবা নাই, এইসময়ে আপনি বাড়ি গিয়া সুসময়ের ধৈরয দেখানোই ঠিক হইবে। কোনো দুশ্চিন্তা নাই, আমিই সুসারমতো পৌঁছাইয়া দিতে চাই।

ছবদার মাঝি খুশি হইল; অনেক কষ্টে সে তাহার বাড়ির ঠিকানাটা বুঝাইয়া দিতে চাহিল : সেই গাঙের গোটা দুই 'যোজা' (বাঁক) পার হইয়া আরও একটু 'নামা'-র সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইলেও চৌখে পড়িবে 'রূপার ঝোর'; পরে তাহার পাশ কাটিয়া আরও কয়েকদণ্ডের বৈঠার পর অনেকগুলি তাল-তমালের সারি দেখা যাইবে একধারে, পরে পাশের খালে ঢুকিয়া কিছুদূর গেলেই বৈশাখিয়া গ্রাম; একসময় হোসেন দেখিবে একগুচ্ছের নারিকেল গাছ যেন খালের হালটের উপর নুইয়া পড়িয়াছে; সেইখানে নৌকা বাঁধিয়া হাঁক দিলেই বাড়ির লোকজনদের সাড়া পাওয়া যাইবে। তাহাদের মুখে সংবাদ দিতে হইবে পথ চাহিয়া থাকা বৌ-ঝিকে, ছবদার মাঝি আর পারে নাই, সে 'আউগাইছে'; হোসেনকে আর অন্য কিছু ভাবিতে হইবে না। বৈকালের ভাঁটায় রওয়ানা দিলে, রাত্রির জোয়ারটা কাটাইতে হইবে কোনো ঘাটে কিংবা হাটে নৌকা বাঁধিয়া, সেইদিকে গাঙে শান্তি নাই, নানারকম আপদ-বিপদ লাগিয়াই রহিয়াছে। কষ্টে আরও অধিক কিছু বলিতে পারিল না ছবদার মাঝি মনে হইতে লাগিল সেইটুকু কথাবার্তা বলিতেই তাহার সমস্ত শক্তিই যেন নিঃশেষ হইয়া যাইতেছিল।

: থাউক মাঝি, এখন থাউক।—হোসেন তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিল : ঔষধপথ্য জোগাড় হইছে যখন, সামনের রাইতটাও পার হওন যাউক। তবে, মনে হয় একটু সবুর করণেই ভালো হইবে। না হয় শেষ রাইতের ভাটায় নামিয়া যাওন যাইবে।

ছবদার কি বলিল বোঝা গেল না। কণ্ঠস্বর আরও ক্ষীণ, অস্থিসার শরীরে কোনো উত্তাপ আছে কী নাই; কেবল হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটাই বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসা আবেদনের মতো ঠেলিয়া উঠিতেছিল। হোসেন কিছুকাল ইতস্তত করিয়া নিজের কাঁথাখানিও তাহার গায়ে জড়াইয়া দিল; তারপর কর্তব্য স্থির করার জন্য ছই-এর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও ভাটার কাল। যতদূর দৃষ্টি যায় মেঘঢাকা আকাশের তলায় বিশ্বসংসার যেন মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। উত্তর হইতে নামিয়া আসা গাঙের স্রোত প্রচণ্ডবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে নীচের সমুদ্রের উদ্দেশে। কোন মাঝির 'পাড়া' আলগা হইয়া গেল তাহার স্রোতের টানে, কোথায় কোন পাড় ধ্বসিয়া পড়িল তাহার ঢেউ-এর খাবলে সেইদিকে বরাবরের মতোই তাহার কোনোই ভ্রুক্ষেপ নাই : বরং একটা মহা-কৌতুকের উলাস-বিলাস লইয়া সে ধাইয়া চলিতেছে। পাড়ের নরম কাদার উপর ছোটো ছোটো পাখিগুলিও তাহার নাগাল এড়াইবার জন্য সতর্ক। সত্য বটে গাঙের বুকে অঢেল ঐশ্বর্য, দুইধারেও ছড়াইয়া-ছিটাইয়া চলে তাহার ভাণ্ডার, কিন্তু সেই বিপুল সম্পদ যথা ইচ্ছা ভোগের সুযোগ যেন কাহারও হয় না।

কাজে-কর্মে ব্যস্ত ছিল বলিয়া বাস্তবিকপক্ষে কোনো দিকে ভালোভাবে তাকাইবার অবসরও হয় নাই হোসেনের। এখন গাঙের খোলা স্রোতের দিকে চাহিয়া বারংবারই তাহার মনে হইতে লাগিল গাঙই যেন সমস্ত জীব-জীবনের উত্থান-পতন ও জীবন-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাহার ঢেউ-এর উপর সওয়ার হইবার সাধ্য যাহার নাই গাঙও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহাকে পাড়ের উপর হইতে উপড়াইয়া পড়া গাছের মতো নিষ্ঠুরভাবে বিশাল সমুদ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। শ্রীহীন নৌকাটির মতো ছবদারেরও পাড় আঁকড়াইয়া থাকিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতে বসিয়াছে। হোসেন মনে মনে সংকল্প করিল সে কেবল নীরব দর্শকের মতো তাহা দাঁড়াইয়া দেখিবে না।

গাঙ দেয় সব কিছু, জীবন-ঐশ্বর্য, ভুবন গড়ে, আবার ভাঙে। যেইখানে তাহাদের নৌকা, তাহার কাছাকাছিই জাগিয়া উঠিতেছে নতুন চরভূমি। ইতিমধ্যেই তাহার উপর গজাইয়া উঠিয়াছে নলখাগড়া-হোগলা বন; হয়তো নানা ধরনের জীবজন্তুও নতুন আশ্রয় গড়িয়াছে সেইখানে, ডাঙার উপর হইতে মানুষও সেখানে আসিয়া পড়িল বলিয়া, হয়তো তাহার অধিকার লইয়া কলহ-বিবাদও শুরু হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যে। একদিন একদল মানুষ সেইখানে আপন অধিকার খাটাইয়া গড়িয়া তুলিবে ঘর-গৃহস্থালি, গোরু চরিবে এইদিক-সেইদিকের ঘাসবনে, ঝি-বউরা সযত্নে সাজাইয়া তুলিবে গৃহাঙ্গন, দেহে ছন্দের ঢেউ খেলাইয়া উঠানে ছড়াইয়া দিবে শ্রমের ফসল—যেমনটি সে একদিন সখিনাকে দেখিয়াছিল।

অথচ এই গাঙই হয়তো আবার একদিন তাহার খেয়াল-খুশি বদলাইয়া সব কিছু ভাঙিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে আপন স্রোতের গহ্বরে। কেবল গাঙের উপরেই নয়, আকাশে-বাতাসেও যেন বিরাট বিপুল অশরীরী শক্তি প্রচণ্ড দম্ভ-দণ্ড লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে : চতুর্দিকের নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে তাহার একটি মাত্র রোষ-ভরা উক্তি নানাভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছিল : 'এই গাঙের মতো ধাইয়া চলো, কোথাও বাঁধা পড়িও না, থামিয়া থাকিলে চলিবে না; আমার হুকুমে, আমার খুশিতে তোমার নিজকে সমর্পণ করিতে হইবে; আমি কখনও তোমাকে নীল আকাশের তলায় সবুজ-শ্যাম-হরিৎ-এর শোভা দেখাইব কখনও ঘূর্ণিতে ঘুরাইব, কখনও বা লক্ষ লক্ষ তরঙ্গের নৃত্য-সভায় তোমাকে লইয়া লোফালুফি খেলিব, আবার কখনও বা তোমাকে আমার গহন গর্ভের রহস্যে অবাক করিয়া রাখিব, যতদিন না তোমাকে সমুদ্রের অন্তহীন গভীরে বিলীন করিয়া দিতে পারি; শূন্য হইতে আসিয়াছ, তোমাকে শূন্যেই মিশাইয়া দিব, যদি মাটি হইতেই আসিয়া থাক, আবার তোমাকে দৃষ্টিরও অগোচরে রেণু রেণু করিয়া মাটিতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিব।' হোসেনের অকস্মাৎ মনে হইল মুখ ফিরাইলে সে দেখিতে পাইবে শিকদারও কোথা হইতে তাহার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চরের মাটিতে দরগি-মাছ খুঁজিয়া ফেরা ছোটো পাখিগুলিও গাঙকে সমীহ করে, হোসেনও করে বইকী, কিন্তু সমূহ কর্তব্য ফেলিয়া সে আর অধিক কোনো ভাব-ভাবনা গ্রাহ্যে আনিতে চাহিল না। সে সবরকমভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, গাঙের যেন তেজ, তাহাতে একই সঙ্গে দুই নৌকা লইয়া ভাসিয়া পড়া কোনো ক্রমেই সাধ্য হইবে না। কোনো উপায় আছে কিনা সেই বিষয়েই সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কতদূরে তাহার বাড়ি সেই কথা ছবদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া আর কোনো লাভ ছিল না, সাত-আটটা ঘোঁজা বা বাঁকের পরে অন্য আরেক গাঙে নামিতে হইবে, তারপর সে-ই দেখাইয়া দিবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার তো নইরে আমি আমার না
কাছে কইরে আমি, আমার না
আমি তো নয়রে আমার, সকলি পর
আমার বলতে নাই এক জনা।
যদি আমি আমার হইতাম
কুপথে কি আর যাইতাম
কুপথে কি আর যাইতাম
দেখতাম আপন কল-কারখানা।

আমি এলাম পরে পরে
পরের নিয়ে বসত করে
এখন দেখি কেউই নাইরে
পরের সঙ্গে দেখা-শুনা।

পরে পরে কুটুমভালি
পরের সঙ্গে দিন কাটালি,
শুধু কয় ফকির লালন
ভাবিলাম পরের ভাবনা।

এখনও গাঙপাড় বরাবর গঞ্জের দিকে যাইবার কালে পিতামহ করমালীর কথা শিকদারের আরও বেশি করিয়া মনে পড়ে। শৈশবকালে এই পথে তাহার সঙ্গে বহুবার নানাদিকে যাতায়াত করিয়াছে। আরও মনে পড়িল পাড়ের কাছে তাজা জলের মধ্যে একটা ছোটো নৌকার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া; কখনও কোনো প্রচণ্ড ঝড়ে সেইখানে আসিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে, কিংবা নদী-জলের প্রচণ্ড স্রোতেই তাহাকে কোন দূর দেশ হইতে উলস-পালস করিয়া টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে। পিতামহ সঙ্গে থাকিলে বলিত, ব্যস, শেষ হইল আর একজনের সংসার খেলা। ভাঙা হাড়গোড় লইয়া এই নরম মাটির মধ্যে সেইভাবে আটকাইয়া পড়িয়াছে তাহা হইতে আর উদ্ধার নাই। মালিকও যদি প্রাণে বাঁচিয়া গিয়া থাকে তাহারও আর কোনো উদ্দেশ মিলিবে না। শিকদার সবসময়ই যে তাহার কথাবার্তা সব বুঝিয়া উঠিতে পারিত এমন বলা যায় না। বারংবারই সে বলিত গাঙই সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, কখনও অণুর পর অণু পলি মিশাইয়া মাটি গড়িতেছে, আবার অন্য একদিনের খেয়াল-খুশি মতো তাহাকে খাবলে খাবলে নিশ্চিহ্ন করিয়া মাতিয়াছে অন্য খেলায়। সেইসঙ্গে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা বর্ষা, ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ সমুদ্র যেন অনন্তকাল ধরিয়া চতুর্দিকে জীবনের নিয়ামক হইয়া রহিয়াছে। একদিন স্রোতের মধ্যে একটা বিশাল গাছকে উলটপালট খাইয়া ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া সে বলিয়াছিল : হয়তো আমরা এইরকম ভাসিয়া আসিয়াছিলাম।

কিশোর শিকদার জানিতে চাহিয়াছিল; কোথা হইতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতামহ একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছে, 'উপরে হইতে। একদিক হইতে নামিয়া আসিয়াছে গঙ্গা, আরেক দিক হইতে ব্রহ্মপুত্র। কত যুগ ধরিয়া কত যে জনপদ ভাসাইয়া তাহারা নীচে নামাইয়া আনিতেছে তাহা কে বলিতে পারে! সব কিছু ভাসাইয়া সমুদ্রে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া ছাড়া যেন অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই।'

কিশোর শিকদার তবু পীড়াপীড়ি করিয়াছে, 'কিন্তু আমরাও যে ভাসিয়া আসিয়াছি তাহারই বা প্রমাণ কী আছে? এই মাটি, জলজঙ্গল, দেশ-গ্রাম কী সব সময়ই আছিল না?'

সেইসব প্রশ্নের উত্তরে করমালী আবারও দুর্বোধ্য হইয়া উঠিত; নিচু হইয়া চরের পলিমাটি আঙুলে ঘষিয়া দেখাইত শিকদারকে,' এই দেখ, কত মিহিন এমন মাটির অণু-পরমাণু। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র যে কোন কোন মুলুক হইতে নামাইয়া আনিয়াছে, সেই হিসাবের কী কেউর সাধ্য আছে! আমরাও এমনই মাটির কণার মতো, জীবন লইয়া যাহাদের খেলা তাহাদের হাতে কেবলই রূপ পালটাইয়া চলিয়াছি। এইটুকুন বাচ্চা হইতে একদিন বড়ো হই, নানারকম দম্ভ দেখাইয়া এইদিকে বাঁধ দিই, সেইদিকে বেড়া, চরের নরম কাদায় খুঁটি পুঁতিয়া নৌকা বাঁধার মতো, মাঝি হয়তো নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে গেল, কিন্তু কখন যে পাড়ের মাটি হইতে সেই খুঁটি আলগা হইয়া পড়িবে, নৌকাও তাহার মাঝির অজান্তে বিরাট বিশাল গাঙের মধ্যে ভাসিয়া পড়িবে কেউই বলিতে পারে না, এখন থাকুক এইসব কথা, তুই একটা গীত ধর।'

কিশোর শিকদারের কণ্ঠে কোনো গীতই আসিত না। গাঙ পাড়ের এলোমেলো বাতাসের মধ্যে মুখের উপর হইতে লম্বা চুলগুলি বিন্যস্ত করিয়া, কিছুক্ষণ পাড়ের কাশবনের উপর রৌদ্রের ঝলক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া সে কেবলই চাহিয়া দেখিত চতুর্দিক : আকাশে বকের সারি, গাঙে জেলে-নৌকার বহর, খেতে-মাঠে কর্মব্যস্ত চাষি, ঝোপে-ঝাড়ে পাখির-পক্ষির বাসা-তৈরির তৎপরতা, এমনকী কীট পতঙ্গের জীবিকা জীবনও তাহার দৃষ্টি এড়াইত না। কখনও সে পিতামহকে কিছু বলিতে সাহস পায় নাই, কিন্তু যে-শক্তি, সকলের সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর, তাহার বিরুদ্ধে কেবল ভয়ই নয়, একটা বৈরী-মনোভাবও তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল।

করমালী কিছুক্ষণ তাহার অপেক্ষায় থাকিয়া নিজেই গুন গুন করিয়া গান ধরিত : আকুল হইয়া কাঁদি আমি বসিয়া গাঙের পাড়েরে—

তাহার কথার মতো গানের ভাব-ভাষাও সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিত না শিকদার, অথচ গাহিতে তাহারও কোনো অসুবিধা হইত না। সে নিজে বুঝুক, না-বুঝুক, দেখিত শ্রোতারা যেন উদ্বেল হইয়া ওঠে, কেউ প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউবা কাঁদিয়াও অস্থির হয়। কিশোর-বয়সে, প্রথম যৌবনে কিছু বুঝিয়া না-বুঝিয়া যে গীতগানগুলি সে আসরের পর আসরে গাহিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে আপন জীবন-ভাবনার মিল ছিল অতি সামান্য; ক্রমে যখন নিজে নিজেই গান বাঁধিতে মন দিল তখন যেন আর কথা খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

অথচ এখনও বুক ঠেলিয়া কত গান উঠিয়া আসিতে চাহে কণ্ঠে। নিজ পরিচিত ভুবন, একের পর এক সমস্ত জনপদগুলি তাহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া যেন গুণগানে প্রবৃত্ত করাইতে চায়। হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় সে ধীরস্থিরভাবে অনেকগুলি গ্রামের কখনও বা আশেপাশে, কখনও বা মধ্য দিয়া পথ করিয়া আসিয়াছে। কখনও বা তেমন কোনো প্রয়োজনও ছিল না, সে কেবল সেই জনপদগুলির সমস্ত সৌরভগন্ধ বুক ভরিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রহণের জন্যই সেইসব ঠাঁই ঘুরিয়া আসিয়াছে। তখনও বারংবার মনে পড়িয়াছে পিতামহের কথা। সেইসব গ্রামে কাজে-অকাজেও ঘুরিয়া বেড়াইবার বাতিক ছিল তাহার; কখনও বা কোনোখানে নিথর হইয়া বসিয়া থাকিত; কেন, তাহার কোনো মীমাংসা শিকদার আজও পর্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। সেইসব গ্রামের পাশ দিয়া বহা গাঙ কবে কোন যুগে মজিয়া গিয়াছে, চতুর্দিক কেবল খাল-বিল-জল, মধ্যে মধ্যে গাছ-গাছালি ঘেরা পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রাম। কৈশোরকালে তাহার মধ্যকার অনেক ঘরবাড়ি বড়ো সুন্দর, বড়ো ভিন্ন রকমের মনে হইত : খড়ের চাল, মাটির দেয়াল, খিড়কি, কেঁওয়ার, এমনকী ভিতরে গঠনও ছিল অন্যরকম। কামদেবপুর, বৈশাখী, অভয়নীল, দেহলিদুয়ার, সুভিতপুর, নাচনমহল, রূপার ঝোর—প্রত্যেকটি গ্রামে বাহিরের সমস্ত ঔদ্ধত্যকে উপেক্ষা করিয়া যে-জীবনযাত্রা চালু ছিল, তাহার মধ্যে করমালীকে অত্যন্ত আত্মস্থ মনে হইত। সকল গ্রামের মানুষ একসাথে যেভাবে বৈশাখী পূর্ণিমা অথবা চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় মাতিয়া উঠিত, তাহার মধ্যে করমালীও নিদারুণভাবে জড়াইয়া পড়িত। সে সম্বন্ধে নিজে বড়ো হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম কানাঘুষা শুনিয়াছে শিকদার, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কোনো কিছু জানিবার সুযোগ হয় নাই। যখন কিছু বুঝিবার সময় হইল, ইতিমধ্যে বাহিরের সেইসব ঔদ্ধত্যকে টিকাইয়া রাখার প্রয়াস করিতেছিল যাহারা, তাহারা এবং তাহাদের জীবন-যাপন ও সংস্কার আচারকেও অন্য এক যুগ প্রচণ্ড গাঙের স্রোতের মতো একেবারে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এখন শিকদারের মনে হয়, পিতামহের সঙ্গ-সাহচর্য পাইলে সে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজিয়া পাইত। সুভিতপুরকে সুবিদপুর আর 'ধবলা'র চরকে 'দুবলা'র চর বলিয়া উল্লেখে করমালী একদিন মহা বাদানুবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া সে একান্তভাবে আত্মমগ্ন হইয়া পড়িতেছিল গীত-গানের মধ্যে। কানা ঘুষাটা প্রধানত সেই উপলক্ষেই। মেলা বসিবার কালে বাহিরের অনেক ধরনের লোকও আসিত ডিঙি সাজাইয়া, তাহাদেরই কোনো কোনো আসরে করমালী ভাব-সংগীতে চৈতন্যও হারাইয়া ফেলিত। সংসার-জীবনে সে সুখী হয় নাই। কখনও তাহাকে বলিতে শুনিত, 'কানু, যে যতই চেষ্টা করি জীবনে কোনো বাঁধা ধরা সুখ নাই। আমরা মনে করি আছে, আর সেইসব ধ্যানই আমাদের দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আমি তো চেষ্টা করিলাম পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে, এখন দেখ আমার নিজ পুত্রই কেমন করিয়া তাহা বিকাইতে বসিয়াছে।'

শিকদার সেইসব বিষয়ও ভালো করিয়া বুঝিতে পারে নাই। তবু যতনা নৈকট্য বোধ করিয়াছে পিতামহের সঙ্গে, ততধিক দূরত্ব তাহার পিতার। পিতা জয়জামালী না দেখিত খেত-খামারের কাজকর্ম, না কোনো উৎসাহ বোধ করিত ঘর পরিবারের প্রতি। এক এক সময় বহুদিন পর্যন্ত কোথাও চলিয়া যাইত। সেইসব সময়ে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রিকালে, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে, শুনিতে পাইত তাহার মা কাঁদিতেছে। কেন সেই কান্না শিকদার তাহাও জানে নাই। পিতাকে যখন দেখিত সে যেন অন্য কোনো জগতের মানুষ। বেশ, নাম; কথাবার্তা, চাল-চলন—সবই বদলাইয়া সে যেন প্রাণপণে অন্য কিছু হইবার চেষ্টা করিতেছিল। মনে হইত গাঁ-গ্রামের জীবনের প্রতি তাহার বিতৃষ্ণার অবধি নাই; নিজের নামটা পর্যন্ত সে বদলাইয়া লইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। ঘর-সংসারের সামান্য খুঁটিনাটি হইতে শুরু করিয়া চাষ-বাসের কাজকর্মেও তাহার নতুন নতুন প্রস্তাব প্রায়ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানারকম অশান্তির কারণ হইয়া উঠিত। একদিন এমনও হইল যে শিকদারের পক্ষে দুইদিকেই সমান দূরত্ব রাখিয়া চলাই সঙ্গত বলিয়া ভাবিতে শিখিল। এখন, কালে কালে সেই দূরত্বটা কেবল তাহাদের সঙ্গেই নয়, বাহিরের পৃথিবী এবং তাহার মধ্যেও গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্তত হোসেনের বিষয়েও সে আর নিজেকে অসম্পৃক্ত রাখিবার কথা ভাবিতে পারিতেছিল না।

অথচ যে-ঘাটে হোসেনের দেখা পাইবার আশা, সেইখানে তাহার কোনো উদ্দেশ মিলিল না।

গঞ্জের একধারে ঢালু চর পড়িয়াছে গাঙের গতি বদলাইবার সঙ্গে সঙ্গে। সেই ঘাটের স্টিমারও আসা-যাওয়া করে এখন পাড় হইতে অনেক দূরের স্রোতে। খাড়া পাড় হইতে বাঁশের কেঁচকির উপর পুল পাতা স্টিমার-ভিড়িবার ফ্লাট অবধি। সেই পুলের দুইধারে অজস্র নৌকার ভিড়—বজরা, পানসী, মুঠিয়ার নৌকা, আর এক-বৈঠার কেরায়া নৌকারও কোনো সংখ্যা শুমার নাই। অনেকবার এইধার সেইধার করিয়া শেষ পর্যন্ত আমজাদের দেখা পাইল, কিন্তু সে-ও হোসেনের কোনো সংবাদ দিতে পারিল না।

: এ যাত্রা আর আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। আমি কেবল এক ঘাট হইতে আর এক ঘাটে চড়নদার পৌঁছাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া রইছি। ক্যান, দেখা হইলে কিছু কইতে হইবে?

: নাহ্! তেমন কোনো বিশেষ কিছু না!

আমজাদ নিজের কাজের দিকে মন দিতে দিতে বলিল : তা ওই নলসিঁড়ির ঘাটের দিকেও দেখতে পারেন। এইদিকে এমন ভিড় দেখিয়াই হয়তো আর আউগাইয়া আসে নাই। দেখেন না, যত না চড়নদার, তারও শতাধিক নৌকা-ডিঙি। আমারও ঠাঁই হয় নাই।

AMARBOI.COM

সেইদিকটার চর পড়িলেও জোয়ারের সময় গাঙ যেন আবারও পাড় ধরিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে উপক্রম করে। বাঁকের উপর বলিয়াই লোকজনের ভিড় আরও বেশি। কাজে-অকাজেও নৌকা ভিড়াইয়া সেইখানে দুইদণ্ড কাল ঘোরাফেরা একটা অন্য জগত দেখার সমান। কাছাকাছি কোনো খালের মধ্যে এক ধর্মগুরুর সমিতির উপলক্ষে সেই ভিড় আরও বাড়িয়াছে। হৈ-চৈ, ধাক্কাধাক্কি, ডাকাডাকি-কোলাহল-এর মধ্যে কোনো অন্তরঙ্গ আলাপনের সুযোগ হয় না। শিকদার নলসিঁড়ি ঘাটের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল। এমন সময় হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

একধারে একখানি পেট-কাটা পানসি-নৌকা, আর তাহার ছই-এর মুখে একটা শাড়ি টাঙাইয়া পর্দা দেওয়া, সেই পর্দার আড়াল হইতে একখানি মুখ অকস্মাৎ নজরে পড়ায় শিকদারের কাছে অন্য সব কিছু তুচ্ছ হইয়া গেল। যে-দুইটি ডাগর চোখ উৎসুক্যভাবে তাহাকে লক্ষ করিতেছিল, তাহা চিনিতে পারিয়াই সে চমকিয়া উঠিল।

পর্দার কাছে জোবেদার হাতখানি হয়তো একটু কাঁপিয়া উঠিল; ম্লান দৃষ্টি মেলিয়া সে যেন কিছু বলিতেও চাহিল, তাহার ঈষৎ হাসির মধ্যে সম্ভাষণ কী আহ্বান তাহা বুঝিয়া উঠিবার আগেই ভিড়ের চাপে শিকদারকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। পুলের উপর হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড় পর্যন্ত উঠিয়া আসিতে হইলেও, দৃষ্টি বারংবার ঘুরিয়া যাইতে লাগিল সেই পানসির দিকে, কিন্তু সেই দৃশ্যটি আর চোখে পড়িল না। অজস্র নৌকা তখন খালের পথ ধরিয়া ধর্ম-সভার দিকে চলিয়াছে, সেই ভিড়ের মধ্যে জোবেদার পানসি-নৌকাটিকে সে আর ঠাহর করিতে পারিল না। বুক দুমড়াইয়া একটা অভিমান ঠেলিয়া উঠিতে চাহিলেও সে নিজেকে সংযত রাখিল। সব দিকে নিত্যকালের জীবন বহিয়া চলিয়াছে। এই প্রচলিত নিয়মের মধ্যে অকস্মাৎ এককালের তরুণী জোবেদা এখন রমণীর বেশে তাহার উদ্দেশ্যেই একান্তে কিছু বলিতে চাহিবে, তাহা নেহাতই কোনো ভ্রম-কল্পনা। মুখের উপর এক ঝাপটা বাতাস বহিয়া যাইবার কালে আবারও যেন কানে ভাসিয়া আসিল পিতামহ করমালীর কণ্ঠস্বর : মনা, অনড়-অটল কিছু নাই। আমরাই মনে করি নিশ্চয় আছে, আর সেই গর্ব লইয়া কেবলই দুঃখ পাই। যা এই আছে, এই নাই, তাহার বড়ো আর দুঃখ নাই।

বঁধু তোমার শরণ করলাম যার
তুমি বিনে কমবে না আর
এত দুঃখের ভার।

আমার মন মধুপ ভোমরার মতো
তোমার রূপে হইছে মাতোয়ারা।

যত দেখি এই রূপের মেলা
যত দেখি এই রঙের খেলা
যেন আরও দেখায় তারা রে,

এই রূপেতে কীট দেখিলে হই যে উদাস
তোমার শরণে এখন সে দুঃখেরও বিনাশ ॥

জলসিঁড়ির ঘাটেও হোসেন-এর কোনো উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। শিকদার একসময় আবারও বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়াছিল, এমন সময় একজন লোক তাহাকে সমাদর করিয়া বসাইল। বন্দরের ঘাটের একধারে সে একটি দেশী ছোটো চা-এর দোকানে কাজ করে। এক বাটি চা, আর কয়েকটি বিস্কুট তাহার সামনে বাড়াইয়া দিয়া জানিতে চাহিল : তারপর বয়াতি-ভাই, গীত-গান কি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছেন?

চটপট কোনো কথা বলা শিকদারের স্বভাব নয় : একটু প্রীতবোধ করিলেও সে প্রসঙ্গটা এড়াইয়া যাইতে চাহিল; চা-এর বাটিটা ঠেলিয়া দিয়া বলিল : এইসবের দরকার নাই, এই বিস্কুটই যথেষ্ট। সাঁঝের আগে আগে বাড়ি পৌঁছাইবার তাড়া আছে।

সেই দেশী যুবক লতিফ যেমন কর্মচঞ্চল, তেমনই সবদিকে তার অসীম উৎসাহ; কাছে ঝুঁকিয়া ফিশফিশ করিয়া আবারও জানিতে চাহিল : একটা কথা রাখবেন বয়াতি ভাই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতের বিস্কুটটা মুখ হইতে সরাইয়া শিকদার লতিফের মনোভাব আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল।

: কে না জানে, আপনার মতো গায়ক সবখানে নাই। তাড়াহুড়া করিয়া না-ই বা রওয়ানা হইয়া গেলেন আইজ। আমি সাঁঝের বেলা এইখানেই একটা আসরের আয়োজন করি। এমনও হইতে পারে কাইল সকালে আপনার বন্ধুর দেখা পাইয়া যাইবেন।

সেই বন্দরে শিকদারের যে আরও কিছুক্ষণ কাটাইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তাহা নয়। আশৈশব কাল হইতে দেখিয়া আসা বন্দরের চেহারা ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে; গাঙ যতই তাহাকে ভাঙিয়া ছানিয়া চলিতে চাহিতেছে, ততই যেন প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিতেছে চতুর্দিকে; যাত্রা স্থগিত রাখিলে শিকদারের পক্ষেও সবদিক ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখিবার সুযোগ হইত।

: সকল ব্যবস্থা আমার।—লতিফ আবারও বলিল : রোজই কিছু না কিছু মানুষ এই ঘাটে আটকা পড়িয়া যায়। বৈকালে স্টিমার চলিয়া যাওয়ার পর তেমন কিছু আর করারও থাকে না। রাত্রিটা এইখানেই কাটাইয়া যায়েন, কোনো অসুবিধার অবকাশ তক রাখিমু না।

শিকদার একটু ভাবিয়া বলিল : অনেকদিন চর্চা নাই।

: সেই জন্যই তো আর এখন কিছু দরকার। বয়াতিভাই, দুইটা পয়সা কামাই করার জন্য নিজ দেশ ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসছি। যতই চেষ্টা করি না কেন, মাঝেমধ্যে বড়ো অস্থির লাগে। শুনছি তো আপনার গীত-গান, মনটা যে ক্ষুদ্দুর ক্ষুদ্দুর বিষয় ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া যায়, কেমন একটা শান্তি লাগে, শান্তি বোধ হয়, তারও উপর বড়ো কথা কী জানেন আপনে আমার দেশের মানুষ বলিয়া আমাগো বুকটাও এই এতো বড়ো হইয়া ওঠে। দেখলাম তো অনেকেরই, আপনে চর্চা রাখলে তুলনাও থাকত না। আপনে রাজি হইয়া যায়েন।—লতিফ একটু হাসিয়া আরও জানাইল; এইখানে সমঝদারও আছে।

শিকদার আর আপত্তি না উঠাইয়া তখনকার মতো সেই দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিল। বৈকালে স্টিমারের ফিরতি সময়ের তখনও অনেক দেরি। নামায় কোথায় যে বরগুনা নামক অন্তিম ঘাট, তা কোনোদিন জানারও সুযোগ হয় নাই। গাঙের এইদিক সেইদিক চাহিয়া শিকদারের মনে হইল, ভুবনের অনেক কিছুই জানা-চেনা এবং বোধ-উপলব্ধির বাহিরে রহিয়া গিয়াছে; অথচ আপন ভুবন ছাড়িয়া নিরুদ্দিষ্ট হইলে সে-ও হয়তো পিতামহ করমালীর মতোই শেষ হইয়া যাইবে।

এই গঞ্জে বারংবার যাতায়াত ছিল তাহার। পূর্বদিকে একটা পল্লিতে আখড়া ছিল বাউল বৈষ্ণবদের, সেইদিকে সহজে কেউ যাইতে চাহিত না, পারিতও না। এই সমাজ, সেই সমাজের নীতি-বিধি তো বটেই, নানারকমভাবে কোণা ঠাসা হইয়া পড়িয়া তারাও যে খুব একটা স্বধর্মে অটল থাকিতে পারিয়াছে তা নয়, বরং একটা ঘোর দুর্নামের ভাগী হইয়াছে। একসময় তাহাদেরই কাছাকাছি বেবশ্যা পাল্লি গড়িয়া উঠিয়া তাহাদের অবশিষ্ট সুনামটুকুও শেষ করিয়া দিয়াছে। কখনও কখনও কানে আসিয়াছে করমালী শেষ বয়সে সেই বাউলদের খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়া দিয়াছিল। তাহার পিতা এ জন্য উপহাস করিয়াছে; এমনকী তাহার পিতামহী পর্যন্ত সেইসব বিষয়ে নিদারুণ অসন্তোষ দেখাইয়াছে। কিশোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার সেইদিকে কখনও যায় নাই, তেমন কোনো উৎসাহও অনুভব করে নাই। হয়তো বা নানারকম বিধি-নিষেধও তাহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এখন নানাদিক ঘুরিয়া সে সেই পল্লিটাও দেখিয়া লইতে চাহিল।

কিন্তু কোথায় সেই পল্লি! বহমান গাঙের আঘাতে আঘাতে ভাঙিয়া সবই সম্ভবত ভাসিয়া গিয়াছে স্রোতের সঙ্গে, যেমন গিয়াছে অন্যপাড়ের একটা বিশাল স্তূপ। কর্মকার পল্লির মানুষেরাও যেন ভাঙনে ভাঙনে তাহাদেরও ঘর-সংসার লইয়া সরিয়া যাইবার ঠাঁই পায় নাই। একধারের খাড়াপাড়ের মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া স্তূপীকৃত মাটির বাসন-কোশনে খণ্ডগুলির এক একটি স্তর চোখে পড়িতে লাগিল। উপরে কয়েকঘর কর্মকার হয়তো এখনও রহিয়াছে, পথে নারিকেল সুপারি, পানের 'বর' আর অউখের খেতের আশে-পাশে কয়েকটি টিনের বাড়ি। কোনো দিকে এমন কিছু চোখে পড়িল না, যাহার জন্য করমালী বিশেষভাবে সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারিবে। সে কান পাতিয়া শুনিতেও চাহিল কোথাও কোনো দিক হইতে গীত-গান উত্থিত হইয়া উঠিতেছে কিনা। এই রকম একসময়ে একটা বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে তাহার দৃষ্টি পড়িল।

অনেকগুলি ঘর যেন বাহিরের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, অনেকরকম তাল তমাল বনরাজির মধ্যে কোনো নিজস্ব জীবন ধর্মে নিবিষ্ট। কিছু পাখপাখালির ডাকাডাকির শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো কোলাহল নাই। পাশে একটা নালা পার হইয়া নয়ানজুলির মতো সরু একটা পথ কয়েকটা ঘরের ভিতরের নিকট দিয়া উঠানের ঠাঁইতে পৌঁছিয়াছে। একধারে রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া কয়েকটি শাড়ি-বস্ত্র বাতাসের সঙ্গে দুলিতেছে। একটি শনের চাল দেওয়া ঘরের দাওয়ার উপর সামান্য রৌদ্র, একপাশে মাঝবয়সি একটি মেয়ে সম্ভবত কোনো রিপুকার্যে মগ্ন ছিল, শিকদারের উপস্থিতি লক্ষ করিয়া কপাটের দিকে মুখ ফিরাইয়া কাহাকে ডাকও দিল। সর্বদিক অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হইলেও, সেই মহিলার দৃষ্টিতে এক রকম তাচ্ছিল্য লক্ষ করিয়া শিকদার বেশ একটু অপ্রতিভ বোধ করিল। কৌতূহলের বশে এমনভাবে কোনো অন্তঃপুরে উঁকি দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ হইয়াছে ভাবিয়া যখন সে ফিরিবার উপক্রম করিয়াছে, সেইসময় ঘরের কপাটের অন্যধার হইতে একটি তরুণী দাওয়ার উপর নামিয়া আসিল। রুগ্‌ণ মুখ, শীর্ণ শরীর, স্নানান্তে হয়তো সে মাথার দীর্ঘ কেশজালের পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল, শিকদারের দিকে একটু উঁকিঝুঁকি দিয়া দেখিয়া আবারও ঘরে উঠিয়া গেল। যে-মেয়েলোকটি দাওয়ার উপর সূচিকার্যে বসা, সে আবারও সপ্রশ্নভাবে শিকদারের দিকে তাকাইল। তাহার মাথার চুল পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়া, একটা গামছা কাঁধের উপর আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত, আর দুই চোখে মনে হইল দুইরকম দৃষ্টি; তাহাকে মাথায় আঁচল টানিয়া দিতে দেখিয়া শিকদার আরও অপ্রতিভ বোধ করিল।

: কোথা হইতে আসা হইয়াছে?

শিকদারের উত্তরটা খুব স্পষ্ট হইল না; কোনোরকমে শেষ পর্যন্ত বলিতে পারিল : এইদিকে গীতবাদ্যের আসন বসে বলিয়া একটা কথা শুনছিলাম। মেয়েলোকটি একটুকাল অবাক হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহার চোখেমুখে; একটা হাত উঁচাইয়া সে গাঙের দিকটা দেখাইয়া দিল : কবে কোথায় তারা স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া গেছে। তাগো ঠাঁইও ভাঙিয়া পড়ছে, আর সেইসব চলও নাই। তবে হয় বই-কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনও কিছু কিছু তেমন কোনো একটা উপলক্ষ হইলে। কলের গান হয় বাইশকোপের গান হয়। তার জন্যও আগ-আগাম বায়না-বন্দোবস্ত লাগে, যার জন্য আসর, তারগো অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা হয়।

শিকদার তখনও পর্যন্ত কলের গান অর্থাৎ গ্রামোফোন কিংবা বায়োস্কোপের গীত-গানের সঙ্গে তেমন পরিচিত হয় নাই : কৌতূহল বোধ করিয়াছে বটে নানাপ্রকার গান-গল্প শুনিয়া, কিন্তু নিজেকে কখনও বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই জলজ্যান্ত গায়ক-বাদকের উপস্থিতি ব্যতীত সেইসব অনুষ্ঠান কী করিয়া সম্ভব হইতে পারে।

ইতোমধ্যে সেই মেয়েলোকটি আবারও জানিতে চাহিল : কোথা হইতে আসা হইছে? কে পাঠাইছে?

শিকদার আবারও কোনো কিছু যেন স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না : কেউ পাঠায় নাই। কেবল নিজের ইচ্ছায় একটু খোঁজখবর লইতে আসছি। মেয়েলোকটি আবার তাহার শেলাই-এর কাজ হাতে তুলিয়া লইল : যার যার জগৎ-সংসারেরও এক একটা ইচ্ছা আছে মিঞা এখন আর সুখে-দুঃখের ইচ্ছা লইয়াই গীত ধরে না কেউ, কড়ি ফেলিয়াই তার কড়ার হয়।

শিকদার আর কোনো কথা না তুলিয়া ফিরিয়া আসিল। গীত বাদ্যকে কেবল মাত্র জীবিকা-অর্জনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবার অভিজ্ঞতা তাহার অবশ্যই ছিল। যে বয়াতির কাছে তালিম নিতে গিয়াছিল, তাহার সঙ্গে কোনো কোনো ভুবনের ফরমাশি গানের আসরে সময় সময় তাহাকেও শামিল হইতে হইয়াছে। সেইসব সময় হইতেই খেয়াল করিয়াছে, যতবার তেমন কোনো আসরে বসিয়াছে মনের চাহিদা কখনও তৃপ্ত হইতে পারে নাই। তাহার কণ্ঠস্বর অথবা গীতের বিশেষ ভঙ্গির জন্য যে যতই সাধুবাদ দেউক, অন্য অন্য কেউর বাঁধা পদ কিংবা গৎ গাহিয়া সে আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছিল না। ব্যস্তসমস্ত গঞ্জের ঘাটের দিকে ফিরিয়া যাইতে যাইতে তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল পিতামহ করমালীও সম্ভবত কোনো দিন তাহার অভীষ্ট সুখ-শান্তি অথবা আনন্দের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে নাই, হয় বা শুধুমাত্র তাহার ইচ্ছাটাকেই উত্তরাধিকারের মতো সংক্রামিত করিয়া দিয়া গিয়াছে। কেবল অন্যেরই নয়, পিতামহের সমস্ত পথ যে তাহাকেও অতিক্রম করিতে হইবে সেই প্রবোধও সে নিজেকে দিতে পারিল না।

ঘুরিয়া-ফিরিয়া সে আবারও ঘাটের কাছাকাছি সেই বাঁকটার ধারে আসিয়া বসিল। কোন সুদূর হইতে নামিয়া আসা নদী প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়া কুমার-পল্লির পাড় হইতে গরবিনীর মতো ভঙ্গি করিয়া বাঁক নিয়াছে। নিজ গ্রাম ছাড়িয়া এইসব নদনদী, তাহার উপরকার ঝিকমিক করা ঢেউ, পাড়ে পাড়ে কাশফুলের ব্যজন দেখিয়া সব সময়ই তাহার জোবেদার কথা মনে পড়িয়াছে; চতুর্দিকের সব কিছু দৃশ্য-অদৃশ্যের মধ্যে যে কীভাবে এমন রূপী-অরূপী হইয়া থাকিতে পারে, তা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সেইসব ভাবনা আবারও যাহাতে মন জুড়িয়া না বসে তাহার জন্য সে যেন মুখ ফিরাইয়া বসিতে চাহিল। সে খেয়াল করিল যেইখানে বসিতে চাহিতেছে, সেই-ঠাঁইটাও একটা প্রাচীন বটগাছের মূল; শিকড়গুলি প্রবলশক্তিতে সমস্ত দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে গাঙ তাহাকেও উপড়াইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। উপরের ডালপালার মধ্যে যে হরিয়াল পাখিগুলি তাহাদের আহার-বিহারে মগ্ন, তাহারাও উড়িয়া অন্য কোথাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়া বসিবে। পিতামহ করমালী একদিক হইতে সম্ভবত ঠিকই বলিত, এই মুল্লুকের কখনও কিছু স্থির নাই। সম্ভবত সেই কারণেই সকলে গাঙের খামখেয়ালির কবল এড়াইয়া দূর দূর অভ্যন্তরে ঘর-সংসার সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছে। অপেক্ষাকৃত একটা পরিচ্ছন্ন স্থান বাছিয়া লইতে শিকদার একরকম পাড়ের নীচেই নামিয়া আসিল। গাছটার কয়েকটা শিকড় যেন গাঙের উপরই পা বাড়াইয়া তাহার গতিবিধি অনুমানের চেষ্টা করিতেছিল। একটু স্বচ্ছন্দে বসিয়াও শিকদারের মনে হইল, সেই গাছটার সঙ্গে পিতামহ করমালীরও কোথায়ও একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। কেন সেই কথা মনে হইল ভাবিয়াও সে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল।

অথচ যত দিন যাইতেছিল, পিতামহের মতো জীবন-যাপনেও সে কোনো তৃপ্তি বোধ করিতেছিল না। পিতামহের মন কেবলই বহির্মুখি দেখিয়া সে যখন নিজেকে স্থিত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে ঠিক সেই সময়েই তাহারও নৌকা যেন অকস্মাৎ একটা টান খাইয়া দিক-দিশা হারাইয়া ফেলিল। এখন কেবল উদ্ধারের আশাতেই তাহার সকল দিন রজনী কাটিয়া যাইতেছে।

এমন যে নদী সে-ও বাঁক ঘুরিয়াছে; কোন সুদূর উত্তর হইতে সে বহিয়া আসিয়াছে তাহার সর্বাঙ্গ ভরা যৌবনভার লইয়া প্রতি অঙ্গে কাল কাটাইতেছে যেন কোনো রাজরাজেন্দ্রানির রত্নভূষণ, বাস্তবিকই কোনো রমণীর মতো তাহার দেহভঙ্গি, কখনও বা কিছু কথা কলরব। বহুদিন আগে জোবেদার জন্যই সে গাঙের এই রূপ-বর্ণনার জন্য একটা গীত-রচনার উদ্যোগ করিয়াছিল :

কী না ঢঙে কী না রঙ্গে নিরবধিকাল
যমুনা রমণী হইয়া এমন উথাল-পাতাল
সুরয পুরুষ তার, নিত্য করে ঘর
তবু নদী কন্যা থাকে, সূর্য হয় নিত বর

কথাগুলো মনের মতো হয় নাই বলিয়া শিকদার সেই পদগুলি কখনও কোথায়ও উচ্চারণও করে নাই আর। সুর হয় নাই মনের মতো, কথাও খুঁজিয়া পায় নাই মনের সমস্ত ধ্যান বুঝাইবার মতো, শিকদার মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, এমনিতেই মানুষের মনে অব্যক্ত কথার ব্যথা-বেদনার সীমা নাই, এখন কেবল তাহাকে আরও উদ্দীপ্ত করিয়া রাখার জন্য তাহার কবিয়াল-বৃত্তিরও কোনো অর্থ নাই। লোকে, সমূহ যে-কারণটাকে উপস্থিত দেখিল, তাহা লইয়াই গাল-গল্পে মুখর হইয়াছে। শিকদার একসময় উঠিয়া বসিল হাতে জোড় বাঁধিয়া, সে কী এখনও পর্যন্ত বাস্তবিকই কোনো কবিয়াল হইবার মতো কিছু সামর্থ্য অর্জন করিতে পারিয়াছে? কড়ি লইয়া কড়ার পালনের বিষয়ে সে সচেতন থাকিয়াও কেন লতিফের প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেল?

তখন সদরগামী বৈকালের স্টিমার সারা গাঁও ঝপঝপ করিয়া উত্তরের দিকে যাত্রা করিয়াছে। পাড়ে-ভাঙা ঢেউ-এর দৌরাত্ম্যে শিকদারকেও উঠিয়া আসিতে হইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও মঙ্গলের মাও
আগুন জ্বালাও দেখি
মশা মারি বড়ো পোন পোন করে।

আহা, মাছের মধ্যে মাছরে
ইলশা সে না মাছ
ও তোর রুইরে পোঁছে কে
দেখ দেখ তিঁত খলিসা চান্দা ধুরাইনা
মোরগো সংসার রাখিয়াছি।

হ বাড়ির মধ্যে বাড়িরে, ঘরের মধ্যে ঘর
আহা, দালান সেনা বাড়ি
ও তোর ঢেউটিন পোঁছে কে
খড়ুয়া ঝাপড়া মাটির ঘরই নারে
মোরগো সংসার রাখিয়াছি।

নারীর মধ্যে নারী সে কুঁচবরণ নারী
ও তোর গৌরা পোঁছে কে
কুঁজা আর ভাঙাচূরা নারীই সে না
মোরগো সংসার রাখিয়াছে ॥

AMARBOI.COM

বৈকালের স্টিমার আবারও সদরের দিকে দূর হইয়া যাইবার পর ঘাটের চাঞ্চল্য অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। দিনের আলোও তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; বহুজনই ফিরিয়া গিয়াছে আপন আপন লোকালয়ের দিকে, ঘাটে বাঁধা নৌকাগুলির মাঝি-মাল্লারাও সব নিবিষ্ট করিয়াছে নিজ নিজ কর্মে। পাড়ে নামিয়া আরও একবার হোসেনের তালাস করিল শিকদার; তারপর সন্ধ্যা নামিবার সঙ্গে সঙ্গে পাড় হইতে পল্টুন অবধি পাতা বাঁশের কেঁচকির উপরকার তক্তার পুলটার উপর উঠিয়া আসিল। স্টিমার ভিড়াইবার জন্য সেই বিশাল লোহার পলটুনটা চতুর্দিকে মোটা মোটা লোহার শিকলে নোঙরের সঙ্গে বাঁধা গাঙের প্রবল স্রোত তাহার গায়ে লাগিয়াও লাগিতেছে না। আগের ঘাটে শিকদার বাঁধা দেখিয়াছে একটা বড়ো জাহাজের মতোই বিশাল ফ্লাট, আর এইখানে এমন খোলামেলা পলটুন। মনে হইল, এই ঘাট হইতে তেমন মালপত্র চলাচল নাই বলিয়াই এমন ব্যবস্থা। তবু সেই খোলামেলার মধ্যে যেন গাঙের মাঝ-বরাবর খাড়া হইবার সুযোগ পাওয়া গেল। সন্ধ্যার বাতাস যেন সবদিক হইতে ধাইয়া আসিয়া কোনো চপল কৌতুকের মধ্যে তাহাকেও নিবিষ্ট করিতে চাহিল।

: কেটা ওইখানে?

পলটুনের একধারে তেরপলের নীচে কিছু মালপত্র ঢাকা; সেইদিকে জন দুই লোক নিজেদের কোনো কথাবার্তায় মগ্ন ছিল, শিকদার প্রায় অন্ধকারের মধ্য হইতে তাহাদের একজনকে আগাইয়া আসিতে দেখিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইখানে কী করছ মিঞা, এখন কেউর পলটুনে ওঠার নিয়ম নাই, যাও, যাও, পথ দেখো।

শিকদারের ইচ্ছা ছিল বটে সেই নিভৃতে বসিয়া কিছু গীত-গানের কথা আবারও স্মরণ করিয়া লয়, কিন্তু তেমন কোনো সুযোগ না পাইয়া সে ধীরে ধীরে পুল বাহিয়া লতিফের দোকানেই চলিয়া আসিল।

সাড়া পাইয়া লতিফ মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিল : আমি তো চিন্তায় পড়ছিলাম, আপনি বাড়ি ফিরিয়া গেলেন বুঝি! আসেন আসেন, আগে কিছু খাওয়া-দাওয়া হউক। যেমন সাধ্যে কুলায় তেমন কিছু তৈয়ার হইছে।

দোকানের একধারে ঢালাও হোগলা-পাটি বিছাইয়া দিয়াছে লতিফ; পরম উৎসাহে কোথা হইতে একটা দোতারও জোগাড় করিয়াছে, একধারে বসা কয়েকটি লোকও তাহাকে স্মিতমুখে সম্ভাষণ জানাইল।

: আরও অনেক লোকজন আসিয়া পড়তে আছে বয়াতিভাই, এই ফাঁকে আসেন, আমরা খাওয়া-দাওয়াটা সারিয়া লই। লতিফ শিকদারকে পিছন দিকের একটা ছোটো ছাপড়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল : মালিক বাড়ি কাছেই, তাগো সেইখান হইতে একজন মাইয়া ছেইলা আসিয়া রাঁধিয়া দিয়া গেছে। শিকদারের মনে হইল সেরকম অন্ন-ব্যঞ্জন আর বহুকাল চোখেও দেখে নাই; আহারে বসিয়া তবু সে বলিল : এ কী কাণ্ড করছ তুমি, এত সব আয়োজনের তো তেমন কোনো দরকার আছিল না।

লতিফ সস্মিতমুখে জানাইল : একদিকে নানারকমের মাছের কক্ষনো অভাব নাই। তার উপর ধারেই আছে এক জালিয়া পাড়া। আর যে মাইয়াটা রাঁধে, তারও বড়ো হাতের গুণ আছে। শিকদার কিছু জিজ্ঞাসার উপক্রম করিয়াও থামিয়া গেল; কেবলমাত্র আহারের দিকেই মনোযোগের ভান করিয়া বলিল : আমি তো দেখি তুমি এইখানেই ভালো আছ।

লতিফ স্বর নামাইয়া বলিল : তবু দোকানটা তো আমার নিজের না। আমি মালিকের হইয়া চালাই। তার শরিল-স্বাস্থ্য ভালো নাই বলিয়াই অনেক সময় আমার একলাই সকল কিছু দেখতে হয়। আছি মালিক যতদিন রাখে, মনে মনে ইচ্ছা একদিন ব্যবসা বাণিজ্যের কামে লাগিয়া যাই। এখন কেবল চতুর্দিক চৌখ খোলা রাখিয়া সকলরকম কাম কার্যের রীত-প্রকৃতটা বোঝনের চেষ্টায় আছি। দেশে তো তেমন কেউ আর নাই, তাই পিছুটানও বোধ করি না। আরও একটা কথা কী জানেন বয়াতিভাই, এইসব ঘাটে গঞ্জে থাকিয়াই হয়তো আমি কেবলই চঞ্চল, কেবলই কেমন হইয়া উঠিতে আছি। মাঝেমধ্যে ঘুমাইতে গিয়াও হঠাৎ এমন করিয়া উঠিয়া পড়ি যেন কেউরে চা-বিস্কুট আগাইয়া দিতে যাইতেছি।

শিকদার হাসিতে গিয়াও বিষম খাইল।

লতিফ তাহার দিকে এক বাটি পানীয় আগাইয়া দিয়া বলিল : আরও একটা বিষয় এই, মালিক আসিয়া বসে ক্যাশের কাছে। তখন আমারেও সুর করিয়া জানান দিতে হয় সমস্ত অর্ডার ছাপ্লাই। কোথায় কোনখান থেকিয়া তিনি সেইসব দেখিয়া শুনিয়া আনে। ছোট্ট দোকান হইলে কী হইবে, দেখেন নাই বাইরের চালার ধারে একটা সাইনবোটও লেখাইয়া আনছে সদর হইতে। তবে ওই যে কইলাম সুর করিয়া অর্ডার ছাপ্লাই আমার কাজ না। চিন্তা করিয়া দেখেন একটা মানুষ আচুক্কা ঘুমের মধ্য হইতে উঠিয়া সেইরকম ডাক-চিক্করই ছাড়লে কী অবস্থা হইতে পারে! তায় আবার আমায় গলায় তেমন কোনো সুরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই। নকল করিয়া কিছু করতে গেলে কেমন যে ভ্যাঙান ভ্যাঙান বলিয়া মনে হয়। নেন, নেন বয়াতিভাই, আরও কিছু নেন।

শিকদার এড়াইয়া গেল : না, না, যথেষ্ট হইছে। গীত-গানের আগে আমি কখনো আহারে বসি নাই।

লতিফ একটুকাল অবাক হইয়া রইল : আমি তো তা বুঝি নাই। ঠিক আছে আসনের পর আবারও না হয় কিছু মুখে দেওন যাইবে।

ইতিমধ্যে দোকানে বেশ কয়েকজন লোক আসিয়া লতিফকে ডাকাডাকি শুরু করিয়াছে। কেউ হয়তো সেই ঘাটের বাসিন্দা, কেউ কেউ বা মাঝি মাল্লা। শিকদার সকলের মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবারও সাহস পাইল না। লতিফ যখন দোতারাটা তাহার হাতে তুলিয়া দিল, তখন সে মুখ নামাইয়া তাহার সুর বাঁধতে ব্যস্ত হইল বটে, কিন্তু কেবলই মনে হইতে লাগিল হঠাৎ করিয়া সেইরকম গানের আসরে যোগ দেওয়া তাহার পক্ষেও সঙ্গত হয় নাই।

একবার বৈকালে দেখা সেই মেয়েলোকটির কথাও মনে পড়িয়া গেল : যখন তখন সুখ দুঃখে গীত ধরে না কেউ। যে ইচ্ছাটা গীত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারে তাহাকে কখনই বা সে নিজে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিল।

মুখ তুলিতেই চোখে পড়ল, আসরে আরও কিছু লোকজন আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে একজনকে কোথায় দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল; দীর্ঘশ্যামল চেহারা সাধারণ বেশ-বাস পরিহিত হইলেও অন্যান্যদের তুলনায় অন্যরূপ। দুইচোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি মেলিয়া তিনিও তাহার দিকে উৎসুকভাবে তাকাইয়া রহিয়াছিলেন। লতিফও সকলকে চা আগাইয়া কাছে আসিয়া বসিয়াছিল; শিকদারের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সে বলিল : হ, আমাদের ঘাট মাস্টার। বয়াতিভাই, উনিও আপনার গীত শুনতে চাইলেন।

: আমি থাকলে আপত্তি আছে? ঘাট-মাস্টার সরলভাবে জানিতে চাইল : আমার টিকেট ঘরের কাজকর্ম শেষ, এই সময় এইখানেই কিছু গল্প-সল্প করিয়া সময় কাটাই। এমন গীতের আসরের কথা জানিয়া আমিও বসিয়া গেলাম।

: ভালো, করছেন, খুউব ভালো করছেন।—লতিফ-ই মাঝে কাড়িয়া জবাব দিল : সেইসব কোনো কথা না, একসময় ছোটো-বড়ো কত আসরে গীত গাইছে বয়াতি ভাই। এখন কেবল অনেকদিন যাবৎ তেমন চর্চা নাই বলিয়াই একটু দোমনা হইয়া পড়ছেন।

: তুমি শুরু করো, শুরু করো, আমিও তোমার একজন গুণগ্রাহী। বড়ো আশা লইয়া বসছি।

শিকদার আবারও মুখ নামাইয়া মনোযোগ দিতে চাহিল দোতারার উপর আঙুলগুলির দিকে : বারংবারই মনে আনিতে চাহিল গাঙপাড়ে খলবল করা তরঙ্গগুলির কথা, সমস্ত জড়তা ভাঙাইয়া তাহাদের মনে সারশীলতার ধ্যান কখনও তাহার পক্ষে সহজ হয় নাই। অনেক জোয়ার ভাটার অনেক অনেক তীর-তট ছুঁইয়া পার হইয়া সে যেন ধীরে ধীরে কোনো স্রোতের মধ্যে ফিরিয়া গেল। এক সময় দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সব কিছু মুছাইয়া সে ধীরে ধীরে গাহিতে শুরু করিল তাহার গুরুর কাছে শেখা একটি গান :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকুল হইয়া কান্দি আমি বসিয়া নদীর কূলে রে
আমায় কে বা পার করে রে, কে বা পার করে।
পার হইতে আইলাম আমি খেয়া-নদীর পাড়ে রে
ঘাট-মাঝির যে নাম জানি না ডাক দিব কারে রে।
কালা পানির কালা কুম্ভীর উঠছে বালুর চরে
কোন সময়ে ধরিয়া খাইবে পরান কাঁপে ডরে রে
ছায়া নিতে গেলাম আমি এক বটবৃক্ষের তলে রে,
সেই না বৃক্ষ দেয় না লক্ষ্য কোন সে কর্মফলে রে।

ধীরে ধীরে গলা খুলিয়া আসতে লাগিল; একই পদ নানাভাবে গাহিয়া শিকদার যেন সমস্ত আকুতিকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিল। কেবল সেই নয়, বাহিরের ঘাট গাঙ, নৌকার ভিড়ে, গঞ্জের গাছপালার মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল স্তব্ধতা। আসরে আরও কিছু মাঝি-মাল্লাদের ভিড় বাড়িয়া গেল। লতিফ তাহাদের ঠাঁই দিবার এবং সমাদরেরও কোনো ত্রুটি রাখিতে চাহিল না।

প্রথম গানটি শেষ করিয়া কোনো অজ্ঞাত কারণে শিকদার যেন আর মুখ তুলিয়া তাকাইতে পারিতেছে না; কেবল একসময় বলিল : মনে কয় তোতাপঙ্খির নাহান আউড়াইয়া গেলাম। পরান-ছোঁওনের মতো গাহনের সাধ্য হইল না।

আসরের মধ্যে হইতে একজন বলিল : খুউব, খুউব। পরান ছুঁইতে পারলা বলিয়াই তো সকলে এমন তবধ হইয়া আছি। ধরো, ধরো তুমি আরেক খান, এই মৌজটা ভাঙিয়া দিও না। শিকদারও এতক্ষণে তাহার জড়তা কাটাইয়া উঠিতেছে। সে টের পাইতেছিল এখন সে যতই গাইবে ততই খুলিয়া যাইবে গলা, একে একে খুলিয়া যাইবে বহু বিস্মৃতির কপাট, কোনো গহন গভীরে ডুব দিয়া সে-ও সম্ভবত উঠাইয়া আনিতে পারিবে কোনো মনি মুক্তা; আর কিছু না হউক, কখনও একটা অজ্ঞাত জগতের রোমাঞ্চ হয়তো সে-ও অনুভব করিতে পারিবে। একমাত্র গানের আসর ছাড়া সেই রোমাঞ্চ যেন অন্য কোথায়ও বড়ো ঘটিয়া ওঠে না। আত্মমগ্নভাবে যদিও সে দৃষ্টি বুলাইয়া লইল সকলের প্রতি, উৎসুকমুখ ঘাট মাস্টারকেও সে দেখিল কি দেখিল না, আবারও সে শুরু করিল অন্য এক পদাবলী :

বিধি যার কর্মে যা লিখিয়াছে রে
দুঃখ কান্দনে যায় না।
আমি দুঃখ লইয়া যাই বন্ধুর বাড়ি
বন্ধু ডাকলে সাড়া দেয় না॥
সেই দুঃখের ডালি লইয়া মাথে
ঘুরিয়া বেড়াই ভবের পথে
হাটে দুঃখ বেচব বলে রে
সেই দুঃখ কেউ দর করে না যে,
দুঃখ সুখী জনে দর করে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর করে আরও দুঃখী জনা ॥
সুখী থাকে দালান-কোঠায়
দুঃখী থাকে বৃক্ষ-তলায়
সুখী প্রেম-সাগরে ডুবিয়া মরে
দুঃখী সাঁতরাইয়া কূল পায় না ॥

যদিও প্রতিটি পদের সুরের মধ্যে নিজেকে যেন সম্পূর্ণ উজাড় করিয়া দিতে চাহিল শিকদার, কিন্তু মনের অতৃপ্তি ঘুচিল না। স্মৃতির মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিল আরও অজস্র পদাবলী। শ্রোতারা যতই মুগ্ধ থাকুক, এক সময় শিকদার দোতারাটা সম্মুখ নামাইয়া বসিল।

লতিফ তৎক্ষণাৎ আপত্তি দেখাইল : সে কী, বয়াতিভাই? বেশ তো চলতে আছিল, চলুক, চলুক।

শ্রোতাদের মধ্যে হইতে একজন বলিল : আহা, একটু জিরাইতে দেও মিঞা। গাওন বাদনের মধ্যেও একটা কষ্ট আছে।

আরও একজন বলিল : একটানা গাইতে গিয়া হাট-বাজারের বয়াতিদের কী দশা দেখো না, মাঝে-মধ্যে সুরটাই কেবল মালুম হয়, গলা ফ্যাস-ফ্যাসত করে কি করে না, কোনো কথা আর পষ্ট বুঝন যায় না।

: হ, হ, মানুষ আর কলের গান না।

: রাখো তোমার কলের গান! তা দেখিয়া-শুনিয়া তাজ্জব হওন যায়, কিন্তুক এমন করিয়া মন উতলা হয় না।

শিকদার অবসর খুঁজিয়া লতিফকে বলিয়া কিছুকালের জন্য বাহিরে নামিয়া আসিল। তখন ঘন-রাত্রির অন্ধকার যেন বাতাসও কোথায় হটাইয়া লইয়া গিয়াছে। ধীরপদে সে পলটুনের দিককার পুলের উপর গিয়া দাঁড়াইল।

এমন যে অথৈ নদী, তখন তাহাকেও যেন আর চোখে পড়ে না। অথৈ চতুর্দিকের অন্ধকারও কিন্তু ধীরে ধীরে উপরের আকাশে নজরে পড়িল কতকগুলি তারা, ঘাটের একপ্রান্তে কোনো নৌকার মধ্যে কয়েকজন লোকের সাড়াও যেন তাহাকে নিত্যদিনের জগতে ফিরাইয়া নিয়া আসিল।

সেইসময় আরও কানে আসিল লতিফের আসরে অন্য কে একজন কিছু গান ধরিয়াছে; সৌজন্যবশত সে ফিরিতে গিয়াও থামিয়া পড়িল। ঘাট-মাস্টারকেও তাহারই দিকে আসিতে দেখিল।

: কী হইল কবি, হঠাৎ এমন উঠিয়া আসলা কেন?

শিকদার একটা সঙ্গত উত্তর দিতে চাহিয়াও পারিয়া উঠিল না, সসঙ্কোচে জানাইল : অনেকদিন অভ্যাস নাই, তাই একটু ডরও ধরিয়া গেল!

ঘাট-মাস্টার কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল।

: সব সময় না, মাঝে মধ্যে আগেও কয়েকবার তখন মনে হইয়াছে। শিকদার একটা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিল : একটু জিরাইয়া না লইলে মনে হয় যেন কোন ভাবের জগতের মধ্যেই তলাইয়া যাইতে শুরু করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই প্রসঙ্গে পিতামহ করমালীর বিষয়ে সে কিন্তু উল্লেখ করিতে গিয়াও থামিয়া গেল; মনে করিল হয়তো প্রগলভতা হইয়া যাইবে, ঘাট-মাস্টার শিক্ষিত ভদ্রমানুষ, হয়তো বা হাসিয়াও ফেলিবে। তাছাড়া, গানের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া করমালী যেভাবে বাহ্যজ্ঞান বিস্তৃত হইয়া যাইত, তা গায়ক না হইলে হয়তো সে নিজেও কখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; সংসারের কেউ বোঝে নাই বলিয়াই আরও সংসার-বিরাগী হইয়া উঠিয়াছিল সে। শিকদারের বড়ো ভয় সেও হয়তো তাহার মতোই হইয়া পড়িতেছে।

: বড়ো ভালো লাগল তোমার গান কবি। সারা দিনমানের অনেক রকম তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া মনটারে বড়ো উপরে রাখন যায় না। তোমার সব গীত-গান শুনতে শুনতে অনেক কথা মনে উদয় হইল, কবি।—ঘাট মাস্টার পলটুনের দিকে পা বাড়াইয়া বলিল : আসো এমন, খোলামেলায় বসিয়া দু-চাইরটা কথা হউক।

শিকদার একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিল : আমার নাম কানু, কানু শিকদার। কেউ কেউ বয়াতি বলিয়া উল্লেখ করে। কিন্তু আমার আদত নামটাও এখন হারাইয়া যাইতে বসেছে।

ঘাট-মাস্টার একটা ঠাঁই বাছিয়া আসন লইতে বলিল : আমার দিকটা দেখো আমারও আসল নামটা যেন কোথাও নাই। জগৎ-সংসারে যে যা করে, সেই কর্মেই তার পরিচয়। তুমি জগৎ-জীবনের কথা গীতে-কবিতায় শোনাও বলিয়াই তো তোমারে কবি কইলাম।

শিকদার সসঙ্কোচে বলিল : কিন্তু আমি যে কেবল সেইসব গীত-গান করি যা দেশে দেশে মনে মনে ছড়াইয়া রইছে। কত চেষ্টা করলাম সুর আর মনের কথারে যেন কক্ষনোই ঠিকঠাক মিশ খাওয়াইতে পারি নাই। এই দেখি, সুরের আবেগটাই বেশি হইয়া উঠে, আবার এই দেখি যে কথাই বড়ো হইয়া যায়। এইদিক-সেইদিক হইতে সেইসব কথা আমি তুলিয়া-ছানিয়া গাইয়া যাই, তার জন্য তেমন কোনো কৃতিত্বের দাবি আমি করতে পারি না। ঘাট-মাস্টার আর কোনো মন্তব্য করিল না। গাঙের স্রোত বহিয়া চলিতেছিল। পলটুনের গায়ে নানারকম ধ্বনি তুলিয়া রাত্রির বাতাসও যেন কিছু খুঁজিয়া ফিরিতেছিল সর্বত্র। শিকদার একটুকাল অপেক্ষা করিয়া জানিতে চাহিল : আপনারেও আমি নিরাশ করিয়া দিলাম।

ঘাট-মাস্টার হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিল : নাহ্, বরং ভাবতে আছিলাম। তোমার কথা শুনছি কিছু-কিছু, এখন এইরকম চিনতে পারিয়া খুশি হইলাম। কবি, তোমার অনেক গুণ। এমন গীত-গান, এমন ক্ষমতারে যে পেশা করো নাই, তার জন্যই মনে হয় তোমার জন্য যেন কবির কর্তব্যটাই নির্দিষ্ট হইয়া রইছে।

শিকদার একটু যেন কাঁপিয়া উঠিল, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই ঘাট-মাস্টারের কথা; সম্ভ্রম করিয়া সে কোনো ব্যাখ্যাও চাহিতে পারিল না। একটু ইতস্তত করিয়া সে বলিল : লতিফ ছেলেটা ভালো। এত কষ্ট করিয়া আসর বসাইছে, এমন করিয়া উঠিয়া আসিয়াও স্বস্তি পাইতে আছি না!

ঘাট-মাস্টার মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল : কষ্টটা কি লতিফের একলার? আসরে যারা আসছে, তাগোও আছে। কান পাতিয়া শোনো, এখন আদিরসের বন্যা চলতে আছে! জানো তুমি তেমন কিছু গীত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ঘাট-মাস্টারের কথা হয়তো কিছু বুঝিল, কিছু বুঝিল না। মনে পড়িয়া গেল গুরু কবিয়ালের নির্দেশে একসময় তাহাকে বড়ো বড়ো মানুষের ঘর উঠাইবার সময় ছাদ-পিটানোর কাম-কার্যেও উপস্থিত থাকিতে হইয়াছে; মূল বয়াতি কাজে উৎসাহ জোগাইবার জন্য একটার পর একটা সময় প্রসঙ্গ লইয়া ছড়া বাঁধিয়াছে বেহালাবাদকের তালে তালে; কোনো কিছুর পরোয়া না করিয়া সে বারংবারই ঘুরিয়া-ফিরিয়া ধুঁয়া তুলিতে চাহিয়াছে যে জীবনে নর ও নারীর সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো রসের বস্তু নাই। শিকদার যে সেইরকম সংসর্গেও কোনোরকম স্বস্তিবোধ করে নাই।

ঘাট-মাস্টার একসময় তাহার দিকে ফিরিয়া জানিতে চাহিল তাহার সব কথা, কোথায় ঘর-বাড়ি, কেনই বা জীবনে এত বৈরাগ্য, কেনই বা শুধুমাত্র দুঃখের গীতটাই একমাত্র তাহার মনের আকুতি হইয়া উঠিয়াছে, এমনও হইতে পারে না যে লোকে আপন দুঃখটাকেই বড়ো করিয়া দেখে বলিয়াই জীবনের সবখানে দুঃখ ছাড়া অন্য কিছু নজরে পড়ে না? ঘাট-মাস্টারের তো মনে হয় একটা আনন্দের মধ্য দিয়াই সৃষ্টি হইয়াছে জগৎ-সংসার, সেই আনন্দ কেবল ওই আদিরসে আপ্লুত হইবার জন্যই নয়, আরও কিছু বড়ো এবং বৃহৎ? গীত কি কেবল হয় সুরে আর কথায় মিলাইয়া, এই এত বড়ো বিশাল ভুবনটার সঙ্গেও মিল রাখিতে হয় না? কত মানুষই তো কতো দুঃখ-ব্যথা বুকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ভুবনের পথে-ঘাটে। স্টিমারের টিকেট-ঘরে বসিয়া সে দেখে কত মানুষ ছোটাছুটি করিতেছে পৃথিবীর সর্বত্র, এক এক ঘাটের টিকেট দিতে দিতে ঘাট-মাস্টারের বারংবারই মনে হইয়াছে তাহারা উদ্দিষ্ট-অভীষ্ট সম্বন্ধে বাস্তবিকই অভ্রান্ত কিনা; শিকদারের গান শুনিতে শুনিতে তাহারও মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে দুঃখভরা পৃথিবীর অতৃপ্তি হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া শান্তি-স্বস্তির পথে উদ্বুদ্ধ করা যায় কি না। সুখ কোথায় তা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে না পারিলে হয় অতৃপ্তিটাই বড়ো হইয়া থাকিবে, না হয় একমাত্র কতকগুলি আদিরসের দিকেই সকলে ঝুঁকিয়া পড়িবে।

: তোমার মতো কোনো গুণ আমার নাই কবি। দিনে দিনে কেবলই দেখতে আছি, আমার এই একলার দুঃখটাই বড়ো কথা না, কত দুঃখ এই সংসারে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মনে কত শত দুঃখ। তোমারই গানে শুনলাম কেউ বা ডুবিয়া মরে, কেউ বা সাঁতরাইয়া কূল পায় না। এই কথা তোমার মুখে শুনলাম বলিয়াই মনে হইল একবার আলাপ করি। এই দুঃখ পার হইবার কোনো নতুন উদ্দীপনা মানুষের মনে দেওন যায় না? শিকদার মনোযোগ দিয়া ঘাট-মাস্টারের কথাগুলি শুনিতে লাগিল; কোনোরকম মন্তব্য করিবার সাহস হইতেছিল না, কোনো কোনো কথা তাহার আপন ভাবনাগুলিকে আরও উদ্দীপিত করিয়া তুলিল।

দুঃখ কি কেবল কোনও কন্যার জন্য? দেখো নাই আকালের দিন? চৌখে পড়ে না সেই দুঃখ যখন মানুষ আহার পায় না জীবন রাখার, পোশাক পায় না শরম ঢাকার? কী দুঃখে মানুষ পথে নামিতে পারে দয়ার ভিক্ষার হাত পাতিয়া, সমস্ত ভালোবাসার স্বপ্ন নিবাইয়া দেয় ঝি-বউ আত্মহত্যা করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিতে চায় তোমার-আমার মতো কত শত মানুষ! সেই দুঃখে, আমার তো মনে হয়, যেন আসমানও ভাঙিয়া পড়িতে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সময় শিকদার কেবল বলিতে চাহিল : এই দুঃখ বিধির বিধান বলিয়াই তো মানিয়া লইছে সকলে। এই দুঃখই ভব-যন্ত্রণা সংসারের বেয়াধি। আমার নানার কাছে এমন কথাই বারংবার শুনছি। আউল-বাউলের গীত-গান কী তত্ত্বকথার মধ্যে তো দেখি এই বিষয়টাই মুখ্য হইয়া আছে।

: সেইখানেই তো আমার কথা। ঘাট-মাস্টার একটু নড়িয়া চড়িয়া বলিল : এইখানেই দেখি, একটা বড়ো ফাঁকির রাজত্ব চলতে আছে চতুর্দিকে। জগৎ-সংসার যে সকলের জন্য আনন্দের হইতে পারে সেই কথা কেউর মুখে নাই, কোনো কবির গীত-কথাতেও শুনি নাই। কবি, আইজ সন্ধ্যায় তোমার মুখে সেইরকম কোনো গীত শুনতে পাইলে আমি আরও খুশি হইতাম।

শিকদার কিছুকাল সঙ্গত কথা খুঁজিবার চেষ্টা ছাড়িয়া বলিল : বিধির বিধানের বাইরের কোনো লবজোর দিকে আউগানের কি সাধ্য আছে মানুষের? দুঃখ তো সৃষ্টিকর্তারই শাস্তি। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে কত পাপ করিয়া চলছে মানুষ, দিনে দিনে তার পাপ, তার শাস্তি ক্রমে ক্রমে আরও বেশি হইয়া উঠতে আছে, চতুর্দিকে কেবল এই কথাই তো শুনি।

ঘাট-মাস্টার হাসিয়া উঠিল, যেমন সে যখন-তখন হাসে, তারপর ধীরে ধীরে বলিল : এ জন্যই তো তোমার কাছে নতুন কিছু শুনতে চাই কবি। বিধিরই বিধান আছে জ্ঞানচর্চার। মিল কেবল সুর আর কথারই না, একটা বিশেষ জ্ঞানরেও দোসর করিয়া লইতে হয়। যারা বলিয়া আসছে জীব-জগতের সব দুঃখ সৃষ্টির গজব, তারা চিরকালই অমন বলিয়া আসছে, আরও বলিয়া চলবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান আউগায় না বলিয়াই এইখানে একটা ফাঁকি আছে, ফাঁকি দেওনের সুযোগ আছে। আসলে সৃষ্টির গজব ওই আউল-বাউল আর ধর্মগুরুর দল। নিজ দুঃখ মোচনের শক্তি মানুষের নিজেরই আছে। তোমার এক গীতেই তো শুনলাম বিধি যার কর্মে যা লিখ্যাইছে। এইভাব এক উপলব্ধি। তার সঙ্গে যুক্ত হইছে 'দুঃখ কাঁদলে যায় না।' আমি মনে দিয়া শুনলাম। মনে অনেক কথার উদয় হইল। কেন জানি না বোধ করলাম আরও কিছু নতুন কথা শোনা যাইবে তোমার মুখে। কর্মের গান, একসঙ্গে সমস্ত জীবন দিয়া নতুন জীবনের গান। কবি কবে সেই কথা, সেই গীত-গান তোমার মুখে শোনার সুযোগ হইবে? আমার তো আশা, তোমার মতোই কেউ পারবে সব ভণ্ডামি সব কৌশলের ষড়-জাল ছিন্নভিন্ন করিয়া আসল আনন্দের সন্ধান দিতে। কবি, কবে সেই দিন হবে? শিকদারের মুখে কোনো উত্তর আসিল না। শৈশবকাল হইতে, বৃত্তি না হউক, একটা আনন্দ হিসাবে যে পথ সে বাছিয়া লইয়াছিল, তাহার উপরে চলিতে চলিতে অজস্র ভাবনা তাহারও মনে গুমরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তেমন পরিস্থিতির মধ্যে সে কখনও পড়ে নাই। কেন যেন মনে হইতে লাগিল ঘাট-মাস্টার নয়, কোনো ঘাট-মাঝিই তাহাকে খেয়া-পাড় হইতেই মনস্থ করিবার জন্য ডাকাডাকি করিতেছে।

: অবসরে-আলস্যে না, কর্মে-ধর্মেও যখন তোমার গীত-গান মুখে মুখে গাওয়া হইবে, তখনই সার্থক হইবে তোমার 'কবি' নাম। দেখিও, তোমার গীত শোনার জন্য আমি, আমার মতো আরও বহু জন প্রথম সারিতে বসিয়া আছে। আগামীদিনের কর্ম কার্যের উপযুক্ত বল-ভরসার জন্য কোনো দুঃখের রাত্রি পার হওন কিছু কঠিন হইবে না। কবিরাই তো যুগে যুগে মানুষের পথ দেখাইয়া আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গানের আসরে বসিয়া শিকদার কিছুটা ইচ্ছায়, কিছু অনিচ্ছায় এক ধরনের রোমাঞ্চকর প্রত্যাশা করিতেছিল। ঘাট-মাস্টারের প্রতিটি কথায় যেন অর্গল খুলিয়া গেল অন্য কোনো ভুবনের, বারংবারই তাহার মনে হইতে লাগিল সে যেন অবশ্যম্ভাবী কোনো সত্যের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেইখান হইতে আর অন্য কোনো দিকে যাইবার উপায় নাই। অন্যের গীত-গান কথার ঐতিহ্য লইয়া যদি তাহাকে নিজ জীবন-যাপনের জন্যও অগ্রসর হইতে হয় তাহা হইলেও তেমন মুসলাধান হয়তো আর মিলিবে না। অনেকক্ষণ অবধি মুখ নিচু করিয়া নানাভাবে ঘাট-মাস্টারের কথাগুলি মনে মনে পর্যালোচনা করিল শিকদার, এক সময় মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল : হয়তো আমি সামান্য বলিয়াই কখনও কোনো বৃহতের কথা চিন্তাও করতে পারি নাই। আমাকে দিয়া জগৎ-সংসারের কোনো কাম হইলে আমারও জীবনধারণ সার্থক হইয়া যাইবে।

ঘাট-মাস্টার হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল! চলো যাই, এতক্ষণে আদিরসের বিষয়েও সকলের ক্লান্তি ধরিয়া যাইবার কথা। দেখন যাউক, অন্যেরাও বা কতটা মিলমিশ করতে পারছে!

সুখেরে করিয়াছি বৈরী রে বঁধু
দুঃখেরে দোসর
আমি পরের পিরিতে মজিয়া
আপন করিয়াছি পর।
কুলেরে করিলাম বৈরীরে
আমি অবলা রমণী
বঁধুর পিরিতে ডাকিয়া
কলঙ্কেরে আনি।
ঘরেতে আগলেরে বঁধু
দুয়ারেতে কাঁটা
সাধ করিয়া খাইয়াছিরে
পিরিত গাছের গোটা।
যেজন খাইয়াছে রে বঁধু
পিরিতিরই ফল
তার কলঙ্কে মরণ বঁধু
জীবন সফল ॥

AMARBOI.COM

নৌকার পর্দার উপর হইতে হাত সরাইয়া জোবেদা বহুক্ষণ অবধি নতমুখে বসিয়া রহিয়াছিল। হয়তো অনেক-কিছুই বলিবার বা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সম্ভব ছিল না। স্বামী তাহাকে কোনো পীর-সাহেবের দরগায় লইয়া যাইবার পথে কী উপলক্ষে উঠিয়া গিয়াছিল গঞ্জের ঘাটে, পিছনে শাশুড়ি কেবলই বকবক করিতেছিল। সে বেশ শক্তভাবেই শুনাইয়া দিতেছিল যে-মেয়েমানুষ বাহিরের দিকে উঁকিঝুঁকি দেয়, তাহার সংসারে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী; আরও শুনাইতেছিল তাহাকে উপযুক্ত হেদায়াতের জন্য পীরসাহেবের কাছে সে আরও কী কী বলিবে। সেও শিকদারকে দেখিতে পাইলে, অথবা হঠাৎ আসগরউল্লাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কিছু টের পাইলে আরও অনর্থ ঘটিবে। জোবেদা গাঁ-গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের মতোই 'বড়ো' হইয়া উঠিয়াছে এবং একদিন যেমন হয়, আত্মীয়-স্বজনদের বন্দোবস্তে বিবাহে বসিয়াছে। বারংবার নানাদিক হইতে নানাকথা শুনিয়া শুনিয়া তাহারও মনে হইয়াছিল বিবাহের অর্থ বিত্ত, সম্পত্তি, স্বচ্ছন্দ্য। বাহিরের জগতের বিভিন্নরকম দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া-জানিয়া সে-ও কিছু স্বাধীনতার প্রত্যাশা করিয়াছিল। অথচ সংসার-সংসার খেলার মধ্যেও যে আনন্দ অনুভব করিয়াছে তাহাও কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই। স্বামী আসগরউল্লা বেশ বয়সি এবং ব্যবসায়ী মানুষ। হাটে হাটে কাটা কাপড়ের কারবার করিয়া এখন নলসিঁড়ি গঞ্জে একটি ছোটো দোকান দিয়াছে। অধিকাংশ সময়ই সে কাটায় বাহিরে। বিবাহের কিছুদিনের মধ্যেই সে জোবেদাকে বুঝাইয়া দিয়াছে কতগুলো স্থূল কর্তব্য ছাড়া তাহার আর কোনো বিশেষ ভূমিকা নাই। তাহার প্রধান কর্তব্য শাশুড়ির সেবা-যত্ন, সে ব্যবসা উপলক্ষেই বাহিরে থাকে না অন্য কোনো ঠাঁই-সংসার আছে কী নাই সেইসব কৌতূহলও তাহার অধিকারের বাইরে। শাশুড়ি-ভাগ্যও এমন যে শত চেষ্টা করিয়াও তাহার মন জোগানো যায় না; সর্বক্ষণ গজগজ করিবার মতো একটা না একটা বিষয় সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই। সন্তানবতী না হওয়ায় তাহার নানারকম কটুক্তি-উপহাস আরও বাড়িয়াছে। এমন অবস্থায় তাহার মতো মেয়েরা বাপের বাড়িতেই ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। জোবেদার পক্ষে সেইরকম কোনো সম্ভাবনা ছিল না। মা আর বাঁচিয়া নাই, পিতাও যেন কর্তব্য সমাধা করিয়া এড়াইয়া রহিয়াছে। আপন স্বাধীন সংসারের আগ্রহে তাহাকে যে এমন বন্দিনী হইয়া পড়িতে হইবে তা সে কোনোদিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। সেই দুঃখ লাঘব করিবার মতো কোনো উপায় ছিল না। মনে হইয়াছে কয়েকবার শিকদারের কথা, যে তাহাকে দুঃখহরণ রাজপুত্রের কাহিনি শুনাইয়াছে, কখনও কখনও কিছু আশাও মনে উঁকি দিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহারও মধ্যে কাম্য পৌরুষ সে খুঁজিয়া পায় নাই। সেদিনও মনে ক্ষোভ দেখা দিল শিকদারই বা কেন আগাইয়া আসিয়া দুইটা কথা বলিল না।

আসগরউল্লা গম্ভীর পুরুষ, কথাবার্তা বলে কম, হাসি-পরিহাসও তাহার ধাতে নাই, বরং উলটা বুঝিয়া বসে। সে যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, আরও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতে হয় জোবেদাকে। একদিকে তাহাকে খুশি রাখা, তাহার জন্তুর মতো সকল খেয়াল-খুশি এবং সাধ-আহ্লাদ মিটাইয়া চলা, অন্যদিকে সেই সব কালে শাশুড়ির মেজাজ আরও তীব্র হইয়া উঠিত। তাহার নানারকম বিদ্রূপও মন্তব্যের অশ্লীলতায় সে যেন পুকুরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াও শান্তি পাইত না। মাঝে মধ্যে মনে হইত মেয়েমানুষ হইয়া জন্মগ্রহণের মতো অভিশাপ বুঝি আর নাই। কখনও কখনও সে বহু কষ্ট করিয়া একটু নিভৃতি খুঁজিত; কোনো আপনা বিষয় লইয়া মনে মনে নাড়া-চাড়া করিত নানা কথা, কখনও শৈশবদিনের নানা স্মৃতি মনে ভিড় করিয়া আসিত। কখনও মনে হইত সুযোগ পাইলে সে যেন আবার তাহার কৈশোরকালের মতো 'কুড়া'য় মাতিয়া উঠিতে পারিবে কিন্তু শাশুড়ির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন বাজ-চিলকেও হার মানাইয়া দিত।

: কোথায় চাইয়া আছিলা অমন করিয়া? এ?

: কোথাও না।—জোবেদা তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাশুড়ি ছাড়িত না : দেখো, দেখো, চৌখের উপর মিছা কথা! আমি সেই কখন থেকিয়া দেখতে আছি।

: বেশ তো, দেখেন আপনে যা-খুশি, কয়েন আপনে যা-খুশি।

শাশুড়ি আরও ফুঁশিয়া উঠিত : কী, এখন মুখের উপর কথা। চোপা সামলাও বউ। পোলারে যদি বলি ওই চোপা ছেইচ্চা দেবে কইলাম।

জোবেদা সংযম হারাইয়া ফেলিত, ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিত : ক্যান আপনে আমারে একটু শান্তিতে থাকতে দেখতে পারেন না? কোন দিকে চাইয়া কী দেখছিলাম, কী ভাবতে আছিলাম সবই কওন লাগবে আপনারে? আমার উপর এমন চৌখ রাখার কী দরকার পড়ছে?

শাশুড়ি দমিত না : নিশ্চয় দরকার আছে, তোমার মতিগতি ভালো না। আমার এমন ছাওয়ালটারেও ঘরে বাঁধিয়া রাখতে পারতে আছ না? এতদিন চলিয়া গেল তবু তার কোনো উদ্দেশ নাই?

: আপনিই জিজ্ঞেস করিয়েন তারে সেই সব। না হয় আপনেই ভালো করিয়া জানেন।

: আমি জানি? অ্যাঁ, কী জানি আমি?—শাশুড়ি তাহাকে কোনোক্রমেই রেহাই দিতে চাহিত না; কোনো কথার জবাব না পাইলে আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত; কেবল এক সময় শারীরিক শ্রান্তির জন্যই কোথাও বসিয়া হাঁপাইতে শুরু করিত : আসুক এইবার গ্যাদা বাড়ি, আমার উপর চোপা-চালানোর একটা বিচার চাই।

: আসুক, আমিও এর একটা বিহিত চাই। আসমানের মেঘও দেখন যায় না চৌখ তুলিয়া?

শাশুড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে তবু বলিত : দেখছি, আসমানটা বুঝি পাছ-দুয়ারের পুকুর ধারে উবধ হইয়া খাড়াইয়া আছিল!

সেই শাশুড়ি এখন শিকদারকেও দেখিয়া ফেলিলে আর রক্ষা থাকিত না।

ঘটনা কেবলই গড়াইয়া চলিত। আসগরউল্লা একদিন বাড়ি ফিরিলে সে শতগুণ করিয়া নালিশ উঠাইত; আহার-বিহার এমনকী স্বামী-স্ত্রীর নিভৃতির কালেও সে সমস্ত অভিযোগ স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিত। আসগরউল্লাও এক এক সময় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত; আদর-সোহাগের ভান করিয়া সে ঝাঁপাইয়া পড়িত তাহার উপর : তোমারে বলি নাই আমি 'মা'-এর সঙ্গে আদব-লেহাজ লইয়া চলবা, ঠেশ দিয়া কথা কইবা না? এ? কই নাই?

জোবেদা ভয়ে কাঠ হইয়া যাইত, পীড়াপীড়িতে কখনও বলিত : আমি তো চেষ্টার ত্রুটি রাখি না।

আসগর জানিতে চাহিত, সমস্ত শরীর দুমড়াইয়া : তবু কেন এমন হয়?

এক সময় জোবেদাকে কাঁদিয়া বলিতে হইতে : আমি জানি না, জানি না!

আসগরউল্লা আর কোনো প্রশ্ন করিত না; সমস্ত অভিযোগ-আক্রোশের প্রতিশোধস্পৃহা লইয়া সে জোবেদার দেহটাকে দলিত-মথিত করিতে শুরু করিত; সে শ্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত জোবেদা যেন নিশ্বাস লইবারও অবকাশ পাইত না; কেবল যখন টের পাইত শাশুড়ি নিদ্রাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ই সে নিজেকে গুছাইয়া সেইসব কালরাত্রি অবসানের প্রতীক্ষায় থাকিত। বাহিরের অন্ধকার যেন কঠিন-কঠোর দেওয়ালের মতো ঘিরিয়া ছিল সব দিকে, কোনো মুক্তির পথ দেখিতে পাইত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় গেল জোনাক-জ্বলা রাত্রি নিশুতির উমের মধ্য হইতে শোনা ডাহুকের ডাক? সে যেন এখনও নিজেকে স্পষ্ট দেখিতে পায়, উঠানের একধারে চুলাশালের কাছে সে কখনও ধাঁধার মীমাংসায় অস্থির হইয়া আছে, কখনও বা কোনো সওদাগর অথবা কোনো রাজপুত্রের কাহিনি শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরাট উঠানের মধ্যখানে ধান-মলা চলিতেছে সারা রাত্রিভর, একধারে পুথির আসর লইয়া সমস্ত শৈশবের সঙ্গী সেই শিকদার একটা দোতারা গলায় ঝুলাইয়া গীতের পর গীত গাহিয়া বর্ণনা করিতেছে জগৎ-সংসারের কথা, মাঝে মাঝে খুব বিরক্তি ধরিয়াছে শিকদারকে সেইরকম ভাব-বিহ্বল দেখিয়া, তাহার মুখে ভারী ভারী তত্ত্বকথা শুনিয়া। কতবার ইচ্ছা হইয়াছে তাহাকে জোর করিয়া সেই সব আসর হইতে উঠাইয়া লইয়া যায় ঘরের কাছে একটা পেঁপে গাছের তলায় তাহার মিছামিছা সংসার খেলার আসরে, মিছামিছা রান্না খাওয়াইয়া সে কেবলই জানিতে চায় : পোলার বাপ, রান্না কেমন হইল?

সবই শিখাইয়া দিতে হইত শিকদারকে, মুখে সব কঠিন কঠিন ভাবসাবের কথাবার্তা বলিলেও সেই একটা সময়ে সে যেন বলিবার মতো কোনো কথাই খুঁজিয়া পাইত না, জোবেদা যতই শিখাইয়া দেয়, ততই সে ভুল করে দেখিয়া তাহার খুশি আরও উত্থিত হইয়া উঠিত। একদিন অবশ্য সন্দেহ হইয়াছিল সেই সব ভুলগুলি স্বাভাবিক, না তাহাকে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতে দেখিবার জন্যই সে ন্যাকা ন্যাকা ভালোমানুষের ভাব-সাব দেখাইতে শুরু করিয়াছিল? তাহা হইলে কেন সে জোবেদাকে পরের বাড়ি উঠাইয়া লইবার কালে বাধা দিতে দাঁড়াইল না?

কী করিত জোবেদা, নামিয়া পড়িত পয়সাবারদের পালকি হইতে? কোথায় যাইত শিকদারের হাত ধরিয়া? কেবল রাত্রির নয়, অসংখ্যরকম বাধা-নিষেধ আর নিয়ম-কানুনেরও অন্ধকার আছে চতুর্দিকে, জোবেদা যাহার কোনো দিনও কোনো কূল পায় নাই।

সেই শৈশব যে শিকদারের সঙ্গেই এমন একান্ত হইয়া আছে, তা কখনও মনে হয় নাই জোবেদার। পরের বাড়ি যাইয়া একদিন সমস্ত পরিচিত বিশ্বসংসারও এমন করিয়া মুছিয়া যাইবে জীবন হইতে, তা বিন্দুমাত্রও জানা থাকিলে সে বাস্তবিকই পালকি হইতে নামিয়া পড়িত, একে একে নববধূর সমস্ত বসন-ভূষণ ত্যাগ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিত : মা, মা গো, আমারে এমন করিয়া পর করিয়া দিও না। যে-কান্না বিবাহের কালেও জোবেদার চৌখে দেখা যায় নাই, এখন তাই সব সময়ের সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছিল।

অথচ, একদিন বিদ্রোহ সে-ও দেখাইল।

শাশুড়ি ভড়কাইয়া গেল, আসগরউল্লাও তাহার সেই মূর্তি হয়তো কল্পনাও করিতে পারে নাই। জোবেদা এমন কঠিন হইল যে কাহারও ইচ্ছার কাছে সে আর নিজেকে সমর্পণ করিতে চাহিল না। কোনো কথা-কাটাকাটি কিংবা বাদ-বিসম্বাদ নয়, একটা উপেক্ষা এবং 'না'-এর ব্যূহ নিজের চর্তুর্দিকে খাড়া করিয়া যেন যুদ্ধে নামিয়া গেল।

শাশুড়ি কাঁথা জড়াইয়া গোঙাইতে লাগিল, আসগরউল্লাহও অবাক। এইভাবে দিন যায়, মাস যায় একদিন শাশুড়ি-স্বামী অনেক পরামর্শের পর স্থির করিল তাহাকে হেদায়েতের জন্য কোথায় কোনো মুলুকে লইয়া যাইতে হইবে। জোবেদা কোনো আপত্তি উঠায় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই বাড়ি-বাড়িয়ালের বাহিরে কোনো অন্য কিছুর অস্তিত্ব তাহার কাছে আর স্পষ্ট ছিল না। সে মনে মনে ভাবিল হয়তো বা বাস্তবিকই একটা উদ্ধারের উপায় মিলিয়া যাইবে।

শাশুড়ি কেবলই শাসাইতেছিল কুলগুরু সেই পীর, তোর বাপে ও তার বাপেও তার কথা ঠেলতে পারে না।

জোবেদারও ইচ্ছা হইয়াছিল তাহাকে একবার মুখোমুখি দেখে, জানিয়া লইতে চায় সমস্ত গুনাহগারির উৎস, না মানুষেরই পক্ষে সমস্ত কিছু মানিয়া চলা ছাড়া অন্য উপায় নাই? এমন কোনো দোজখ বাস্তবিকই আছে কি যা তার এই সংসার হইতেও কঠোর? জোবেদা কঠোর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কঠিন তখনও হইতে পারে নাই। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে সে একটা উদ্ধরণের উপায় খুঁজিতেছিল।

সেই মুহূর্তে শিকদারের দেখা পাওয়া কল্পনারও অতীত বিষয়। জীর্ণশীর্ণ শরীর, বেশবাসও ততধিক ঔদার্যভরা; আবারও মনে হইল সে যেন এই জগৎ সংসারে থাকিয়াও নাই, কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে আবারও যেন কোনো সুদূর শৈশবকাল কথা কহিয়া উঠিল, জোবেদা কাঁপিয়া উঠিল।

মনে পড়িল, শৈশবকালে সে একবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, বাড়ির উঠানে এক গাজিকে দেখিয়া। মুখে তাহার খুনখারাপি মাখা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, আর হাতে অর্ধ-চন্দ্র আকারের হাতল দেওয়া লাঠি, বারান্দার সামনে দাঁড়াইয়া সে সুর করিয়া জানিতে চাহিয়াছিল :

AMARBOI.COM

আপনেরা সব ভদ্দরলোকের ছেইলা পেইলা,
ভদ্দরলোকের ঝি
গাজি আইছে উদ্ধারণের বিষয় লইয়া
তারে বিদায় দেবেন কী?

গাজির সেই চেহারার মধ্যে কোনো ভিক্ষাবৃত্তির চিহ্ন ছিল না, কী একটা অজ্ঞাত ভয়েই বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। শিকদারের আবির্ভাবেও তেমন কোনো আবেদন-নিবেদন নাই, অথচ একটা দাবি, একটা অনুচ্চারিত ভর্ৎসনা চতুর্দিকের আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া রহিল, জোবেদা কাঁপিয়া উঠিল, অধোবদন হইল।

সেই সময় শাশুড়ির অবিশ্রান্তভাবে বিলাপ করিয়া যাইতেছিল : যৈবন কেউর চিরকাল থাকে না, না থাকে আছইট। পুরুষ ছাড়া মাইয়া-মানষের কোনো গতি নাই। তারে হেলায় ফেলিয়া জীবন চলে না। কোনো দিন চলে নাই। কোনোদিন তাহার বিলাপ-প্রলাপের কোনো অর্থই করিতে পারি নাই জোবেদা। নৌকার পর্দার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া সে তাহার কাছে আসিয়া বসিল। হঠাৎ মনে হইল এই বৃদ্ধাও হয়তো বা তাহার মতোই অনেক কিছু সহ্য করিতে করিতে সমস্ত বিশ্ব-সংসারের প্রতি কেবলই মুখ খিঁচাইতেছে, আপন ইচ্ছামতো কোনো সাধ-পূরণের সাধ্য তাহারও হয় নাই; ভালোবাসা চাহিয়াছে, কিন্তু পায় নাই, তাই ক্ষমতা-প্রয়োগের মধ্য দিয়া ভালোবাসার দাবিটাকেই একমাত্র সত্য করিয়া তুলিবার জন্য সারাক্ষণ ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। একবার ইচ্ছা হইল সে তাহাকে আরও কঠোরভাবে বলে সময় আছে বলিয়াই সে এখনও বিদ্রোহ করিতে চায়, নৌকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইতে নামিয়া যাইতে চায় যেইদিকে চলে দুই চোখ, বেলা থাকিতে থাকিতে হয়তো সে পৌঁছাইয়া যাইতে পারিবে কোনো লক্ষ্যে, শুধুমাত্র বিলাপ-প্রলাপের কোনো ভবিতব্যকে সে কখনও মানিয়া লইতে পারিবে না। কিন্তু কোনো কথাই তাহার মুখে জোগাইল না, নৌকার ছই-এর বাহিরে কয়েকটা গাঙচিল কী কাদাখোঁচা পাখিকে বারংবার উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিতে-ফিরিতে দেখিয়া তাহারও মনে হইতে লাগিল, নিজ জীবন ধারণের জন্য তাহাকেও একটা উপায় বাছিয়া লইতে হইবে। ঘরের জননীকে বশ করিবার জন্য আসগরউল্লাকেও অন্যের শরণ লইবার জন্য ব্যস্ত দেখিয়া সে আরও কঠোর হইবার পণ করিল। শিকদারের চরিত্রে দৃঢ়তার অভাবের জন্য সে তাহার প্রতি বিমুখ হইয়াছে, কিন্তু নিজ জীবন লইয়াই বা সে কী করিতেছে?

এই বাঁধা পরান যে আর মানে না বারণ
অঙ্গের জ্বালা আর মানে না শাসন
শয়নে কণ্টক ফোটে জাগিলে ব্যাকুল
বধূঁরই পিরিতে হইয়াছি আকুল
শাওন মেঘের লাহান পরান উতলায়
মরিলাম বুঝি আমি যৈবন-জ্বালায়
আমি জল আনতে নদীর ঘাটে
তুমি পবন হইয়া ঢেউ দেও তাতে
কলসি দূরে ভাসিয়া যায়
কুলকন্যার লাজ রাখা যে দায়।

AMARBOI.COM

হোসেন ছবদারকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল বটে, কিন্তু নিজেও মুক্ত হইয়া চলিয়া আসিতে পারিল না। মৃতপ্রায় ছবদারকে লইয়া যখন সেইখানে গিয়া পৌঁছাইয়াছে তখন গভীর রাত্রি; পাড়ে উঠিয়া ডাকাডাকি করিয়া ঘরে উঠাইবার পর আরও অনেক দায়-দায়িত্ব দেখা গেল। যে-মানুষটা একইরকম জীবন যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিতেছে তাহাকে সে উপেক্ষাও করিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া সে যখন দেখিল, তাহার স্ত্রী-কন্যা এবং বালক পুত্রের পক্ষে এমন কোনো সাধ্য-সামর্থ্য ছিল না যাহার বলে ছবদারের তত্ত্বতালাফি করিতে পারে। কিন্তু কবিরাজ দেখাইয়াও কোনো লাভ হইল না; পথেই ছবদার আউলাইয়া গিয়াছিল, বাড়ি পৌঁছিবার দিন দুয়েকের মধ্যে সে একেবারেই চলিয়া গেল।

তেমন সংসার মানুষ যে কোন সুখে করে! কাফন-দাফনের ব্যয় দূরের কথা, ঘরে উপযুক্ত আহার্য পর্যন্তও নাই। সে বাহির হইত কেরায়া খাটিতে, স্ত্রী সামান্য কিছু জুটাইয়া আনিত জমি-জমা ওয়ালাদের বাড়িতে ধান ভানিয়া, না হয় অন্য কোনো কাজ করিয়া। মেয়ে মেহেরজানকে বিবাহ দিয়াছিল অনেক আশা করিয়া, কিন্তু পণের কড়ি জোগাইতে পারে নাই বলিয়া সেই মেয়ের সংসারও সুখের হয় নাই। নানারকম অত্যাচারের কবলে পড়িয়া সে একদিন অগত্যা বাপের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে, বরপক্ষও আর খবর লয় নাই, সে ও আর কিছুতেই সেইমুখী হইবে না স্থির ধরিয়া বাপের শণের কুঁড়াতেই রহিয়া গিয়াছে। বালক পুত্র জাফর এখনও তাহার কৈশোর অতিক্রম করে নাই। ছবদারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুতে সকলেই যেইভাবে ভাঙিয়া পড়িল, তাহার মধ্য হইতে নিজেকে সরাইয়া লইবার উদ্যোগ করিয়াও হোসেনের আর পা উঠিল না।

মৃতের সদ্গতি করিতে হয়, সুতরাং একটা অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা হইল। সেই সব বিষয় অথবা ঘটনা অজানা ছিল না হোসেনের কাছে, কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই অনুষ্ঠানের পরিচালক এক মৌলবি জানাজায় উপস্থিত সকলের দিকে ঘুরিয়া জানিতে চাহিল মৃতের প্রতি কাহারও কোনো দাবি দাওয়া আছে কিনা, সেইসময় হোসেনের কাছে সমস্ত জগৎ সংসারের উদাসীন ভাবটা যেন আরও প্রকট হইয়া ধরা পড়িল। কপর্দকহীন বৃদ্ধ ছবদারের মৃতদেহটা উঠানের উপর, তাহার সাধ্যমতো সংগ্রাম সে-ও করিয়াছে, তাহার পক্ষেও কি সব জগৎ-সংসারের প্রতি কোনো দাবি নাই? চোখে পড়িয়াছিল তাহার স্ত্রী এবং পুত্র কন্যাকে এখন কী উপায়ে তাহারা জীবন চালাইবে? তাহার স্ত্রীও ক্রমাগত কাঁদিয়া জানাইল, গ্রামে দুষ্ট লোকের অভাব নাই বলিয়া মেহেরজানের পক্ষেও কোনো শ্রমের কাজের সুযোগ নাই। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে মেহেরজানের দিকেও তাকাইয়াছিল। সে কিছুই বলে নাই, দুইটি গভীর চোখের দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া আড়ালে চলিয়া গিয়াছিল। পুত্র জাফর যেন তখনও সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই।

দিন কয়েক পরে হোসেন জাফরকে সঙ্গে করিয়া সেই বাড়িয়ালের পুকুরের ধারে বড়শি ফেলিয়া বসিয়াছিল। মনে যত না শিকারের চিন্তা, তাহার তুলনায় অনেক বেশি অন্য অন্য বিষয়। অনেক পুঁটি ট্যাংরা খোঁট দিতেছিল বড়শিতে, কিন্তু হোসেন বিচরণ করিতেছিল যেন অন্য কোন জগতে, কোনো বারই সে যথাসময়ে ছিপে টান দিতে পারিয়া উঠিতেছিল না। মনের হয়তো আমোদ পাইতেছিল, কিন্তু হোসেন বিরক্ত বোধ করিতে শুরু করিয়াছিল নিজের উপরেও, এক সময় কলসি-কাঁখে করিয়া মেহেরজানকেও সেই পুকুরের অন্য এক ঘাটের দিকে যাইতে দেখিয়া সে আরও অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। গাছ-গাছালির আড়ালে মাত্র মুহূর্তকালের জন্য দেখা গেলেও মনে হইল সে-ও আবার স্বাভাবিক সংসারকর্মে লিপ্ত হইতে চাহিতেছে। পুকুরের একদিকে কলাপাতা দিয়া ঘেরা তাল-তমালের গুঁড়ি দিয়া বাঁধা ঘাটের দিক হইতে কতকগুলি ছোটো ছোটো ঢেউ তাহাদের দিকেও বিস্তৃত হইয়া আসিল। বড়শির ফাতনার দিকে আঙুল তুলিয়া জাফর বলিল : মা-য় না বুজান-এ বোধ করি নাড়াইয়া দিল পানি, এখন মাছগুলান দুদ্দাড় করিয়া এইদিক-সেইদিক ছুট দিবে। দেখিয়েন এখন অনেকক্ষণ অবধি আর বড়শি খোঁটাইবে না!

হোসেন তাহাকে শান্ত করিতে চাহিল : আহা, অন্যেরও তো কামকার্য আছে! মনে কয় তোমার বুজানই ঘরের কোনো কাজে জোগান দিতে ঘাটে আসছে।

জাফর মেয়েদের ঘাটের দিকে একবার মুখ উঁচাইয়া বলিল : হ, বুজানই হইবে, দেখি তো ঢেউগুলান ছোটো ছোটো। বুজান যখন ঘাটে নামে তখন যেন পানিরে তক টের পাইতে দিতে চায় না। নাহ্‌, তেমন ভাবনার কারণ নাই। কেবল বুজান এখন ঘাটের এইদিক-সেইদিক কিছু না কিছু ছিটাইলে আমাগো আধারেরও কেউ তেমন হেলা-ফেলা করবে না।

কিন্তু হোসেন আবারও সময়মতো ছিটে টান দিতে ভুল করিয়া ফেলিল। জাফর বেশ একটু শোরগোল তুলিয়া তাহার হাত হইতে ছিপটা টানিয়া লইতে চাহিল : নাহ্‌, আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো মনে কয় আপনে বৈদেশি মানুষ বলিয়াই ওইসব মাছগুলান আপনারে কেবলই ফাটকি-ফুটকি দিতে শুরু করছে।

বড়শিটা আবারও ফেলিতে না ফেলিতেই মেয়েদের সেই ঘাটের দিক হইতে একটা আর্তস্বর ভাসিয়া আসিল; ডাক শুনিয়া জাফর তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেল। হোসেনও ছিপ সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কয়েক মুহূর্তপর মেয়েদের সেই ঘাটের দিক হইতে জাফরের আর্তকণ্ঠ শোনা গেল : ভাইজান, ভাইজান, শিগগির আসেন। আমার বুজানরে বুঝি সাপে খাইল!

হোসেন তাহার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া দেখিল ভরা-কলসি কাঁখে মেহেরজান ঘাটের পৈঠার উপর নিশ্চল, উপরের ঘাটে দুইটা গোক্ষুর সাপ ফণা উঁচাইয়া পরস্পরের সঙ্গে কোনো বীভৎস খেলায় মাতিয়াছে। একটা ফণা নামাইয়া সরিয়া যাইতে চায়, অন্যটা আবার ধাইয়া আসে। তাহাদের ফোঁস-ফোঁসানি যেন ক্রমাগত বাড়িয়া উঠিল, আর একটা অদ্ভুত গন্ধেও চারিদিক ভরিয়া গেল।

: ওই তেতুঁলতলায় এক খোঁড়লে থাকে, আমি আরও একদিন দেখছি।

হোসেন জাফরকে কাছে টানিয়া শান্ত করিতে চাহিল : ডরের কারণ নাই। তুমি কোঁচ-সড়কি হাতের কাছে যা পাও লইয়া আসো গিয়া। কোনো ডরের কারণ নাই।

বলিল বটে, কিন্তু হোসেন মেহেরজানকে তৎক্ষণাৎ আরও কিছু পরামর্শ দিতে পারিল না। সে এমন একটা স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল যে, সেইখান হইতে যে-কোনো দিকে পা বাড়াইলে হয়তো একটা না একটা সাপের গায়ের উপর গিয়া পড়িবে।

: ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া নীচের দিকে নামিয়া যায়েন। সাবধান, কোনো শব্দ না হয়। মনে কয় নিজেগো লইয়াই মত্ত আছে।

মেহেরজান একটু ভ্রুকুটি করিয়া তাহার উপর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া নিল। কাঁখে ভরা-কলসি, না নড়িয়া পিছনে পৈঠার দিকেও পা বাড়ানো শক্ত, তাহার উপর সারা অঙ্গে সিক্ত বসন লইয়া সে আরও জড়-সড়, মনে হইল হোসেনের উপস্থিতি সে যেন চাহিয়াও চায় নাই।

ইতিমধ্যে জাফর লইয়া আসিয়াছে দুই দুইটা কোঁচ-বর্শা, তাহার পিছনে মায়ের হাতেও লাঠি-খোঁটা। হোসেন জাফরকে সরাইয়া দিয়া মেহেরজানকে ত্রাণের উপায় খুঁজিতে লাগিল।

জাফরের মা অবস্থা দেখিয়া প্রথমে পাথর হইয়া পড়িলেও সাহস জোগাইতে ব্যস্ত হইল : থাউক, থাউক, গায়ে আঘাত না পাইলে ওরা কেউর ক্ষতি করে না। এখন বোধ করি হাউশের কাল, মনে কয় খেলতে খেলতেই তেতুঁল গাছের গোড়ায় নালার দিকে নামিয়া যাইবে।

: বিশ্বাস কী! ঘাটের দিকেও নামিয়া পড়িতে পারে! হোসেন শক্ত মুখে সেই বাধা উড়াইয়া দিতে চাহিল : এমন বিপদ চুপ করিয়া দেখন যায় না। জাফরের মা সাপ দুইটার আকৃতি, শক্তি এবং তর্জন-গর্জনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল : ওদের সঙ্গে বুঝিয়া ওঠাও সাধ্যে কুলাইবে না।

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই হোসেন দুইহাতের দুই কোঁচ-বর্শায় সাপ দুইটাকে মাটির উপর গাঁথিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু তাহাদের সমস্ত আক্রোশ একই সঙ্গে হোসেনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে ফুঁসিয়া উঠিল; সেইরকম বিদ্ধ অবস্থাতেই দেহের সমস্ত শক্তি লইয়া জড়াইয়া উঠিতে চাহিল অস্ত্রের হাতল; হোসেন ভয় পাইল, তবু টলিল না; দুই বাহু, সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সেই মুহূর্তে মেহেরজান তাহার মা-এর হাত হইতে লাঠি ছিনাইয়া ঝাঁপাইয়া না পড়িলে হয়ত নিদারুণ কোনো অঘটন ঘটিয়া যাইত। জাফরের মা হায় হায় করিতেছিল, কিশোর জাফরও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ইতিমধ্যে সাপ দুইটা যেন হোসেনকেও জড়াইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে, সেই অবস্থায় মেহেরজান আর নিশ্চল থাকিতে পারিল না। উপর্যুপরি কয়েকটা আঘাতেই সাপ দুইটা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। জাফরও আগাইয়া গিয়া তাহাদের যেন মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিতে চাহিল।

হোসেনের সারা দেহে তখন ঘাম ছুটিয়াছে; জাফরের মা কাঁপিতে কাঁপিতে একধারে বসিয়া পড়িয়াছে; মেহেরজানও তাড়াতাড়ি যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াই, আড়ালে চলিয়া গেল।

: বড়ো ফাঁড়া গেছে, বড়ো ফাঁড়া গেছে। আমার যেন আর উঠিয়া খাড়াইবারও শক্তি নাই।

হোসেনও হাঁপাইতেছি; সাপ দুইটার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া কেবল বলিল : এমন বিপদ ধারে-কাছে লইয়া বসত করাও কোনো সুবুদ্ধির কাজ হইত না।

কিছুকাল পরে হোসেন যখন ঘরের বারান্দায় বসিয়া নিজেকে গুছাইয়া লইবার বিষয়ে উদ্যোগ করিতেছে, সেইসময় কপাটের কাছে মেহেরজানের সাড়া পাওয়া গেল। একটু পরে জাফর ডাকিতে আসিল : আসেন ভাইজান, বুজানে কইছে গোসলে যাইতে, খাওনের সময় হইছে।

ছবদারের সংসারের বিধি-বিধানের সঙ্গে নিজেকে আরও জড়াইয়া লইবার কোনো ইচ্ছা ছিল না হোসেনের, কিন্তু জাফরের আহ্বান উপেক্ষাও করিতে পারিল না, বরঞ্চ সেই আহ্বানের আড়ালে মেহেরজানের প্রখর দৃষ্টি লক্ষ করিয়া সে বেশ কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল!

: আরে আসেন, আসেন! যে মাছগুলান ধরছিলাম, এখন তাই ভাজা হইতে আছে—

জাফর হোসেনকে একরকম টানিয়াই উঠাইল।

বাড়ির ধারে খালের উপর নৌকাটার দিকে চোখ পড়িতেই হোসেন যেন সচেতন হইয়া উঠিল; 'পাড়া'র বাঁধন পরীক্ষা করিয়া সে যেন আপনমনেই বলিল : হ, এখন আমারেও যাইতে হয়।

: কোথায়—জানিতে চাহিল জাফর; হঠাৎ তাহাকেও কেমন অসহায় দেখাইল। হোসেন এক মুহূর্ত তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া খালে নামিয়া গেল : আসো জাফর, তবে যেন স্রোতের দিকে যাইও না।

কিন্তু জাফর যেন হোসেনের নৈকট্যের অভয় লইয়াই কখনও ঝাঁপাঝাঁপি, কখনও ডুব সাঁতার, আবারও কখনও চিৎ হইয়া ভাসিয়া থাকিয়া তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দিতে চাহিল।

: সাবাশ, সাবাশ! শিখলা কেমন করিয়া এত সব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর নাক মুছিয়া বলিল : বাজানে শিখাইছে!—পরক্ষণেই আবারও ডুব দিয়া ভাসিয়া উঠিল আরেকধারে উলাস তুলিয়া, যেমন করে গাঙের শুশুক : কিন্তু পুকুরে আমি আরও ভালো পারি। এইখানে কোনটাকে যে কোনদিকে ভাসিয়া যাইতে হয় সেই ডর লাগে।

: বুঝছি, বুঝছি খুব বাহাদুর তুমি। ডুব দিয়া দুই চৌখ রাঙা করিয়া ফেলাইছ, এইবার উঠতে হয়।

সেইসময় আবারও তাহার নিজের পথে মন দিবার কথা মনে হইল হোসেনের। আহারে বসিয়াও সেই কথাটা ঘুরিয়া-ফিরিয়া মনে আসিতে লাগিল, জাফরও পাশে বসিয়া কী বলিয়া যাইতেছিল সেইদিকেও তাহার বিশেষ খেয়াল ছিল না। আহার বাড়াইয়া দিতে ছিল জাফরের মা, আড়ালে মেহেরজান। ভাই-এর বেশবাস এবং ভাবভঙ্গি দেখিয়া মেহেরজান হাসিয়া ফেলিল : আহা, কী বাহার! যা ছিরি, ঘর নাই তবু দুয়ার দিয়া শোয়!

জাফর 'আলপাশ' করা চুলের উপর হাত ছোঁওয়াইয়া হোসেনের দিকে ইঙ্গিত করিল : ভাইজানেই আঁচড়াইয়া দিল। আর ভালোও পারে, না? মেহেরজান তাহার মা-র আড়াল হইতে একটু মুখ কুঁচকাইল, হয়তো বা অস্ফুটস্বরে কিছু বলিয়াও থাকিবে, 'যা ছিরি!' অথবা ওই ধরনের কিছু; কিন্তু জাফর আর সেই সব গ্রাহ্যে না লইয়া বড়শিতে ধরা মাছগুলির ভাগাভাগিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, নির্দিষ্ট করিয়া দিতে লাগিল কোনটা কাহার, বড়ো-সড় একটা সে নিজেই হোসেনের পাতে তুলিয়া দিল। মেহেরজান তাহার ভাব ভঙ্গি লক্ষ করিয়া তাহার মা-এর কাছেই মন্তব্য করিল। আর বাদ বাকি সবগুলানই ওনার বেবাক!

হোসেনও সেইসব খেয়াল করিয়া মুখ তুলিল : আর সেই বড়ো পাবদাটা, সেটা দেখিয়া তুমি এত হৈ চৈ উঠাইছিল, সেইটাও তোমার।

: কই, সেই বড়ো পাবদাটা তো দেখি না।—জাফর সমস্ত মাছগুলি উলটাইয়া পালটাইয়াও তাহার কোনো সন্ধান পাইল না।

জাফরের মা-ও কোনো সদুত্তর দিতে পারিল না, পিছনে মেয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া সে একটু হাসিয়া সে বিষয়ে আর কথা বাড়াইল না।

জাফর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল : আছি বুঝছি। এবার সেইটা বিড়ালে খাইছে।

: হইছে, হইছে।—জাফরের মা তাড়া দিল : খালে আরও বড়ো বড়ো অনেক পাওয়া যায় ভাঁটার কালে। এক সময় আবারও বড়শি লইয়া বসলেই হইবে। তুই যা দেখি মেহের একটা পাখা লইয়া আয়। দুইজনেই যেন ঘামে আবার নাইয়া ওঠছে।

হোসেন কাঁধের গামছায় মুখ মুছিয়া বলিল : এমন আমার সব সময়ই হয়।

: আমারও। মা-য় কইছে খাওনের কালে যার নাক মুখ এই রকম ঘামে সে খুব বউর আদর পায়।

জাফরকে আপন মনেই হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া জাফরের মা তাড়া লাগাইল : হইছে, হইছে, ভালো করিয়া কাঁটা বাছিয়া খাওয়া শেষ কর তো তুই, এমনিতেই অসময় হইয়া গেছে।

মেহেরজান ধীরপদে একটা পুরাতন তালপাখা হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মা-এর হাতে দিতে চাহিল না; ফিসফিস করিয়া বলিল : নতুন যেটা বানাইছেলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক তালাশ করিয়াও আর পাইলাম না। মনে কয় সেই জানাজার দিনই কেউ বেখেয়ালে উঠাইয়া লইয়া গেছে। এইটা দিয়া বাতাসের কাম নাই।

সেইসব কথাবার্তার দিকে নয়, তাহার হাতের চুড়িগুলির শব্দেই হোসেন একবার তাহার দিকেই নিবদ্ধ ছিল হয়তো, কিন্তু, তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে সরাইয়া লইল।

: অবস্থা তো জানোই। ভালো কিছু ধরিয়া দিতে পারলাম না তোমার সামনে, বাজান। একটা ঝাঁকি জাল লইয়া খালে ক্ষেপ দিলে অনেক মাছই পাওন যাইবে।

: অনেক খাইলাম চাচি। তবে এইবার আমারেও উঠতে হয়। হ, যাইতেও হয়।

জাফর মাঝে পড়িয়া বলিল : ওই শোনো, ভাইজান সেই কখন থেকিয়া বারংবার একই কথা কইতে আছে। না, যাইতে দিমু না!

জাফরের মা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, তারপর পিছনে মেয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল : আয়, এইবার তুইও কিছু মুখে দিবি। এই জাফর তুইও বুজানরে কিছু সাহায্য কর। আমার কোমরের ব্যথা লইয়া তেমন আর উঠতে বসতে পারতে আছি না।—খানিক পরে সে আবারও হোসেনের দিকে মুখ ফিরাইল : কখন যাবা ঠিক করছ? পরের পোলা তুমি, আমাগো ধরিয়া রাখনেরই বা কি এমন সাধ্য আছে।

জাফর হাঁড়ি বাসন লইয়া রাঁধা-বাড়ার ঠাঁই-এর দিকে যাইতে যাইতে মেহেরজানকে ডাক দিল : আসো, আসো পুষি, পুষি!

মেহেরজান তাহাকে বাগে পাইয়া ছোটো একটা কিল বসাইয়া দিল তাহার পিঠে খবরদার, এই কথা আবারও উঠাইস না।

জাফর খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল : একশোবার উঠামু, তুমি আমার ছিরি লইয়া ভ্যাঙাইছিলা ক্যান?

: যদি কইস তা হইলে আমার মরা মুখ দেখবি।

মরামুখের প্রসঙ্গে জাফরের মুখের হাসি নিভিয়া গেল; মেহেরজানকে দুই হাতে জড়াইয়া সে ধীরে ধীরে বলিল : না, বুজান, না কখনও কেউরে কমু না। তুমি যে পাবদামাছ এমন ভালোবাসো তা তো আমিও কক্ষনো জানি নাই।

ভাইকে একটু আদর করিয়া মেহেরজান মাচার উপর হইতে লেবুর আচারের শিশি নামাইয়া আনিল, জাফর যেন কৃতার্থ হইয়া গেল।

সেই সময় জাফরের মা কাছে আসিয়া লক্ষ করিয়া আপশোশ উঠাইল : আহা, একটু আগে যদি মনে করতি। মনে কয় ওই পোলাটারও মুখে রুচত।

মেহেরজান বারান্দার দিকে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টি বুলাইয়া বলিল : ইচ্ছা হইলে তার যাওনের সময় তুমি শিশিটাই তার সঙ্গে দিয়া দিও।

জাফরের মা খাটালের একধারে বসিয়া পড়িল। খাবার পাত্র সামনে লইয়াও সে বহুক্ষণ অবধি বাইরের রৌদ্রজ্বলা উঠানের দিকে চাহিয়া রহিল।

মেহেরজান রাগ দেখাইল : এই মা, তুমি কিছু মুখে না দিলে আমিও কিন্তু এই উঠলাম।

জাফরের মা পাত্রের উপর মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিল : মনে কয়, যাওনের কাল আমারও হইছে, তেমন আর খিদা-তৃষ্ণাও যেন নাই!

: না খাওয়াটাই অভ্যাস হইয়া গেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ের কথাটা খেয়াল করিয়া জাফরের মা-র মুখেও একটা ছোটো হাসি ফুটিয়া উঠিল: হইবে। হ, তা-ও হইতে পারে। এখন বোধ করি কেবল উপাস দেওনই কপালের লিখন হইয়া রইছে।

হোসেন যাত্রার আয়োজনে মন দিয়াছিল।

খালপাড়ে বাঁধা নৌকাটার তদারকি শেষ করিয়া বাড়িয়ালের দিকে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় দুইজন দেহাতির সম্মুখে পড়িয়া গেল। তাহাদের একজনের হাতে ঝাঁকিজাল, অন্যজনের হাতে খালুই, মনে হইল, ছবদারের অন্তেষ্টির সময় তাহাদেরও দেখিয়াছিল। এই বাড়িয়ালের অল্প দূরেই তাহাদের বাড়ি, ডাক দিলে সাড়া পাওয়ার মতো কিন্তু হোসেন শুনিয়াছে, কোনো সাহায্যে অগ্রসর হইয়া আসে না।

: এই মিঞা।

একজনের হাঁক শুনিয়া হোসেন থামিয়া গেল : জ্বে?

: এখনও তক এইখানে?

তাহার তির্যক দৃষ্টি এবং প্রশ্নের কোনো যথাযোগ্য উত্তর দিতে পারিল না হোসেন, আমতা আমতা করিয়া বলিল : এগো এমন অবস্থায় ফেলাইয়া যাইতে পারলাম না। একটা ব্যবস্থা করন লাগে। কিন্তুক আমার সাধ্যই বা কী আছে!

সেই লোকটি মুখে একটা ঘাসের খণ্ড নাড়াচাড়া করিতেছিল, সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া হাসিতে চাহিল : আছে, মর্দ আছে। জোয়ান মানুষ, বিষয়াদি করেন নাই। মাইয়াডারে যথারীতি তালাক লওয়াইয়া হালাল করিয়া লইলেই হয়। দশজনেও আর কিছু কওনের সুযোগ পাইবে না।

AMARBOI.COM

হোসেন তাহাদের হা হা করিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে দেখিল। রওয়ানা হইয়া পড়িতে একরকম মনস্থির করিয়াছিল, লোক দুইটির ভাবভঙ্গি লক্ষ করিয়া সে যেন আবারও একটা দোটানার মধ্যে পড়িয়া গেল। ঘরে ফিরিয়া গিয়া সে বসিল পুকুরঘাটের একটা গাছের তলায়। তাহার কেবলই ভয় হইতে লাগিল সে সম্ভবত বাস্তবিকই অসঙ্গত কিছু করিয়া ফেলিতেছে। সে নিজেকে বুঝ-সমঝ দিয়া সরাইয়া লইয়া গেলেও সকলের বিশেষ করিয়া মেহেরজানের ভবিষ্যৎ কী হইবে ভাবিয়া তাহার উৎসাহও কমিয়া গেল। মেহেরজানের মতো কন্যা কোনো দুষ্ট লোকের লালসার দৃষ্টি হইতে রেহাই পাইবে না।

সেই সময় হঠাৎ সে মেহেরজানের উপস্থিতি টের পাইল কাছাকাছি। মুখ ঘুরাইয়া দেখে আহার শেষে একখিলি পান বানাইয়া তাহাকে দিবার জন্য জাফরকে তালাশ করিতেছে। হোসেনই উঠিয়া তাহার কাছে আগাইয়া গেল। মেহেরজান গায়ের আঁচল সংযত করিয়া দৃষ্টি নত করিল। মনে হইল, আহারান্তে সেও বুঝি পান খাইয়া থাকিবে, তা না হইলে মুখের ঠোঁট ওই রকম রাঙা হইতে পারে না। আরও মনে হইল, হয়তো বা অন্য কোনো কারণে তাহার মুখমণ্ডলও যেন আরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত শরীরে কোনো আশ্চর্য জড়তা পুঞ্জিভূত হইয়া উঠিয়াছে।

: জাফরের হাতে পাঠাইয়া দিতে চাইছিলাম, তারে কোথাও দেখি না।

তাহার ঈষৎ বাড়াইয়া ধরা পানের খিলিটা হাতে লইতেও ভয় করিতে লাগিল, হোসেনের মাথার মধ্যে বুকের মধ্যে যেন সমস্ত কিছুই গোলমাল হইয়া যাইতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিল। তাহার অকস্মাৎ আশ্লেষে মেহেরজান থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; তারপর জোর করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে ঘরের পথে ছুটিয়া গেল। হয়তো বা অস্ফুটস্বরে কিছু বলিয়া থাকিবে, হোসেন বুঝিতে পারিল না। নিজেকে সামলাইয়া লইতে তাহার বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগিল, তারপর নত মস্তকে ধিক্কার-ভরা অন্তরে সে বহুক্ষণ যাবৎ সেই পুকুর পাড়ে বসিয়া রহিল।

পঙ্খী কখন যেন উড়িয়া যায়।
বুঝি বদ হাওয়া লাগিয়াছে খাঁচায়
খাঁচার আড়া পড়ছে ধ্বসিয়া
পঙ্খি দাঁড়ায় কেমন করিয়া
এই ভাবনা করছি বসিয়া
চমক-জ্বর লাগছে এ গায়।

ভাবিয়া অন্ত নাহি দেখি
কার বা খাঁচা কেই বা পঙ্খি
আমারই পিঞ্জিরায় থাকি
আমারে মজাইতে চায়।

আগে যদি যাইত জানা
জংলা যে সে পোষ মানে না
তবে তার প্রেম করতাম না
লালন ফকির কাঁদিয়া কয়।

AMARBOI.COM

লতিফের আসর এক সময় ভাঙিয়া গেলেও শিকদার আর ঘুমাইতে পারে নাই। লতিফের তরফে যত্ন আত্তিকের কোনো ত্রুটি ছিল না। মাঝে মাঝে দোকানে একলা পড়িয়া থাকে, স্টিমারের সময় ছাড়া খরিদ্দার-গ্রাহকদের কোনো তেমন ভিড় হয় না। সে তখন একটা অন্যরকম পেশায় নামিয়া ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। শিকদারের মতো মানুষ পাইয়া সে বাস্তবিকই খুব খুশি হইয়াছিল। আসরে নানাজনের সমাবেশে সে আরও গর্ববোধ করিয়াছে। ঘাট-মাস্টারের সঙ্গে আরও কিছু ঘনিষ্ঠতা হইল শিকদারের। সে কেবল গীত-গানের সমঝদারই নয়, মনে হইল তাহার জীবনেও গভীর কোনো দুঃখ আছে, কিন্তু সে যেমন আপনা হইতেই কিছু বলিল না শিকদারও তেমনই সম্ভ্রম দেখাইয়া কোনো প্রশ্নও করিল না। সে আসর শেষ হইবার আগেই নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার কথাগুলি বারংবারই নানাভাবে ঘুরিয়া-ফিরিয়া মনে আসিতে লাগিল। সমস্ত জগৎ সংসারের দুঃখের বাস্তবিকই কোনো অবধি আছে? পিতামহ করমালীও তো দুঃখ ব্যতীত জীবনে অন্য কিছু দেখে নাই, যে-আনন্দের সন্ধান সে পাইয়াছিল তাহা একান্ত তাহার আত্মগত, হয়তো তাহাও কেবল একটা উত্তরণের চেষ্টার মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘাট-মাস্টারের কথা গুরু-কবিয়ালের মতো শোনাইয়াও শোনাইল না, সে যেন অন্য একটা ইঙ্গিত দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি রাত্রির মধ্যে শিকদারের অনেক দিনের পুষিয়া-চলা ভাবনাগুলি যেন আর একইরকম মনে হইল না। একে একে এক একটি মানুষ, এক একটি ঘটনা পর্যালোচনা করিতে করিতে তাহারও বিশ্বাস হইতে শুরু করিল দুঃখও মানুষেরই সৃষ্টি, হয় দুর্বুদ্ধি না হয় শয়তানিই তাহার আসল স্রষ্টা। একটা লোভী দস্যুর মতো শয়তানই মানুষের জীবনকে মারিয়া-কাটিয়া পুড়াইয়া দিবার অধীর উল্লাস খুঁজিয়া বেড়াইতেছে সবখানে। তাহার স্বরূপ চিনাইয়া সাবধান করিয়া দিতে পারিলে অনেক দুঃখেরই তো অবসান হইতে পারে, সে যদিও ভাবিয়া পাইল না কী সে করিবে, কিন্তু সংকল্প করিল আর কখনওই সে দুঃখের গীত গাহিবে না, দুঃখ হইতে মুক্তির পথই তাহাকে খুঁজিয়া লইতে হইবে। কিন্তু কীভাবে, সারা রাত্রি ভাবিয়াও শিকদার কোনো মীমাংসা পাইল না।

সকালে, বাড়ি রওনা হইবার আগে, সে ঘাট-মাস্টারের কাছে বিদায় লইতে গেল। সকালের স্টিমার আসিতে তখনও অনেক দেরি। গাঙের উপর পাল উড়াইয়া চলিয়াছে মহাজনি নৌকার বহর, একটা মালটানা জাহাজও গাঙের মাঝ বরাবর চলিয়াছে কোনো সদর-বন্দরে। ঘাট-মাস্টার পলটুনের একধারের মাল-পত্রের হিসাবে ব্যস্ত ছিল। মালটানা জাহাজের সারেং-এর সিটি শুনিয়া সে-ও হাত নাড়াইয়া অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিল; শিকদারকে দেখিয়া খাতাপত্র অন্য একজনকে বুঝাইয়া দিয়া কাছে আসিল।

: কী কবি, সকালের খাওয়া হইছে? চলো, কিছু মুখে দেওন যাউক, লতিফও তা হইলে উঠিয়া পড়ছে।

শিকদার একটু আপত্তি উঠাইল : না না, সে চা-বিস্কুট দিছে। আমার চা-এর অভ্যাস নাই।

ঘাট-মাস্টার তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া সঙ্গে টানিল : আরে, লতিয়ের সঙ্গে আমার অন্য বন্দোবস্ত আছে। আসো, মনের মতো দুইটা কিছু মুখে দিয়া লও, তারপর ধীরে-সুস্থে ফূর্তি করিয়া বাড়ির পথ ধরবা।

লতিফ হাসিতে লাগিল : এইখানে ঘর-পরিবার নাই তো ঘাট-মাস্টারের। আমার সঙ্গেই খাওয়ার বন্দোবস্ত। যখন কামে থাকে আমিই গিয়া তার টিকেট ঘরে দিয়া আসি, না হয় আমার সঙ্গেই বাসন টানিয়া বসিয়া যায়।

মাটির বাসনে আউশ-চাউলের পান্তাভাত, কোরা নারকেলের শাঁস, আর এক গুচ্ছের পোড়া মরিচ।

ঘাট-মাস্টার শিকদারকে একটু অবাক থাকিতে দেখিয়া হাসিতে চাহিল : চা-বিস্কুটে আমারও তৃপ্তি হয় না। তবে অত মরিচ খাইতে পারি না আমি লতিফের মতো। ধারে কাছের গ্রাম থেকিয়া জোগাড় করা খেজুরের গুঁড় মিশাইয়া লইলে আরও মজা। একবার খাইয়া দেখো।

সে খাদ্য অপরিচিত ছিল না শিকদারের কাছে; হোসেনের সঙ্গে খাইয়াছে বহুবার শৈশব-দিনে কিংবা আত্মীয়-বাড়িতেও তাহার দেখা পাইয়াছে কতবার, জোবেদাও একবার পরামর্শ দিয়াছিল আরও কী অনুপান মিশাইতে সেই সঙ্গে, কিন্তু অবাক বোধ করিল ঘাট-মাস্টারের মতো শিক্ষিত মানুষ কী করিয়া এখনও তাহার প্রতি এমন আসক্ত থাকিতে পারিতেছে। ঘাট-মাস্টারের পরিতৃপ্তি লক্ষ করিয়া তাহার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লতিফ মুখের ঝালের উ-আ করিয়া হাসিতে লাগিল : বুঝছেন বয়াতি ভাই, উনি সব ফালাইয়া এই রকম খাইয়া অমৃত, অমৃত করেন। গঞ্জে কি খাতিরের অভাব! কিন্তু এইসব ছাড়িয়া অন্য কিছু ওনার আর মুখে রোচে না।

ঘাট-মাস্টার খাওয়া শেষ করিয়া শিকদারের দিকে চাহিল : কেবল খাওয়ার প্রশ্ন না করি। কেবলই তো দেখি মানুষ আপন জিনিস ফেলিয়া পায়ের কাদার মতো ধুইয়া মুছিয়া অন্য কিছু হইয়া যাইতে আছে। এই রকম একটা বাসন সামনে পাইয়া আমি অনেক স্থিত হইয়া যাই। আমার মা-এর কথা মনে পড়ে। মনে কয় সে-ও ধারে কাছে কোনোখানে আছে; ভাই-বেরাদর আত্মীয়-স্বজনও দূরে নাই, আর কোনো রকম দুঃখ বিলাসেরও সুযোগ থাকে না, অনেক দুঃখ উড়িয়া যায়, উবিয়া যায়, একলা থাকনের কোনো কষ্টই টের পাই না।

: তবে অন্য অন্য ভালো-মন্দের ব্যবস্থাও হয় বইকী মাঝে মাঝে। লতিফ তবুও একটু সাফাই দিতে চাহিল : গাঙে মাছের অভাব? জালিয়া পাড়া আছে একদিকে, হাঁস মুরগির ব্যাপারীরাও লইয়া আসে এটা-সেটা, ফল-ফলারি সবজি, কোনোটারই অভাব নাই। ঘাট মাস্টারের কল্যাণে আমারও আর কোনো রকম খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট নাই।

ঘাট-মাস্টার কাজের তাড়ায় আর সময়ক্ষেপ করিতে চাহিল না : আমার নানান রকম উদ্বেগ আছে কবি। আমার এখন উঠতেই হয়। কথা রইল, আবার যখন এইদিকে আসবা, আমারে অবশ্যই খবর দিও।

শিকদারও বাড়ির দিকে রওনা হইতে মনস্থির করিয়াছিল, এমন সময় দেশের প্রধান বড়োমিঞার বাড়ির পেয়াদা মনসব সর্দারের মুখোমুখি পড়িয়া গেল। অনাবশ্যক রকম ঠা ঠা হাসিয়া সে শিকদারকে আবারও সেই চায়ের দোকানে বসাইল।

: এইটা কি ঠিক দেখতে আছি? যার ঘর ছাড়া বাহির নাই, তারে এই ঠাটা-পড়া রোদের মধ্যে দেখিয়াও বিশ্বাস হইতে আছিল না। বড়োমিঞারে সদরের দিকে যাত্রা করাইয়া দিতে আসছিলাম, সদরে কাম, কী এক মামলা-মোকদ্দমার তারিখ লইতে হইবে। এত্তো বড়ো এস্টাটের কামে কার্যে তো আর তেমন সহজ কিছু না। তিনি বসছেন কী-এক আপনা কথাবার্তার মজলিশে। এই সুযোগে একটু এইদিক-সেইদিকে চোখ বুলাইতেছিলাম। ইচ্ছা আছিল দেখি একবার ওই জালিয়াবাড়ির দিকে, তাগো তামাকের খুশবাই আর পাথরের লাহান মাইয়া-ছেইলাগো আদর-আস্তিক-এর কক্ষনো কোনো তুলনা পাই নাই। প্রথমে তো মনে কইল, নাহ্, আমার চৌখেরই আর বিশ্বাস নাই। আসো, আসো এক বাটি চা হউক।

—শিকদারের ওজর আপত্তির দিকে কোনো গ্রাহ্য না করিয়া মনসব সর্দার লতিফকে হাঁক দিল : ও মনে, খানকতক বিস্কুটও চাই। দুই এক বাণ্ডিল মোহিনী বিড়িও চলুক। নাকি ওই বগামার্কা সিগারেটই হউক কবি, এ?

শিকদার সসঙ্কোচে বলিল : আমার কোনোটারই অভ্যাস নাই।

: এইটাই তো হইছে তোমারে লইয়া জ্বালা, এমন গুণী মানুষ তুমি, কিন্তু আস্তিক করনের উপায় খুঁজিয়া পাই না। সৃষ্টিকর্তায় যে ইন্দ্রিয়গুলান দিছে তাগো এমন উপবাসে রাখনের ঝোঁকটা কেউই বুঝিয়া উঠতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার প্রসঙ্গ এড়াইতে চাহিল। সেই চা-এর দোকানে তখন আরও কিছু লোকজন বসিয়াছে, কেউ যাত্রী-চড়নদার, কেউবা গঞ্জে বাঁধা কেরায়া কিংবা মহাজনি নৌকার মাঝি মাল্লা একধারে এক ভদ্রলোক, সম্ভবত সদর শহরে কোনো দফতরের চাকরিজীবী, সবে সম্মুখে আনিয়া রাখা সিগারেট মুখে তুলিয়া জ্বালাইতে শুরু করিয়াছে, এমন সময় কয়েকজন নিষ্কর্মা গ্রামীণ তাহার কাছে গিয়া বসিল। পরিচয় নাই, তবু একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল : আপনে কোমনে যাইবেন?

ভদ্রলোক নাকে-মুখে ধোঁয়া ছাড়িয়া গম্ভীরভাবে তাহাদের এক নজর দেখিয়া লইল, একটা কিছু ইঙ্গিত করিতে চাহিল, কিন্তু অধিক আলাপের উৎসাহ দেখাইল না।

সেই গ্রামীণ তাহার সিগারেট খাওয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিতে দেখিতে মনসবের দিকে ঘুরিয়া বলিল : যে যাই কউক, ছিকারেট ধক কম, বাসটা ভালো।

মনসব সর্দারও সতৃষ্ণ নয়নে তাহার সিগারেট খাওয়ার মুখ লক্ষ করিতেছিল; গ্রামীণ লোকটির সঙ্গে তাহার কোনো পূর্ব-পরিচয় না থাকিলেও মাথা দুলাইয়া সায় দিল; তারপর সরাসরি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল : আপনার ঠিকানা?

ভদ্রলোক আড়চোখে তাহাকে এক নজর দেখিয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল : সুবিদপুর।

: কোন বাড়ি?

: কোন বাড়ি চেনা আছে?

: কয়েন না দেখি। আমারেও বেশ বড়ো-সড়ো একটা এস্টাট চালাইতে হয়, আশেপাশের মুলুকগুলানের সঙ্গে একটু-আধটু চিনি পরিচয় আছে বইকী। আমার নাম মনসব। কামদেবপুরের বড়োমিঞার ডাইন হাত আমি।—মনসব সর্দার বেশ গরিমার সঙ্গে চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া আরও বলিল : এই সব মুলুকের এমন ধনী মানীরেও চিনি না জানলে বড়োমিঞার আমারে চাকরি থেকিয়া খেদাইয়া দিবে।

: আমাদের বাড়ি হাজি-বাড়ি বলিয়া পরিচিত। চেনেন সেই বাড়ি?

মনসব সর্দার একটু কাল অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর অকস্মাৎ সম্মুখের টেবিলের উপরে হাত চাপড়াইয়া বলিল : চিনুম না আবার! অবশ্যই চিনি। দুনিয়াজোড়া কত নাম-ডাক তাগো। তাগো বংশের কতজন এই শহরে সেই শহরের তাবড় তাবড় চাকরিবাকরি করে। আপনে?

: আমিও সেই বংশের, সরকারি আপিসে লোয়ার ডিভিশনে আছি।

: অ, তাই কয়েন আমার চেহারা দেখিয়াই বোঝান উচিত আছিল।—মনসব সর্দার অন্তরঙ্গ আলাপে ছেদ টানিয়া ভদ্রলোকের হাতের সিগারেটটার দিকে ইঙ্গিত করিল : আমারে দেবেন একটান—তারপর অসঙ্কোচে আবারও পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া গেল : মনে কয়, সরকারি চাকরির সঙ্গে কোনো পেশারই তুলনা হয় না।

সেই সময় লতিফ সেই গ্রামীণদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল : আরও কিছু চাই?

গ্রামীণ দুইজন একটু অপ্রতিভভাবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া মাথা দোলাইল, নাহ্, তাহাদের তেমন কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই।

: তবে দুইজনে যে দুইটা সিগারেট নিলেন, তার দামটা দেন, আমার হিসাব মিলাইয়া রাখতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: দিতাছি, বাপু, দিতাছি, পলাইয়া তো যাইতে আছি না।—গ্রামীণদের একজন কোমরে বাঁধা খুঁতির মধ্য হইতে কয়েকটা পয়সা লতিফের সামনে তুলিয়া দিল।

কেবল সেই সময়ই শিকদারেরও চোখে পড়িল তাহাদের পকেটে দুইটা সাধারণ সিগারেট সম্ভবত শরীরের ঘামে একবারে দুমড়াইয়া রহিয়াছে। হাজি-বাড়ির সেই ভদ্রলোক তাহার সিগারেটটায় আরও গোটাকতক টান দিয়া মনসব সর্দারের দিকে বাড়াইয়া দিল। গ্রামীণ দুইজনও সেই অপেক্ষায় হাত বাড়াইতেছিল, কিন্তু, মনসব সর্দারের ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাল রাখিতে না পারিয়া গুটাইয়া লইল। তবু তাহাদের একজন লোভী চক্ষু মেলিয়া বলিল : এই মর্দ, আমারেও দেবেন একটান।

মনসব সর্দার বেশ কয়েকটা ঘন ঘন টানে সিগারেটটা প্রায় শেষ করিয়া বাকিটুকু তাহাদের একজনের হাতে তুলিয়া দিল, মুঠির আঙুলের ফাঁকে সেইটুকু বসাইয়া লোকটি বেশ গরিমা ভরে চতুর্দিকটা দেখিয়া লইল।

অন্যজন তাড়া দিল : আহা, দেরি করতে আছ খামোকা, পুড়িয়া যাইতে আছে না, না হয় আমারেই দেও।

: সবুর।—সিগারেটধারী এক প্রবল টানে একমুখ ধোঁয়া গিলিয়া কাশিয়া কাশিয়া অস্থির হইয়া গেল। অন্যজন সিগারেটের সামান্য বাকি অংশটুকু তাহার হাত হইতে একরকম ছিনাইয়া লইল : হয়, হয় হইছে। তোমার কাম ছিকারাট খাওয়া! দেখো, দেখো চৌখ মেলিয়া এই সময়ে কী কায়দায় খাইতে হয়।

মনসব সর্দার অকস্মাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পড়িল : বড়োমিঞার নৌকা ঘাটে আসিয়া পড়ার সময় হইছে, আমারে সেইদিক দেখতে হয়। তুমি যাইও না কবি, একই সঙ্গে গাঁও গ্রামের মধ্য দিয়া দেশে ফেরন যাইবে। এখন খরার কাল, তরে তরে যাইতে, কওন তো যায় না, দুই একজন ঝি-বউও চৌখে পড়িয়া যাইতে পারে। তোমার এই বিরাগী জীবনের শেষ দেখলে আমারও খুশীর সীমা থাকবে না। আচ্ছা, হইবে, হইবে, যাইতে যাইতে সেইসব কথা হইবে।

ঘাটের দিকে কলরব বাড়িয়া উঠিতেছিল; কোথাও হইতে সদরগামী স্টিমার আসার কথা। গাঙের ওই ধারের ঝালকাঠির পাশের গাবখানের মধ্য হইতে হঠাৎ সেইটা ঝপ ঝপ করিয়া বিরাট দেহ লইয়া বিশাল গাঙের উপর ভাসিয়া আসে। যতবারই সেইদিকটা দেখিয়াছে শিকদার ঘন বন-জঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ে নাই। অথচ সেই সব স্টিমারের মধ্যের মানুষেরা যেন অন্য কোনো জগতের বাসিন্দা, তাহাদের কাছাকাছি হইলেও যেন একটা অদ্ভুত সুবাস আসিয়া নাকে লাগে, তাহাদের তেজ-বীর্যের উত্তাপে চতুর্দিকের ভিড়ও যেন পাতলা হইয়া পড়ে। লতিফও দেখিয়া আসিয়াছে সেইসব ঠাঁই, কিন্তু তাহারও মন বসে নাই।

: যার দেশে সেই রাজা। অন্যের গোলামি করিয়া পেট ভরে তো মন ভরে না।

শিকদার স্মিতমুখে তাহার বর্ণনা শুনিতেছিল, এমন সময় দ্রুতপদে ঘাট-মাস্টারকে আসিতে দেখা গেল : কবি কি চলিয়া গেল? আমি সমূহ কাজ ফেলাইয়া চলিয়া আসছি। এই নাও কবি—তোমার জন্য এইটা আনার ফরমায়েশ দিছিলাম, এখন আমারে দৌড়াইতে হয়। আবার যখন এইদিক আসবা, অনেক অনেক নতুন গান শুনতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুদৃশ্য একটা দোতারা হাতে পাইয়া শিকদার অভিভূত হইয়া পড়িল। লতিফও তাহার গড়ন-গঠন-বাহার লক্ষ করিয়া মন্তব্য করিল : এইটার কারিগর বড়ো গুণীদের যোগানদার। এই রকম যেন আর কক্ষনো দেখি নাই। ধরো বয়াতি ভাই, কিছু বোল উঠাও।

শিকদার কিছুক্ষণ দোতারাটির উপর হাত বুলাইয়া আবারও তাহাকে খোলসে ঢাকিয়া রাখিল। এক সময় লতিফকে জিজ্ঞাসা করিল : তোমরা কি ওনারে কক্ষনো গীত-গান করতে শুনছ?

লতিফ মাথা দোলাইয়া : না তো, সেই কথা কেন?

: আমার মনে কয়, এইটা ওনার নিজের, সখের সম্পত্তি। কেন যে আমার লাহান অভাজনরে দিয়া এমন ঋণী করিয়া ফেলাইলেন তা বুঝিয়া উঠতে পারতে আছি না।

সেই সময় ঘাটের দিকে ক্রমশ ভিড় বাড়িয়া উঠিতেছিল; রৌদ্রও আরও তীব্র হইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল চতুর্দিকে। শিকদার সব এড়াইয়া তাহার আপন-ঘরের বারান্দায় গিয়া বসিবার প্রেরণা অনুভব করিল। আরও খেয়াল করিল হোসেনের প্রতিও তাহার একটা কর্তব্য রহিয়াছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল : আমার দেশের দিকে রওয়ানা দিতে হয় ভাই। তুমি আমারে ওই প্যাকেট ভরিয়া গোটাকয়েক সিগারেট দেও। আর মনসব সর্দাররে বলিয়া দিও আমি ধীরে-সুস্থে আউগাইছি। ওই সেইদিকে বাবুগো বসতি, দিঘি-মন্দির, বট-শিমুলের সংখ্যা শুমার নাই, সেই পথ ধরিয়া বড়ো কাটাখালের শুরুতেই আমার দেখা পাইয়া যাইবে। মনে কিছু উদ্বেগ আছে বলিয়াই এমন রওয়ানা হইয়া গেলাম।

: বেশ, বেশ। আবারও যেন শিগগির শিগগির দেখা পাই।—কিন্তু লতিফ গোটাকয়েক সিগারেটের মূল্য কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাহিল না।

মাটি হন্তে ভেদ পায় শূন্য চলাচল
ছোটো বড়ো বঙ্গ যত মাটিতে সকল
নানা রঙ্গে কেলি কলা উপজে বিলাস
মৃত্তিকায় ভোগ পুনি মৃত্তিকা গবাস
কে বুঝিবে মাটি মর্ম পরম সংশয়
হাসি খেলি যত ইতি মাটিতে মিশয়
মাটি দেখি মাটি ভুলে মাটি মহামায়া
মাটি শূন্য, স্থিতি মাটি, মাটি যুক্ত কায়া।
মহামায়া মাটি যুক্ত হই যুবা জন
নারীর লাবণ্য রূপে মজিয়াছে মন
তুরুমূলে গ্রাসি যেন ভূমি রহিয়াছে
নারী মায়া পাশে তেন পুরুষ রহিছে।

—দৌলত কাজী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাটের দিক হইতে অভ্যন্তরের পথ অনেক রকম গাছগাছালির ছায়ায় ঘেরা। আশেপাশে বর্ধিষ্ণু বাবু-মহাশয়দের বাড়ি-ঘর। সঙ্গতিপন্ন জমিজমার খেত-খামার। বহু প্রাচীন বটগাছের মূলে-শিকড়ে জড়ানো নানারকম দেব-দেবীর মন্দির। এমনকী স্নানের পুকুরের পাড়ের কাছেও নানারকম কারুকার্য করা কাঠের স্তম্ভ। সব ছাড়াইয়া এক সময় একটা নিভৃত স্থানে গিয়া দাঁড়াইল শিকদার, তারপর চতুর্দিক দেখিয়া আস্তে আস্তে কোলের মধ্যেকার দোতারার আচ্ছাদনটি একটু একটু করিয়া সরাইয়া দেখিতে চাহিল। সে নিজেও বুঝিতে পারিতেছিল না কেন তাহার বক্ষস্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিতেছে। কেবলই মনে হইতে লাগিল সেই অবস্থায় কোথাও দেখা কোনো রমণীর সঙ্গে তাহার একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। খোলসটি সম্পূর্ণ খুলিয়া সে আরও ভালোভাবে দেখারও সাহস পাইল না; বারংবার মনে হইতে লাগিল সেই অবস্থায় মনসব সর্দার দেখিয়া ফেলিলে তাহার মুখে আর কিছুই আটকাইবে না।

একটু অস্থিরভাবে শিকদার আবারও পথে নামিল। গাঙের সঙ্গে মেশা একটা বড়ো খালের পাড়ে নজরে পড়িল একদল উলঙ্গ ছেলেমেয়ে, খালের স্রোতকে উপেক্ষা করিয়া ঝাঁপাঝাঁপিতে মত্ত। কানে আসিল মুখে কাটা ছড়া :

এই গাঙে কুমির নাই
ঝাপপুড় নাইয়া যাই।
গাঙে আছে লাঙ-এর কূল
উদলা গায়ে বাঁধছে চুল।
চ্যাঙা মাছেরাও উলাস দেয়
তিত পুঁটিরাও কুতকুতি দেয়—

AMARBOI.COM

শিকদারকে দাঁড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া তাহাদের হুড়াহুড়িটা যেন আরও বাড়িয়া উঠিল।

হায় হায় কোন বৈদেশি দেখিয়া যায়
মাইরের চোটে মারবে মায়—

অত সহজভাবে মুখে মুখে প্রায় তৎক্ষণাৎ তৈরি করা ছড়াগুলি বেশ মন দিয়া শুনিবার ইচ্ছা হইলেও শিকদার সরিয়া গেল। আবারও ঘাট-মাস্টারের কথাগুলি ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসিতে লাগিল মনে। কাব্য কী গীতকথা কী কখনও কোনো একক উপলব্ধি অথবা উচ্চারণ? স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই সব কথা ছন্দবদ্ধভাবে উৎসারিত হইয়া পড়ে। কষ্টকৃত গীত-কাব্যে সেইরকম প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যেন কখনওই সম্ভব হয় না, বাবুদের বাড়ির অনেক মূর্তির মতো তাহারা কেবল রূপ অথবা আচার-সর্বস্ব হইয়া পড়ে। শিকদারের আরও খেয়াল হইল হয়তো বা মুখে মুখে হৃদয়ে হৃদয়ে ঋক্কৃত হইয়া সমস্ত গীত-কথা গাঙের মতোই বহিয়া চলিয়াছে। গাঙের মতো তাহারও কোনো স্থির রূপ নাই, থাকিতে নাই। তাহারও উপর শৈশব-কৈশোর ত্যাগ করিয়া জীবনের সব সত্যের মুখোমুখি হইতে হইতে সমস্ত কাব্যকণা যেন খরা-রৌদ্রের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পথের দুই ধারে দৃষ্টি বুলাইয়া দেখে খেত-খামার, খাল-বিল, গৃহস্থ বাড়ি ঘর, নিত্যদিনের গাঁও-গ্রাম, দেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথার উপরের প্রখর সূর্যের রৌদ্র যতই সমস্ত কিছু যেন পুড়াইয়া দিতে চায়, ঝলসাইয়া দিতে চায়, ততই যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি মাটির এই পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে জাগিয়া উঠিয়া যখন-তখন যুদ্ধে লিপ্ত। ধূসর জংলি পাখিগুলির ঝগড়া-বিবাদের মতো তাহাদেরও সেই সর্বক্ষণের দ্বন্দ্বের কোনো মীমাংসা নাই; অস্তিত্ব নয়, যেন দ্বন্দ্বটাই সত্য হইয়া রহিয়াছে।

আবারও পিতামহ করমালীর কথা মনে পড়িয়া গেল। কেবলমাত্র তত্ত্বকথার পশার খুলিয়া বসিতেন বলিয়া লোক তাহাকে এড়াইয়া চলিত। দাদি মুখে আঁচল গুজিয়া লুটাইয়া পড়িতে পড়িতে বলিতেন : ওইটুকু শরীরে যাবৎ সংসারের চিন্তার ভারে আর খাড়া হইয়া চলতে পারতে আছে না। খবরদার, তোমারেও যেন কোনো কুক্ষণে সেই ব্যাধিতে পাইয়া না বসে। আমি তো কই, এই জগৎ সংসারে যার যতটুক হায়াত হাসিয়া-খেলিয়া কাটাইয়া দেওনেরই চেষ্টা করণ উচিত। কোনো তত্ত্ব মীমাংসার ভারে পড়লে আর কেউরই কোমর সোজা করিয়া খাঁড়া হওনেরও শক্তি থাকে না।

এমন সময় পিছন দিক হইতে মনসব সর্দারের হাঁক শোনা গেল : এই মর্দ, ওই কবি? আমি কি ইচ্ছা করলেই তোমার লাহান পাখনা মেলিয়া উড়াল দিতে পারি? এত্ত বড়ো এস্টাটের নানান কাম-কায্য সামলাই, স্টিমারটাও ছাড়তে দেরি করিয়া ফেলল।—মনসব সর্দার হন হন করিয়া কাছে আসিয়া আরও বলিল : পথে নামিয়া পা-ও উঠিয়া গেল ওই জালিয়াপাড়ার দিকে। মনে কইল, যাই দেখি যদি তেমন কোনো ভালোমন্দ কিছু পাওন যায়। বড়োমিঞার সব সংসারকে তুষ্ট রাখতে পারতে আছি বলিয়াই না এমন বড়ো এস্টাটটা এখনও ঠিকঠাক মতো চলতে আছে। বোঝই তো ওই জালিয়াগো রীতি-নীতি, একে তাগো নিজেগো তৈরি তামাকের টান তায় তাগো পাথরের লাহান মাইয়া-ছেইলাগো বানা নিয়াপানের খিলি। না কবিয়াল, এই সবের মর্ম তোমারে বুঝাইয়া কইতে পারি এমন সাধ্য নাই।

শিকদার সস্মিতমুখে তাহার দিকে লতিফের দোকান হইতে কেনা সিগারেট কয়টি বাড়াইয়া দিল।

মনসব সর্দার একটু অবাক হইয়া গেল, পরে খুশিতেও ভাসিয়া উঠিল তাহার মুখ : তুমি আবার এইসব খরচের মধ্যে কেন গেলা কবি। রাজ্য শুদ্ধ আমরা এতগুলান মানুষ তোমার জন্য কিছু করতে পারি না বলিয়া এমনিতেই আমাগো মনে আপশোশের শেষ নাই। শোনো কবি, একটা কথা তোমারে আবারও কইতে হইবে। তুমি গোস্বা করো আর যা-ই করো, আমার মনে কয় একটা মাইয়া মানুষের জন্য তোমার এই রকম বিরাগী হইয়া থাকন কোনো কামের কথা না। তুমি কও আমারে কোনখানে কোন মাইয়া মানুষটা তোমার মনে ধরে, আমি আজ রাত্তিরেই তারে মুরগির লাহান, হ, তারে চাপিয়া ধরিয়া তোমার খোপে আনিয়া দিমু। দেখো একবার একটা তরতাজা মাইয়াছেইলার সঙ্গে সংস্রব-সহবাস করিয়া। না, না, কোনো ঠাটা-পড়া রৌদুর না, কোনো নিশিরাইতের আন্ধারও না, তোমার চতুর্দিক পূর্ণিমার জোচ্ছনার লাহান মৌ মৌ করিয়া ভরিয়া যাইবে। যে পুরুষ মাইয়া মানুষের শরীর চেনে না, তাহার কোনো তত্ত্ব কথনেরও অধিকার হয় না, সংসার না জানলে জগৎ সংসারেরও বুঝিয়া ওঠন যায় না। একটু অবসর পাইয়া শিকদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিতে চাহিল : একটা মাইয়া মানুষের জন্যই যে আমি এমন ঘর-বিরাগী হইয়া আছি, সেই কথাটাই বা কে কইল?

: কেডা না কয়?—মনসব সর্দার হাত ছড়াইয়া ইঙ্গিত করিল চতুর্দিকে, সারা শরীর দুলাইয়া হাসিয়া বলিল : মাইয়াছেইলারা তক দুঃখ করে। লিখনপড়ন না হয় করি নাই, কিন্তু দিনে দিনে এইটুকু তো বুঝি যে যা রটে তার কিছু বটে। এই যে তুমি সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একেবারে এমন উদাস হইয়া গেলা, এর পশ্চাতে ওই রকম একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। আমারে এত্তো বড়ো এস্টাটের কাম-কায্য চালাইতে হয়, খবরাখবর রাখতে হয় সক্কলেরই। তার উপর তোমার লাহান গুণী মানুষের কথা তো লোকের মুখে মুখে। তোমার গীত-গান বন্ধ করিয়া কেবল তোমারই অভাব হয় নাই, আমাগোও আরও দশজনেরও অভাব বোধ হয়। কবি, তোমারে লইয়া আমরাও যে গর্ব করার সুখ চাই।

মনসব সর্দার অনর্গল আরও অনেক কিছু বলিয়া গেল। এক সময় দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে সুর করিয়া শুনাইয়াও দিল গঞ্জের কোনো বয়াতির কোনো গীতের দুই এক চরণ : আমি যেই দিকে চাই সেইদিকে সব তত্ত্বকথা কইবার চায়। আমি দেখি মাইয়া মানুষেরই মধ্যে সারা দুনিয়া দেখন যায়। শিকদার এক সময় না বলিয়া পারিল না : কবির দলে তো আমিও যোগ দিছিলাম সর্দা। এক জায়গার কথা আর-এক জায়গায় উগরাইয়া দিয়া, কেবল কথার উপর কথা সাজাইয়া ইনাম-আনামের ভাণ্ডারী হইতে আর মন চায় নাই। মানষে চায় রসের কথা, চায় আনন্দ-উৎসব, চায় তত্ত্বকথা, আমি যে কোনোই বিষয় খুঁজিয়া পাই না।

মনসব সর্দার হঠাৎ কোনো উত্তর দিল না। পথ চলিতে চলিতে এক সময় কেবল বলিল : এই জন্যই তো বলি, একটা বাধা পড়ছে সম্মুখে। তারে ভাঙন দরকার। এমন গুণী মানুষ তুমি, ভাঙো ওই বাঁধটা, দেখিও স্রোতের লাহান কলকলাইয়া উঠবে আবার তোমার গীত গান। এই মনসব সর্দার তার জন্য সব অসাধ্য সাধন করতেও রাজি আছে। শোনো কবি, আমার একটা প্রস্তাব। আগামী পূর্ণিমায় বড়োমিঞার বাড়িতে একটা পর্ব আছে, ছোটো পোলার মুখে ভাত। সেই উপলক্ষে বেশ উৎসব আয়োজন হইতে আছে, দেশ-বিদেশের অনেক অতিথি-মেহমান আসবে, জারী-সারির আসরের ব্যবস্থাও হইবে। আমি চাই তুমি সেই আসরে আসো। বড়োমিঞাও নিশ্চয় খুব খুশি হইবে। আরও দশজনের সামনে প্রমাণ হইয়া যাউক, গীত-গানেও আমাগো এই মুল্লুক ঠেলিয়া-ফেলিয়া দেওনের মতো না। তোমারে রাজি হইতেই হইবে, কথা দাও। শিকদার সসঙ্কোচে এড়াইয়া যাইতে চাহিল, নানারকম ওজর-আপত্তি উঠাইল, কারণ দর্শাইল : অনেক দিন আমার কোনো চর্চা নাই, নতুন কোনো কথা নাই, দেশ-বিদেশের মানুষের সামনে কোনো পুরাণ-গীতে আর আগ্রহও নাই।

: বাঁধো নতুন গীত। এখনও তো বেশ কিছুদিন সময় আছে। আমি চাই, আমরা দেশশুদ্ধা মানুষ সকলেই চাই, তুমি আবারও মাথা উঁচা করিয়া আবারও সব জগৎসভায় খাড়া হও।

শিকদার একসময় হাসিয়া ফেলিল : কোন দুঃখে যে এই গীত-গানের পথ ধরছিলাম।

মনসব সর্দার একটু অবাক হইয়া জানিতে চাহিল : কেন, সেই কথা কেন?

: এই যে, এই রকম বাধ্য-বাধকতার মুখোমুখি হইতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনসব সর্দার বেশ কিছুক্ষণ তাহাকে লক্ষ করিয়া মিটিমিটি হাসিল : আমার তো মনে কয় তোমারেও জোর করিয়া ধরিয়া ধরিয়া লইয়া যাওন ছাড়া উপায় নাই। আমিতো কই তাতে তোমারই ভালাই হইবে। আমি আসুম আবারও খবর লইতে, ইতিমধ্যে তুমি তৈয়ার হও। তা না হইলে যেখান থেকিয়া পারি একটা মাইয়া মানুষ তোমার ঘরে উঠাইয়া দিমু। তুমি দশের গৌরব, তোমার এইভাবে শেষ হইয়া যাওন আমরা দেখতে পারি না।

: বুঝছি, আমারে খেদাইয়া দিতে চায়েন!—শিকদার হাসিতে চাহিল।

মনসব সর্দার জিভ কাটিল : ছি, ছি, এত বড়ো এস্টাট চালাইতে গিয়া হাকামের সর্দারি করতে হয় ঠিকই, কিন্তু আমার কথাটার উলটা অর্থ করিও না। তোমারে এই মুল্লুকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরতে চাই। তুমি ভুল বুঝিও না। আবার আসমু এক সময়, তখন কথা হইবে।

মনসব সর্দার তাহার স্বভাবমতো হন হন করিয়া বাড়ির পথ ধরিল, কিন্তু কয়েক পা গিয়া আবার ফিরাইয়া দাঁড়াইল : কবি।

শিকদার দাঁড়াইয়া পড়িল।

মনসব সর্দার দাড়ির উপর হাত বুলাইয়া মিটিমিটি হাসিল : মনে কোনো ডর রাখিও না কবি। তোমার ঘরে জোর করিয়া কোনো মাইয়া-মানুষ তুলিয়া দেওনের ইচ্ছা আমার নাই। তবে একটা ভালো বউ জুটানোর বিষয়টা বাস্তবিকই আর হেলন-ফেলন করণ যায় না।

—হঠাৎ ঠা ঠা হাসিয়া হাত নাচাইয়া মনসব সর্দার চলিয়া গেল।

বাড়ি ফিরিয়া শিকদার বেশ কিছুক্ষণ আপন ভুবনের নানারকম ভাবনার মধ্যে তন্ময় হইয়া রহিল। ঘাট-মাস্টারের দেওয়া সেই দোতারাটি সে সন্তর্পণে একটু একটু করিয়া খুলিয়া দেখিল বটে, সসঙ্কোচে হাত বুলাইয়া তাহার সর্বাঙ্গে কিন্তু তাহার পুরানো দোতারাটি যেন অধিকতরভাবে তাহার মন কাড়িয়া লইতে লাগিল। দুইয়ের মধ্যে কোনো বিশেষ বৈষম্য নাই, একটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, অনেক বছর অনেক যুগের সঙ্গ-সাহচর্যে তাহার সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, মনে হয় হাত দিয়া ছোঁয়ামাত্র সজীব—সরব হইয়া উঠিবে, অন্যটির সঙ্গে তাহাকে এখনও অভ্যস্ত হইতে হইবে। একজন যেন বহুকালের প্রণয়িনী, আর অন্য জন কোনো নতুন যুবতী তরুণী, কবি-কথায় যাঁহাকে বলে এখনও যেন বিপুল যৌবন-বেদনা সর্বাঙ্গে দমিত রাখিয়া লাজে-শরমে কোনো বিশেষ পুরুষ-পরশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। বিষয়টা শিকদারের কাছে ভালো লাগিল বটে, কিন্তু কোনো উপযুক্ত পদ পংক্তিমালা সে কিছুতেই সাজাইয়া উঠিতে পারিল না। এক সময় খুঁজিয়া খুঁজিয়া সংগুপ্ত মাচানের উপর হইতে মোড়কে-বাঁধা-পুথি কাগজ, খাগরা কলম, গাছের কষ দিয়া তৈরি কালির বাটি লইয়া সে ওই বিষয়ের উপরেই কয়েকটি পংক্তি রচনার চেষ্টা করিল।

সারিন্দা বানাই সব কারিগর
তারে সুরে বাঁধতে জানি না
সুর-সাগরের সিনানের সাধ
সকল ভাগ্যে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যন্ত্র ধরি, মন্ত্র যে না পাই
আমার দুঃখ নিশি ঘোচে না।
যতেক গুরু কয় কাব্য কথা
পরান যে তার ভরে না।
কুসুম ছাড়িয়া খোলস যে খায়
তার পরান-ক্ষুধা মেটে না।

কয়েক পদ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াও শিকদারের মনে হইল, এখনও কেবল বিলাপ-উক্তিটাই তাহার প্রধান বক্তব্য হইয়া উঠিতেছে। কোথায় বাজিতেছে বিলাপের সুর, দুঃখের লোকগাথা, অভিযোগের বৃত্তান্ত, কবি তাহা অবশ্যই লক্ষ করিবে, কিন্তু সেই গীত আরও রংচং ভরাইয়া বর্ণনা করিবার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্যের দাবি সে করিতে পারে? এই সব দুঃখ-বিলাপের সমবেত সংকীর্তন, না দুঃখমুক্তির উজ্জীবনা? কোনটা তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত? আসল তত্ত্বের দিক হইতে অতি সহজে সকলকে আঁদি রসে টানিয়া লওয়া যায়, যেমন সে তাহার সুর-যন্ত্রকেও রমণী হিসাবে কল্পনা করিয়া রচনা করিতে পারে।

দীঘল দেহী যুবতী নাগরী
প্রতি অঙ্গে পৌরুষ যাচে
তব নয়ন-কণ্ঠ-কটির আহ্বানে
কী আকুল তরঙ্গ নাচে—

কিন্তু সেইসব পদ মনসব সর্দারও হয়তো বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। যন্ত্র থাকুক, স্বয়ং জীবনকেও যে-কোনো যুবতী রমণীর মতো কল্পনা করা যায়, সেই কথা উচ্চারণ করিলেও সকলে মিলিয়া তাহার কোনো রকম মস্তিষ্ক-বিকৃতিই সাব্যস্ত করিয়া বসিবে। কোনো কবির কি বাস্তবিকই জগৎসভায় কোনো নতুন বিষয় উপস্থাপন করিবার অধিকার আছে? পুরাতন কথাগুলি নতুন ছাঁচে ঢালিয়া ইনাম-আনাম সাধুবাদের পশরা লইয়া জীবন-সার্থকে ব্যস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আর হাট-বাজারের ব্যাধি-ব্যামো সারাইবার ওঝাদের সঙ্গেও সে কোনো পার্থক্য খুঁজিয়া পায় না। ভাষা ভিন্ন হইতে পারে কায়দা ভিন্ন হইতে পারে এমনকী তাহাদের ব্যক্তি অথবা শ্রেণিও ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মূল উদ্দেশ্য কী? শিকদার অন্যমনস্কভাবে তাহার পুথিপত্র বাঁধার নকশা করা মোড়কটির উপর হাত বুলাইতে লাগিল, পুরাতন শাড়ির পাড় জুড়িয়া ছুড়িয়া সেই মোড়কটি সেলাই করিয়া দিয়াছিল তাহার পিতামহী, উপরে কারুকার্য করা কাঠের মলাটটিও করমালীর উপহার, কবে কোন মুলুকের পুস্তকাগার না উপাসনাগার হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। মধ্যকার সমস্ত ভূর্জপত্র তাহার খুল্লতাতের স্বহস্তে তৈরি, গিরা দিয়া বাঁধনের রঙিন সূত্রটিও এক ভগিনীর উপহার, সেই খাগের কলম সে স্বয়ং তৈরি করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যেও অজস্রজনের স্মৃতি। তাহার বাল্যবন্ধু তালের ডোঙায় চড়াইয়া বিলের সেই অঞ্চলে লইয়া না গেলে কখনও সেই খাগ সংগ্রহও সম্ভব হইয়া উঠিত না। এই কালি, কবে কখন কোন দিনে কে এইভাবে গাছের বাকলা পুড়াইয়া তৈয়ার শিখাইয়াছে। এখন কলম হাতে লইয়া একটি অক্ষর খাড়িতে বসিয়াও শিকদার সেই সব কৃতজ্ঞতা এবং ঋণের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল। আবারও তাহার মনে হইল, গীত-গান কথা কোনো এককের কোনো খেয়াল-খুশির খেলা নয়, তাহার মধ্যে কেবলই সমস্ত মানুষের মন মানসিকতার রূপ-উপস্থাপন ঘটিয়া চলিয়াছে। মধ্যে কত পুরাণে কথা, পরান কথা এবং প্রাণের কথার স্মৃতি। ভাষাতেই কত বিচিত্র ব্যাপ্তি! কেউর আশা অর্থ-বিত্ত, কেউর লক্ষ্য যশোমান কিন্তু কাব্য বস্তু যতই পুরাতন ধারা বা রীতি-নীতির অনুসারী হউক, তাহাকে মানুষের দুঃখ মোচনের সঠিক প্রেরণার দিকে আকৃষ্ট করিতে না পারিলে তাহার আর কোনো অর্থ নাই। বড়োমিঞা তাহার গীত-গান শুনিয়া ইনাম-আনাম দিবে, জমি-জমা সমস্যারও সুরাহার পথ মিলিবে, কোনো যুবতী রমণীর সোহাগ-যত্নের অবকাশ ঘটিবে, এই সবই কি সে তাহার কিবয়াল জীবনের অভীষ্ট করিয়াছিল? পিতামহ করমালীও কি তাহাকে সেইদিকে পরিচালনা করিতে চলিয়াছিলেন?

জোবেদাও একবার ঠোঁট ফুলাইয়া বলিয়াছিল : কত বয়াতির কথা শুনি, ঘর-বাড়ি উঠাইছে, জমিজমা কিনছে, পানসি চড়িয়া দেশ-বিদেশে যাওয়া-আসা করে। এখন নাকি খোদ সদর মুলুকেও পাকা দালান উঠাইতে আছে রাজা-রাজ্যের সাহায্যে। তোমার যে কেন সেই সব দিকে হুঁশ নাই?

শিকদার সেই সময় গুছাইয়া কোনো উত্তর দিতে পারে নাই। যে রকম তাহার স্বভাব, হয়তো এখনও নিজের মনোভাব সহজ সরলভাবে বুঝাইয়া উঠিতে পারিবে না, না পারিবে হোসেন কিংবা মনসব সর্দারদের মতো কাহারো কাছে কোনো কৈফিয়ত দিতে। এক সময় সে নিজেকেই ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে চাহিল : দুনিয়ার এত কাজ থাকতে কেন যে এইসব দিকে এমন ঝুঁকিয়া পড়ছিলাম। অস্ফুটস্বরে নিজেই নিজেকে সেই কথাগুলি বলিতে চাহিল বটে, কিন্তু একই সঙ্গে আবার সোহাগের দোতারাটি কোলে তুলিয়া লইল।

তুমি তো সুন্দর কন্যা
মোরে দিছো মন
বাঁশির সুরে মনের কথা
কহিব এখন।

ছাড়িয়া দে কলসি আমার
যায় বেলা হে নাগর
ছাড়িয়া দে কলসি আমার
যায় যে বেলা।

কেমন তোমার মাতা-পিতা
কেমন তাদের হিয়া
তোমার মতো যুবা নারীর
কেন না দেয় বিয়া?

ভালো আমার মাতা-পিতা
ভালো তাদের হিয়া

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার মতো নাগর পাইলে
মোরে দিত বিয়া
এখন ছাড়িয়া দে কলসি আমার
যায় যে বেলা।

মেহেরজানের প্রতি সেই আসক্তি প্রকাশের পর বাকি দিনটা হোসেন কেবলই ছটফট করিতে লাগিল। একটা আত্মগ্লানি তাহাকে যেন আর কোনো স্বস্তি দিতেছিল না। সমস্ত বিকালটাই সে বাহিরের বাগানের এইদিকে সেইদিকে ঘুরিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। সন্ধ্যায় ছবদারের স্ত্রী আহারে ডাকিয়া পাঠাইল, কিন্তু কিছুই যেন আর মুখে রুচিতেছিল না। নতমুখে সামান্য কিছু নাড়াচাড়া করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ছবদারের স্ত্রী অবাক হইয়া অনেক কিছুই অনুমানের চেষ্টা করিল, কিন্তু হোসেন এড়াইয়া গেল।

একসময় বাড়ির হাতিনায় তাহার নির্দিষ্ট ঠাঁইটিতে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, সেই সময় জাফর আসিয়া বায়না ধরিল : কই, কোথায় আপনে ভাইজান? এমন অন্ধকার নামিয়া আসছে যে কোন্‌খানে যে কী আর কেডা টেরও পাওন যায় না। আপনার এইখানে নামিয়া আসতে আসতে বুজানের সঙ্গেও একটা ঠোক্কর খাইয়া আসলাম। বোধকরি একটা চড়-চাপড়ও দিয়া থাকবে, কিন্তু ভাগ্যিস, গায়ে পড়ে নাই। সেই কথা থাউক, আপনে এখন একটা নতুন কেচ্ছা শুরু করেন ভাইজান। খুব বড়ো একটা পরান কথা, এ?

হোসেনের আদপেই তেমন কোনো উৎসাহ ছিল না। এই কয়েক সন্ধ্যা আগেও এমনই এক সন্ধ্যায় তাহাকে 'রূপভান কন্যা'র কাহিনি শুনাইয়াছে, ঘরের কেঁওয়ারের ওই ধারে বসিয়া চাচি এবং মেহেরজানও শুনিয়াছে। নিজেও কি সে সব জানিত। অন্য অন্য মাঝিদের মুখে মুখে শুনিয়া সে মনের মতো করিয়া সাজাইয়াছে, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছে শিকদার, সে যতই রূপকথার কিংবা পরান-কথার চরিত্র বা ঘটনাগুলিকে অলীক অথবা অসম্ভব রকম মনোহরণ করিতে চাহিয়াছে, শিকদার ততই তাহাদের নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ঘটনার মধ্যে। তাহা ছাড়া, শিকদার কে জানে কোন্ কারণে সেইসব কলা-কথায় সাধারণত খুব একটা উৎসাহ প্রকাশ করিত না। কেমন করিয়া বারো দিনের রহিম বাদশাহর সঙ্গে বারো বছরের অপরূপা সুন্দরী রূপভান কন্যার বিবাহ হইল। অতিথি-অভ্যাগতরা অনেক কিছু ভালো-মন্দের সঙ্গে চা-টাও খাইলে সেই সব বর্ণনায় হোসেন মজা পায়, এমনকী জাফরেরও যেন বারংবার শুনিয়াও তৃপ্তি হয় না, কিন্তু শিকদার সেই সমস্ত কাহিনি-কথকতা অন্য একপ্রকার দৃষ্টি লইয়া যেন দূর হইতে দেখিতে চাহিত। বাস্তবিক বলিতে কী শিকদারের মনোভাবটা হোসেন কখনওই তেমন বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও হয়তো নিজের ধ্যান-ধারণা মতো কোনো একটা কাহিনি সে শুরু করিয়া দিত, কিন্তু উৎসাহ পাইল না। মনে হইতে লাগিল কোনো কলা-কথার সঙ্গে আসল জীবনের কোনো মিল নাই। মানুষ হয়তো চায় তেমন হউক কিন্তু হয় না।

জাফর তবুও কিছুক্ষণ সাধাসাধি করিয়া অবশেষে হাই তুলিয়া ক্ষুণ্নমনে ঘুমাইতে চলিয়া গেল। সমস্তক্ষণ মেহেরজানকেও আর কোথাও দেখা যায় নাই, অন্তত সম্মুখে আসে নাই। হোসেন তাহার উপস্থিতিও অনুভব করিতে শিখিয়াছিল। এমনকী নিত্যকালের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানটাও বাড়াইয়া দেয় নাই কপাটের আড়াল হইতে; মনে হইতে লাগিল সেও কোনো রকম নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। চাচির ডাকাডাকির সাড়া পাইয়া বুঝিতে পারিল সেও কোনো আহার স্পর্শ না করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। বাড়ির সমস্ত স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া-পরিবেশ যেন হোসেনই নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

এলোমেলো পায়ে বাড়ির দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে কী বলিয়াছিল মেহেরজান তা বহুরকম চেষ্টা করিয়াও সে আর আন্দাজও করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সেই রাত্রির অন্ধকার অগ্রাহ্য করিয়াও সে আবারও গেল দুপুর বেলার সেই পুকুরধারে। হঠাৎ কী যে কী হইয়া গেল। সে পুনর্বার সমস্ত ঘটনাটা পর্যালোচনা করিতে বসিল। অকস্মাৎ সমস্ত দেহমন যেন ধাইয়া গিয়াছিল মেহেরজানের দিকে, মনে হইয়াছিল তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজের সঙ্গে মিশাইতে পারিলে যেন বিশ্ব-ভুবনের সমস্ত আনন্দ-শান্তি তাহার জীবনে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, তাহার সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হইবে, সে গৃহী হইবে, স্বাভাবিক মানুষ হইবে। অথচ খেয়াল রাখিল না মেহেরজান কুমারী কন্যা নহে, অন্যের বধূ। হইয়াছে না হয় অতি শৈশবকালে বিবাহ, স্বামীর ঘরও সে করে নাই বড়ো হইয়া, কিন্তু সেই স্বামী এখনও বাঁচিয়া আছে, বিধিমতো সেই বিবাহ ভাঙা সম্ভব হয় নাই অর্থাভাবে। হোসেনের এমনকী সাধ্য আছে এই অবস্থা হইতে তাহাকে উদ্ধার করে? তাহার মা, সবার উপর সেও কি তাহার মতো বিদেশির সঙ্গে কোনো সম্পর্কের বিষয়ে সম্মত হইবে? মেহেরজানের যদি কিছুমাত্রও আগ্রহ থাকিত তাহা হইলে অমন আকুলি-ব্যাকুলি করিয়া ভৎর্সনা করিয়া ছুটিয়া যাইত না। চিরকালই তো সে জানিয়া আসিয়াছে যে ভালোবাসার জনকে কেউ এমন করিয়া দূরে ঠেলিয়া দেয় না, বরং আরও ঘনিষ্ঠে আহ্বান করিয়া নেয়। সে যে আর কাছেও দেখা দিল না, আহারান্তে পানমশলাও বাড়াইয়া দিল না, তাহার মধ্যে একটা বিরাগই প্রকাশ করিয়াছে। অতিথি হইয়া উপকার করিতে আসিয়া হোসেন না চাহিলেও একটা নিদারুণ হঠকারিতা, একটা অসৎকর্ম করিয়া ফেলিয়াছে।

বাহির হইতে ঘর, ঘর হইতে বাহির, হোসেন কোথাও যেন আর সুস্থির থাকিতে পারিতেছিল না, উঠানের উপর পায়চারি করিতে করিতে সে নিজের সমূহ কর্তব্য স্থির করিয়া লইতে চাহিল। একটা হন্যে কুকুর অযাচিতভাবে সেই বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল; সে কয়েকবারই হোসেনের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করিয়া আবারও নিজের বাছিয়া লওয়া কোনো ঠাঁই-এর কাছে ফিরিয়া গেল। ঘরের দিকে অন্ধকার রাত্রি নিশুতি, কেবল মাঝে মধ্যে কোথাও হইতে একটা মৌসুমি হাওয়া হঠাৎ জাগিয়া আবার কোনো দিকে মিলাইয়া যাইতেছিল। হোসেন একসময় টের পাইল তাহার সঙ্গে সবেমাত্র নতুন ফোটা কদমফুলের গন্ধও ভাসিয়া আসিতেছিল। অথচ ঝিঁ ঝিঁ কি উচ্চিংড়া পোকাগুলি আর কোথাও ডাকাডাকি করিতেছে না; ইতস্তত হইতে ব্যাঙের ডাকাডাকিও তখন নীরব হইয়া গিয়াছে। ঘরের চাল বাহিয়া টুপটাপ করিয়া পড়িতেছে বাতাসে জমিয়া থাকা সারা রাত্রির শিশির, কখনও ঠাণ্ডা হাওয়ায় পুকুর পাড়ের আম-জামের গাছগুলিতে ধীর-লয়ের মর্মর ধ্বনিও যেন আর শোন যায় কী না যায়।

এক সময় ঘরের দিকে পা বাড়াইতেও তাহার মনে হইল কে যেন ছিল কেঁওয়ারের কাছে, তাহার সাড়া পাইয়াই ঝট করিয়া সরিয়া গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোসেন কয়েক মুহূর্ত নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হাতিনায় উঠিয়া যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইল। কিন্তু কেঁওয়ারের দিক হইতে চুড়ির আওয়াজ পাইয়া আবার সে থামিয়া গেল।

: চাচি

কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ভিতরে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে নাক ডাকাইয়া সে হয়তো অঘোরে ঘুমাইতেছে। সকাল হইয়া আসিতেছে, সেই সময় জাফর কিংবা মেহেরজান কাহারোই আর জাগিয়া থাকিবার কথা নয়। অথচ সেই সকালের স্রোতেই ভাসিয়া পড়িবার জন্য হোসেন মনস্থির করিয়াছে।

: চাচি, আমি বিদায় লইতে চাই, রওয়ানা হইতে চাই, এই শেষ রাত্তিরের জোয়ারে। না হইলে মনে কয় কেবল মুসিবতের উপর মুসিবতই নামিয়া আসবে।

তখনও কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেল না কাহারও। হোসেন অগত্যা বাহিরের দিকে পা বাড়াইবে এমন সময় কোথা হইতে শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলিয়া নামিয়া আসিল মুষলধারায় বৃষ্টি। সেই সময় চুলাশালের দিক হইতে হাঁস-মুরগিগুলিও অকস্মাৎ কলরব তুলিয়া জাগিয়া উঠিল। মনে হইল, ঘরের মধ্যেও যেন কেউ দিয়াবাতিতে কুপি জ্বালাইয়া তাহাদের তদারকিতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে।

: চাচি?

প্রথমে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; কিন্তু হোসেন টের পাইল কেউ কেঁওয়ারের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

: কী, হইল কী আপনার? ঘুমায়েন চুপ করিয়া।

ঘরের ভিতর হইতে মেহেরজানের চাপা ধমক শুনিয়াও হোসেন যেন শান্ত হইতে পারিল না। কুপির আলোটা নিভিয়া যাইতে দেখিয়া সে আবারও বলিয়া উঠিল : নাহ, এই জোয়ারেই আমারে রওয়ানা হইতে হয়। আমি চললাম।

সেই সময় খুলিয়া গেল সেই ঘরের কেঁওয়ার, অন্ধকারের মধ্য হইতে নামিয়া আসিল মেহেরজান এত কাছে যে যেন তাহার নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা যাইতেছিল; আর তাহার দেহগন্ধ নোতুন ফোটা কদম ফুলের গন্ধও বিবশ করিয়া সেই দ্বিপ্রহর কালের বর্ণগন্ধ সৌরভকে মনে করাইয়া দিল।

: আপনি কী পাগল হইয়া গেলেন? কোথায় যাইবেন এই দেয়ইর মধ্যে? পাগলামি করবেন না আর, চুপচাপ বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়েন। আপনার যাওয়া হইবে না।

হোসেন নিথর হইয়া পড়িল; তবু এক সময় জেদ দেখাইল : কিছুমাত্র পাগলামির কথা না। আমার বাড়ি আমার তো যাইতেই হইবে।

অন্ধকারের মধ্য হইতে একটি হাত হোসেনকে স্পর্শ করিল : না, এমন দেয়ইতেই যে বাহির হইতে হইবে এমন কোনো কড়ার নাই। তামাম রাত্রির এমন জাগিয়া থাকলে এমনিতেও শরীল কড়া হয়। একটা ঘুম দিয়া দেখেন, অনেক কিছুই পয়-পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

হোসেন টের পাইল, তাহার পুঁটলিটা কোথাও সরাইয়া রাখিয়া মেহেরজান ঘরে উঠিয়া কেঁওয়ার ভেজাইয়া দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো সেই সময় তাহার মা-ও জাগিয়া উঠিয়াছিল। প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও হোসেন অন্য কোনো উদ্যোগের শক্তি পাইল না। মনে হইল মেহেরজান যেন তাহার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ভরসা হাতের মুঠায় লইয়া এমন কোনো অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছে সেইখানে হোসেনের আর কোনো শক্তিই খাটিবে না। সে নিজ শয্যার উপর বসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু আর ঘুমাইতে পারিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল মেহেরজানকে দলিত মথিত মর্দিত করিয়া তাহার কাছে নতজানু করাইতে পারিলেই সে হয়তো শান্তি পাইত, তারপর যদি মেহেরজান ডাগরচক্ষু মেলিয়া কাঁদিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া তাহার যাত্রা বন্ধ রাখিতে অনুরোধ জানাইত, হোসেন ভাবিয়া দেখিতে পারিত। হোসেনের জন্য তাহার কিছুমাত্র অনুরাগ থাকিলে সে উঠিয়া আসিতে পারে না?

অনর্থক প্রতীক্ষার মধ্যে দিয়া বাকি রাত্রিটুকু শেষ হইয়া গেল। ভোরের দিকে হয়তো বা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু জাফরের ডাকা ডাকিতে উঠিয়া পড়িল।

: আরে, আরে। ওঠেন ভাইজান, আপনে আর বুজান ছাড়া এখনতক আর কেউই কোথায়ও বিছানায় পড়িয়া নাই। কোন বিহানে উঠছি আমি, যেন কাক-পক্ষিরও ডাকের আগে। সারা রাত্তিরের বিষ্টির পর তামাম দুনিয়া পানিতে থৈ থৈ। সমস্ত মুল্লুকে মাছ ধরার ধুম পড়িয়া গেছে। পুকুরের জানে যে চাঁই পাতছিলাম তাতে না জানি কত মাছ আটকাইছে!

হোসেন অকস্মাৎ একটু অনুতপ্ত বোধ করিল। শিকদার যাহাই বলুক প্রকৃতি কখনও যাচিয়া ধরা দেয় না, পৌরুষ রুদ্রবেশে আসিয়া লুটিয়া না লইলে তাহার জীবন-যৌবনও যেন সার্থক হয় না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া যাইতে যাইতে কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল ঘরের সমস্ত কপাট ভাঙিয়া সেও মেহেরজানের কাছে উপস্থিত হইতে পারিত। কেবলই মনে হইতে লাগিল তাহারও সমস্ত কৌমার্য যেন সারা নিশিভর ছড়াইয়াছে কেয়া-কেতকীর মতো। নিশীথের অন্ধকার আর কান পাতিয়া দিগ-দিগন্তের শাসনবারণ প্রত্যুষের আশীর্বাদ হইয়া দেখা দিল। জাফরের কচি হাত, কিন্তু তাহারই মধ্যে ছবদারের সমস্ত পরিবারের জীবন-স্পন্দন অনুভব করিতে সে অন্য এক পৌরুষের সন্তুষ্টি বোধ করিতে লাগিল।

: চলো যাই, আইজ কেবল মাছ না, ভোঁদড়েরও নিস্তার নাই।

: না, না—হাত তুলিয়া সাবধান করিতে চাহিল জাফর : ভোঁদড়গুলান বড়ো চালাক, হলক হইতে না হইতে কোন কোন মুল্লুকে চলিয়া যায়, কেউ আর তারগো উদ্দেশ পায় না। বুজানরে জিগাইয়া দেখেন, সেও জানে, সে-ই কইছে।

হোসেন ঘরের কপাটের দিকে চাহিল বটে, কিন্তু সেই দিকে কেউ ছিল না।

তার বাঁশির সুরে এমন মন হরে
যে কুলবধূ যায় কুল ছেড়ে রে
সখি, দেখা হলে বলিস তারে।
ধারে কাছে প্রতিবেশী, গুরুজন কাছে বসি
সে নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি
আমি লাজে যে যাই মরে রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে কয় জলের ঘাটে যাই
জলের ছায়ায় তারে দেখিয়া পরান জুড়াই
আবার ঘরের দাওয়ায় এসে এসে
জল ফেলিয়া জল ভরতে যাইরে
সখি, দেখা হলে বলিস তারে
সে যেন নাম ধরিয়া আর
বাঁশি বাজায় নারে
আমি কেমনে আর যাইব রে ঘাটে
কুল মান সংসারে সন্তরে—

পুকুরের একধারে ছোটো একটা নালা কাটিয়া খালের সঙ্গে যুক্ত; স্রোত এবং জল চলাচলের জন্য তাহার প্রয়োজন। সেইখানে বেত-বাঁশের খাঁচা পাতিয়া মাছ ধরার কৌশলটাও সাধারণ, কিন্তু সব বিষয়েই জাফরের যেন উত্তেজনা-উৎসাহের অবধি নাই।

: তবে ভাইজান আমি আপনার উপর বড়ো গোস্বা করিয়া আছি।

হোসেন কৌতুক অনুভব করিল : কেন, কী করলাম?

: আমারে কেচ্ছা শুনায়েন নাই।

: ও, আচ্ছা, আচ্ছা। আইজ শোনামু।

: সত্য?

: হুঁ, হুঁ!—হোসেন চিন্তামগ্নভাবে মাথা দোলাইল।

: অনেক বড়ো, অনেক লম্বা। সেই কেইটা শোনতে শোনতে এই দিকের আসমানের তারাগুলান এক্কেবারে এদিকে ঢলিয়া পড়তে থাকবে। একেবারে মন যেমন চায় সেইরকম পরান কথা। জানেন তা হইলে চুপচাপ বুজানও শুনবে, হ।

জাফর মহা উৎসাহে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া যাইতে লাগিল : বাপুরে বাপু, এত কেচ্ছা আপনে কেমনে পারেন ভাইজান?

: শুনি, মানষের মুখে, পুথিতে আছে।

জাফরের চক্ষু বড়ো বড়ো হইয়া উঠিল : আরে, পুথিও পড়তে পারেন আপনে? হোসেন মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইল বটে, কিন্তু এখনকার মতো বিষয়টার ইতি টানিতে চাহিল : হ, হ, হইবে, হইবে।

হোসেন সরাসরি উত্তর এড়াইয়া গেল : তুমি পারো?

: হ, তা হইলে আর আপনারে এত সাধাসাধি করি। তায় আমাগো পুথিও নাই। ওই যে বাড়ি দেখেন—জাফর আঙুল উঁচাইয়া প্রতিবেশী গ্রামের দিকে দেখাইল : ওই তাগো বাড়িতে বেশ কয়েকখান পুথি আছে। অনেক সময়, সাঁঝের পর সুর করিয়া পড়তে বসে, কত মানুষ শোনতে আসে চতুর্দিক হইতে। রাত্তির কালে কান পাতিয়া রাখিয়েন, আপনেও শোনতে পারবেন।

: দেখিও, দেখিও, সব কাদায় পিছল হইয়া আছে। পা ফসকাইয়া পড়িয়া যাইও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফরকে সাবধান করিতে গিয়া হোসেনই পা ফসকাইয়া যাইতেছিল। জাফর খিলখিল করি হাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে যেন আরও কাহার হাসি শোনা গেল ঘাটের দিক হইতে। হোসেন নিজেকে সামলাইয়া লইয়া দেখিল মেহেরজানও ঘাটে আসিয়াছে মুখ ধুইতে। সে গায়ের কাপড় টানিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইল।

: হুঁ!—হোসেন একটু উষ্মা দেখাইল : পড়িয়া যাওন এমনই সোজা। আসলে, বোঝলা জাফর, একটা পেতনির ইচ্ছা হইছিল পড়িয়া যাই। সে কয় দেখো না মর্দ আমিও মুখ ধুইতে যাইতে আছি ঘাটে, তুমি যে বড়ো আগে আগে চলতে চাও? এই কইয়া দিতে চাইল আমারে এক ধাক্কা। তা আমি তো সেই সব আমলে আনি না। কই, পড়িয়া গেলাম?

: না তো!

: দেখো তা হইলে, কেমন আমার ক্ষ্যামতা! ও কী তবু যে হাসো।—বলিতে বলিতে হোসেন আড়চোখে চাহিয়া দেখিল মেহেরজান কুলি ছিটাইয়া ধীরপদে ঘরের দিকে চলিয়াছে।

: তা পেতনি কী করলে?—জাফর মজা পাইয়া আরও জানিতে চাহিল। হোসেন অনাবশ্যকভাবে একটু গলা চড়াইয়া কহিল : কী আর করবে? মুখ না ধুইয়াই সে তার শ্যাওড়াগাছের বাসায় ফিরিয়া গেল।

মেহেরজান ঘরের দিকে যাইতে যাইতে একবার কৃত্রিম রাগে ভ্রুকুটি করিয়া ফিরিয়া চাহিল। : দূর, দূর ভাইজান, এই মুল্লুকে শ্যাওড়াগাছও নাই, আর সেইসব ভূতপেতনিও নাই। ওই সব কেচ্ছা না, আপনে ফাটকি দিয়া আসল গল্প ভুলাইয়া দিতে চায়েন। না বাপু, তাহ হইবে না।

: হইছে, হইছে। চলো এখন, চাঁই উঠানো যাউক।

রাত্রির বৃষ্টিতে খাল-পুকুর, চতুর্দিকের খেত মাঠও ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল। অনেকরকম মাছই ছুটাছুটি করিয়া চাঁই-এর মধ্যে আটকাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দুইটা বড়ো বড়ো শলা চিংড়ি পাইয়া জাফর মহা হৈ চৈ লাগাইয়া দিল। অন্য একটা চাঁই দেখা গেল ভাঙা, ভিতরে তিত পুঁটিটা পর্যন্ত নাই।

: এইটার মধ্যে ভোঁদড় ঢুকছিল আমাগো জন্য আর কিছু বাকি রাখে নাই। একটা আরও মজবুত চাঁই বানানোর কাম দিয়া গেছে।

জাফর শামুক-গুগলিও যত্ন করিয়া উঠাইয়া লইল : বুজানেও খুশি হইবে, হাঁস-মুরগিগুলানেরও মহোৎসব লাগিয়া যাইবে। আচ্ছা ভাইজান, কেমন ওই ভোঁদড়টা, কোথায় হইতে আসে, কখনও তো চৌখে দেখি নাই।

: থাকে কোথায় বন-বাদাড়ের মধ্যে, ওই মাঠ-ঘাটের কোনো দিকে কোনো গর্ত-টর্ত আছে। মানুষের ধারে কাছে বড়ো একটা আসে না, দেখলেও পালাইয়া যায়।

জাফর আশ্বস্ত হইতে চাহিল : পুকুরের মধ্যে আসে না, আর তেমন ডরেরও কিছু নাই, এ?

: দূর, এই চাঁই ভাঙা, আর মাছের জাল ছেঁড়া ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষতি তারা করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবারও তাহার বাড়ির উঠান পর্যন্ত পৌঁছিয়া দেখে, গত রাত্রির বৃষ্টির জোড়ে একধারের সবজির মাচান প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে, মেহেরজান আর তাহার মা পুঁই, শশা, ঝিঙা, লতাগুলিকে *সামাল দিবার* জন্য জলে-কাদায় মাখামাখি করিয়া ফেলিয়াছে।

: দেখিস মেহের, দেখিস সাবধানে লতাইয়া দে, গাছে যেন ব্যথা না পায়। হোসেন ভাঙা চাঁইটা একধারে রাখিয়া আগাইয়া গেল : সরেন আপনারা, আমি আপন বাড়িতেও এইসব ফলাই।

জাফর মেহেরজানকে ডাক দিল : হাঁস-মোরগেরও আর খাওনের অভাব হইবে না। এত শামুক-গুগলি কেউ কক্ষনো চৌখেও দেখো নাই।—মাছের খালুইগুলি মা এবং ভগিনীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া সেও মহা বিক্রমে হোসেনের কাছে আগাইয়া গেল : কই ভাইজান, কী করতে হইবে, কয়েন। কিন্তু কোনো নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়া সে নিজেই মাচানের একটা কঞ্চি নাড়িয়া ঠিক করিবার জন্য টান দিতেই ঝপ করিয়া তাহার একপ্রান্ত থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল।

ছবদারের স্ত্রী যেন সর্বাঙ্গে আঘাত পাইল। মেহেরজান সরিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল : মহা বাহাদুর সব! হইল তো?

জাফর একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু হোসেন তাহাকে টানিয়া উঠাইল : কিছু হয় নাই, ওঠো, সব ঠিক করিয়া দিতে আছি।

: তুই বরং সরিয়া আয় জাফর। শামুক গুলানরে বাছিয়া দে গিয়া তোর বুজানরে। সে হাঁসগুলানরে খাইতে দেউক। চৌখও রাখন লাগে। উপরের আসমানে সেই সকাল থেকিয়াই চিল-শকুন ঘোরাঘুরি করতে আছে।

জাফরকে তাড়া দিয়া তাহার মা কাদামাখা সবজিগুলি তুলিয়া ঘরের দিকে পা বাড়াইতেছিল। হোসেন মৃদুস্বরে তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল : চাচি, একটা বিষয়ে জিজ্ঞাস করতে চাই আপনারে।

জাফরের মা ফিরিয়া আসিল; কিছুক্ষণ হোসেনের দিকে চাহিয়া রহিল।

: আমি এই ডেনার জোরে উপার্জন করিয়া খাই, এখনই আমার কাম-কায্যের মৌসুম। এখন আবার বাস্তবিকই যাওন লাগে। আমারও এইরকম একখান খেত আছে। একজনের উপর ভরসা করিয়া ছাড়িয়া আসছি। না, না, সে আপন মানুষ, যত্ন নিশ্চয়ই করবে। তবু আমিও তো আর এখন এইখানে থাকতে পারি না। আমারে যাইতেই হয়।

জাফরের মা নতমুখে কোঁচড়ে সবজিগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল : বুঝি বাজান, ধরিয়া রাখনের শক্তি আমাগোই বা কী আছে।

হোসেন একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল : আপনাগোই বা কী ব্যবস্থা হইবে? এইভাবে তো আর দিন চলতে পারে না।

: এই ছিদ্দত দূর করার জন্যই তো জাফরের বাপ ওই শরীর লইয়া গাঙে নামছেলো। —জাফরের মা-র গলা ধরিয়া আসিল : তুমি তো সবই দেখলা, সবই বোঝো, কেবল চিল-শকুন খেদাইয়া আর কতকাল বাঁচিয়া থাকন যায়? পাছ-দুয়ারে শিয়াল ঘোরে, নানান উৎপাতের শেষ নাই। মাঝে মাঝে দুই চৌখের পাতা এক করতে পারি না, দা, হাতে লইয়া বসিয়া থাকি। কিন্তু কোনো উপায়ও দেখি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: চেষ্টা তো করণ লাগে। আমি তো দেখি মেহেরের ওই বিবাদটা মিটাইয়া ফেলন দরকার।

জাফরের মা হঠাৎ কোনো উত্তর করিল না, কেবল নৈরাশ্যের ভঙ্গি করিয়া বলিল : এ, তো আর হয় না, বড়ো তেজি মাইয়া, সেই হাড়ে হারামজাদার ঘর করতে যাইবে না। চাপ দিলে হয়তো বা গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিয়া পড়বে। এখন কেবল জাফরের ডাঙর হইয়া ওঠনের অপেক্ষা, সে যদি কোনো উপায় করিয়া সম্বন্ধটা ছাড়াইয়া লইতে পারে। সেই শয়তানটার স্বভাবই ওই, একটা করিয়া বিয়া করে, তারপর একদিন টাকা-পয়সার দাবি উঠায়। সেই আমার এগারো বছরের মাইয়াটারে লইয়া গেল, আর কয়েকমাস যাইতে আরও একজনরে ঘরে আনিয়া উঠাইল কোথায় হইতে। মেহের কোনো বাক-বিতণ্ডার মধ্যেও যায় নাই। যেখানেই থাউক, মাইয়া ছেইলারা কক্ষনো বাপের বাড়ির পথ ভোলে না। সেই যে চলিয়া আইল, আর ফিরান গেল না। অবস্থাটা এমন হইয়া রইছে যে সেই ধুরন্ধর নগদ টাকা হাতে না পাইলে অন্য রকম সর্বনাশের পথ ধরবে। কখন যে কোনদিক দিয়া কী হয়, সেই ভয়ে তো কলিজা শুখাইয়া আছে।

: কত টাকার বিষয়?

: অনেক-অনেক টাকার বিষয় বাজান, পাঁচ-সাত কুড়িতেও হয়তো কুলাইবে না।

: টাকার ব্যবস্থা হইলে তারে ছাড়াইয়া লইতে পারবেন?

জাফরের মা-র চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল : আমি তার ঘাড় ধরিয়া তালাকনামা লেখাইয়া লইতাম। আরও দশজনেরে লইয়া তার কাছে হাজির হইতাম।

হোসেন সেইসব কথায় আমল না দিয়া বলিল : আহা, আমি সেইসব হৈ-হট্টগোলের কথা উঠাইতে আছি না। টাকার ব্যবস্থা হইলে তারে ছাড়াইয়া লইতে পারবেন কিনা সেই বিষয়টা বুঝ করতে চাইলাম। আমার জানা শোনা অনেক পোলা আছে, একটা ভালো সম্বন্ধের প্রস্তাব উঠাইতে পারতাম। জাফরের মা-এর মুখের ঔজ্জ্বল্যটা যেন একটু নিভিয়া গেল; পিছনের দিকে কাহারও সাড়া পাইয়া ধীরে ধীরে বলিল : তোমারে আল্লায় জুটাইয়া দিছে। দেখো, তুমি যা ভালো বোঝো।

হোসেন মাচানের কাজে মন দিয়া বলিল : আমি তা হইলে এই শেষ রাত্তিরের জোয়ারেই রওয়ানা দিতে চাই।

জাফরের মা অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কী ভাবিল, তারপর উঠানের দিকে আগাইয়া গেল। উঠানের একধারে খরার দিনে ব্যবহারের চুলাশাল। মেহেরজান সেইখানে শামুক কাটিয়া হাঁসগুলিকে খাওয়াইতে ছিল।

: আয়, আয়, চৈ, চৈ, চৈ—

জাফরের মা কাছে গিয়া বসিয়া রহিল কিছুকাল, মেহেরজান বেশ কয়েকবার তাহার মুখ চোখ লক্ষ করিয়া কিছু আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল।

: আমারে জিগাইল তুই আর ওই বাড়িতে যাইতে ইচ্ছা করস না কেন?

মেহেরজান শামুক কাটা থামাইয়া আরও কিছু শুনিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

: কইলাম, মাইয়া আমার সে বাড়ির নামও আর মুখে লইতে দেয় না। তখন জিগগাস করে কত টাকা লাগবে ওই সম্বন্ধ ছাড়াইয়া লইতে। তার জানাশোনা ভালো পাত্রও নাকি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেহেরজান হঠাৎ আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

জাফরের মা-র ভাবনা ভাঙিয়া গেল, লক্ষ করিল বটির মাথায় একটা আঙুল কাটিয়া ফেলিয়াছে মেহেরজান, তাজা রক্তে সমস্ত হাত ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে হইল নখের প্রান্তে এক টুকরা মাংসও যেন ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মেহেরজান রক্ত থামাইতে ব্যস্ত হইয়া, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ককাইয়া উঠিল।

: কী কাণ্ড, কোনোদিকে কিছু শান্তি নাই, পোড়া কপাল, যেন চতুর্দিক দিয়া সমস্ত বিপদ-আপদ যড় করিয়া নামছে। ওরে জাফর, তোর ভাইজানরেও একবার ডাক দে দেখি।

হাতের যন্ত্রণা সত্ত্বেও মা-এর উপর বেশ একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল মেহেরজান : এই দেখো, তারে আবার কেন? সব বিষয়ের মধ্যেই তাকে ডাক দেওনের কী এমন দরকার পড়ছে। তুমি কিছু কচুর ডাঁটা আর একটু ত্যানার জোগাড় করো।

কিন্তু ততক্ষণে হোসেন উপস্থিত, হাত বাড়াইয়া সে আঙুলটা দেখিল। যদিও মেহেরজানের সেই নিটোল হাত স্পর্শ করিতেও সে নিজেই থামিয়া উঠিল, তবু জাফরকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বলিল : একটু কেরাসিন তেল লইয়া আসো।

তারপর চুমুক দিয়া কিছুটা রক্ত টানিয়া লইয়া সে আঙুলটাকে শক্ত হাতে চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। মেহেরজান আকুল ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

: খুব কষ্ট হইতে আছে?

মেহেরজান জবাব দিল না, মুখ ঘুরাইয়া লইল।

: সামান্য একটু কাটছে, ডরের কারণ নাই।

মেহেরজান ঠোঁট ফুলাইয়া : হ, সামান্য। কেডা আপনারে ডাকছে? আইলেন কেমন করিয়া এত সব মাথা ব্যথা ফেলাইয়া?

হোসেন একটু অবাক হইয়া গেল।

: কেডা আপনারে কইছে আমার সম্বন্ধের উদ্দেশ করতে? যায়েন আপনে, আমার নিজের বিষয় আমি নিজেই দেখতে পারমু।—মেহেরজান নিজের হাত ছাড়াইয়া লইতে চাহিল।

হোসেন একটু হতভম্ব হইয়া পড়িলেও, তাহার হাত ছাড়িল না। ইতিমধ্যে জাফর কেরোসিন তেলের বোতল আর নেকড়া লইয়া আসিয়াছে, তাহার মা-ও লইয়া আসিয়াছে তাজা কচুর ডাঁটা, পুষ্ট পুষ্ট পানের পাতা। হোসেন মেহেরজানকে অভয় দিয়া ক্ষতস্থানটি ধুইয়া দিল কেরোসিন তেলে; মুখে পান চিবাইয়া বাঁধিয়া দিল কচুর ডাঁটার বাকল দিয়া। মেহেরজানের চোখে জল আসিলেও, যন্ত্রণায় সমস্ত হাত বিবশ হইয়া যাইতে থাকিলেও উঠিয়া যাইতে পারিল না। তাহার হাতের আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে এক সময় সে দেখির মেহেরজান হাঁটুর উপর মুখ চাপিয়া যেন অগত্যাই হোসেনের কাছে আপন হাতখানি এবং সেইসঙ্গে আরও কিছু ইচ্ছা-অনিচ্ছাকেও ছাড়িয়া দিয়াছে।

: খুব টাটাইতে আছে?

কেবল সেই সময় মেহেরজান তাহার হাত টানিয়া লইতে চাহিল : তাতে আপনার কী? আমার জন্য সম্বন্ধের জোগাড়ে আপনার ঘুম হইতে আছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফরের মা এবং জাফর তখন কাছাকাছি ছিল না। হোসেনের বুকের মধ্যে আবারও একটা ইচ্ছা যেন দুর্দম হইয়া উঠিল। মেহেরজান সম্ভবত তাহারাই আভাস পাইয়া দ্রুতপদে পাকঘরের দিকে উঠিয়া গেল।

হোসেনের মনে হইতে লাগিল নিজের একটা আঙুল কাটিয়া ফেলিলেও সে হয়তো এমন আউল-বাউল বোধ করিত না। একটা মেয়েমানুষ যে সমস্ত পুরুষ পৌরুষকে এমনভাবে চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারে, সে খেয়াল তাহার যেন আর কখনও হয় নাই। বাতাসে কদমফুল না কোনো বুনোফুলের গন্ধ, নাকি মেহেরজানেরই শরীরের ঘ্রাণ তাহাও যেন সে আর আলাদা করিয়া অনুভবের সুযোগ পাইল না।

তবু সে একগুচ্ছ কদমের ফুল সংগ্রহ করিয়া জাফরকে দিল : নেও, বাড়ি লইয়া যাও, মিঠা-কড়া তামাকের লাহানই, এর সুবাস বাতাস ভরিয়া ফেলাইতে আছে। এই ফুল এত দেখছি, তবু এমন খেয়াল যেন কখনও করি নাই।

সুখ দুঃখ নৃত্য করে ভুবন জুড়িয়া
ঋতু দেয় ফুল-ফল বৎসর ধরিয়া
ভাঁটায় উজানে গড়ায় বহতা নদী
তারই মধ্যে, ভিত বাঁধি জনম অবধি
ফুলের কেশর হইয়া সাধ উড়িয়া বেড়ায়
অন্তরও আকাশ হইয়া কেবলই উথলায়

কীট পতঙ্গ বৃক্ষ রাজি ফুল লতাপাতা
ভুবন জুড়িয়া গায় নিত্য গীতকথা
কী শক্তি লইয়া আমি তার কথা গাই
পুরাণে পরানের সাধ মিটাইতে চাই।

আর কেবল দুশ্চিন্তা লইয়া সময় কাটাইয়া দেওয়া নয়, শিকদারও নিজের জীবন বদলাইবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ অতৃপ্তি এবং চাঞ্চল্যেও সে অধীর হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে সে কেবল নতুন গীত-গান বাঁধার চেষ্টাই করে নাই, হোসেনের ঘর-বাড়ি সবজি খেতেরও তদারক করিয়াছে, সখিনাদের বাড়ির দিকে বেশ কয়েকবার পা বাড়াইয়াও ফিরিয়া আসিয়াছে। কেবলই মনে হইয়াছে সেই ঘটনাটা বড়ো জটিল; গঞ্জে আলীর প্রভুপক্ষকে অসন্তুষ্ট করার মতো কোনো কাজ হোসেনের পক্ষেও মঙ্গলজনক হইবে না।

কেবল একটা ইচ্ছা লইয়া তা করিতে পারে না। পুঞ্জ পুঞ্জ গাঁয়ে-গ্রামে মানুষের গোষ্ঠী যেইভাবে জড় হইয়াছে, আশ্রয় লইয়াছে, তাহার মধ্যে নিজের প্রতি কর্তব্য ছাড়াও আরও কতকগুলি বাধ্যবাধকতা আছে। গঞ্জে আলীর মতো ভিটা-মাটিহীন মানুষের পক্ষে অন্যতর কোনো পথ খোলা ছিল না, সখিনারও তখন আর কোনো উপায় নাই। এই রকম অসংখ্য দুঃখ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মতো ছড়াইয়া রহিয়াছে বিশ্ব-ভুবনে। হয় মানুষ উদাস হইয়াছে না হয় আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ডুবিয়া যাইতে চাহিয়াছে। এতকাল পর্যন্ত শিকদার যে গীত-কথার জগতে বিচরণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল এই সব দুঃখের ক্রন্দনটাই মুখ্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো দুঃখ হরণ দুঃখ মোচন মন্ত্র নাই; নানারকম বাদ-বিবাদকে আশ্রয় করিয়া জগৎ জীবনের আসল সমস্যাগুলির সমাধানও আড়ালে পড়িয়া রহিয়াছে। অথচ সেইসব কথা, সেইসব সুর শিকদার যেন পাইয়াও পাইয়া ওঠে না। মনের কোণে এক একবার দূর দিগন্তের ঠাটা-ঝিলিকের মতো দেখা দিয়া আবারও তা বিশাল ভুবনে মিলাইয়া যাইতেছিল। দিন কয়েক অনর্থক নানা চেষ্টা করিয়া সে সমস্ত পুথিপত্র, সব বাদ্যযন্ত্র আবারও সরাইয়া রাখিল। তাহার ক্রমাগতই মনে হইতে লাগিল ক্ষুদ্রের মধ্যেও যে আনন্দ, সামান্যের মধ্যেও যে সন্তুষ্টি তাহার মধ্যেও তো কত জীবন-কথা। সেই কবির দলে তালিম দিবারও সময় এক অতি বড়ো কবি, শিক্ষিত ভদ্রজনের মুখে একটি গান শুনিয়াছিল, তাহার প্রতিটি পদ এখনও সে অবিকল মনে করিতে পারে, স্বয়ং কবি আবদুল করীমের সংগ্রহের গান, তাহারই গলার অপরূপ সুর করিয়া গাওয়ার ধরনটাও তাহার এক সময় খুবই ভালো লাগিয়াছিল। সেইরকম সাধারণ, অতিসাধারণ বিষয় লইয়াও কেন সে গীত বাঁধিতে পারে না?

নিজের হাতে বোনা একছড়া ঝাঁকিজাল কাঁধে লইয়া খালের দিকে চলিয়া গেল শিকদার। এমন বড়ো বিশাল ভুবনে কেবল কি দুঃখটাই সত্য হইয়া আছে? জীব-জীবনে, সময় সময় দৃশ্যেরও সঙ্গোপনে কত লীলা, কত আনন্দের অবকাশ, সেই মুহূর্তগুলিও কী সে দেখিয়াও দেখে নাই? মনে পড়িল একবার ঘোরতর বন্যার সময় সেই শহর প্রান্তে এক অখ্যাত বয়াতিকে গাহিয়া উঠিতে শুনিয়াছিল :

এইবার জুত্তা জোড়া ছুটি পাইছে—
পারে না কেউ পরিতে
দাওয়াত দেও নাই তবু দেখো
পানি উঠছে আসিয়া বাড়িতে।

AMARBOI.COM

শিকদার বড়ো মজা পাইয়াছিল, মুগ্ধ হইয়াছিল। একই সঙ্গে রসিকতা এবং মানুষের বিপদ মোকাবেলার একটা সবল মনোভাবই যেন তাহার সেই গানে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শিকদার অন্যত্র যাইতেছিল, তাহার সঙ্গে পরিচয় অথবা সেই গীতের সমস্তটুকুও শোনা সম্ভব হয় নাই। সেই গায়ক থৈ থৈ করা বন্যার মধ্যে একটা উঁচা গাছের তলায় বসিয়া যেন আপন মনেই সেই পদগুলি মুখে মুখে বানাইয়া লইতেছিল, মাঝে মধ্যে কোলের দোতারায় অকস্মাৎ কিছু ঝঙ্কার তুলিয়া। শিকদারের কেবলই মনে হইতে লাগিল, গীত-গান, কাব্য-কর্ম এমনকী সমস্ত আনন্দ ধর্মও যেন কোনো একক বস্তু নয়, একক সৃষ্টি নয়, অনেক মানুষ একসাথে হইয়া হয়তো সব দুঃখকেও অতিক্রম করিতে পারে।

সে কয়েকবার জাল ফেলিয়া কিছুদূর আগাইয়া গিয়াছে, এমন সময় পিছনে মনসব সর্দারের হাঁক শোনা গেল : এই কবিয়াল, হায়-হায়, খালে বুঝি আর একটা মাছও রইল না।

তাহার ঠা ঠা হাসির জোড়ে শিকদার সংকুচিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল। মনসব সর্দার হাতের খালুইটা নাড়াচাড়া করিয়া বলিল : ভালোই হইল, এই রকম গুড়া মাছ আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরেও খুব পছন্দ।—বলিতে বলিতে ফট করিয়া একটা বুনা কচুগাছের পাতা ছিঁড়িয়া প্রায় সবগুলিই তাহার উপর ঢালিয়া লইল।

: যাইতে আছিলাম এইদিক দিয়া এস্টাটের নানা রকম কামকার্যের জন্য কিছু লোকজনের দরকার। মনে ইচ্ছা হইল, এই ফাঁকে তোমারও খবর লইয়া যাই। কী রকম আউগাইতে আছে?

শিকদার কী উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। এক সময় কেবল বলিতে চাহিল; চেষ্টায় আছি। দুঃখের কথা ছাড়া কোনো আমোদ-উৎসবের লব্জ যেন আর মুখেও আসতে চায় না।

মনসব সর্দার একটুকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অন্তরঙ্গ হইতে চাহিল : কবি, ওইখানেই তো তোমার সমস্যা। একটা মাইয়া-মানুষের জন্য তুমি তোমার এমন গুণ, এমন জীবনটারে এক্কেবারে নষ্ট করিয়া দিতে আছ দেখিয়া দুঃখ হয়, রাগও হয়। কিছুতেই মনরে বুঝাইতে পারি না, দশজনে যা কয় সেই কথাটাই সত্য। তাও যদি হয়, তুমি কও আমারে, আমি সেই মাইয়াটারেই আনিয়া দি। আমার তো মনে কয় সেই মাইয়াটাও খুব সুখে নাই।

শিকদার একটু উৎসুক্য দেখাইল বটে, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করিল না।

মনসব সর্দার চক্ষু নাচাইয়া ইঙ্গিত করিল গঞ্জের দিকে: এত বড়ো এস্টাট চালাইতে হয় আমারে, অনেক মানুষের সঙ্গে কারবার-সারবার। ওই নলসিঁড়ির ঘাটেই একদিন কিছু কথাবার্তা শোনলাম। সে যার ঘর করে সে গঞ্জে কী এক দোকান না আড়ত দিছে, আর সেইখানেই একটা বাজারের মাইয়া-মানুষ লইয়া থাকে। এই-ই হইছে এখনকার এক রীতি। যে-ই দুইটা পয়সার মুখ দেখে, তখনই পঙ্খির লাহান উড়াল দিয়া যায়, মৌমাছির লাহান মধু খুঁজিয়া বেড়ায়। দেখি তো, কোন ঘরে একটা মাইয়া-ছেইল্যা বাস্তবিকই সুখে শান্তিতে আছে?

AMARBOI.COM

শিকদার একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। আবারও মনে হইল সেইদিন গঞ্জের ঘাটে নৌকার পর্দার আড়ালে হইতে জোবেদা কী কথা বলি বলি করিতেছিল। কিন্তু সে জোড় করিয়া সে-চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দিতে চাহিল, সে জীবন বদলাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে, সেই বিষয়েই তাহাকে কৃতসংকল্প হইতে হইবে। তাহার সমস্ত চিন্তা-চারিত্র্যের একটি মাত্র সরলার্থই সকলে করিয়া রাখিয়াছে, সে শত চেষ্টা করিলেও কাহারোই ধ্যান ধারণা ভাঙিতে পারিবে না। একমাত্র উপায় নতুন ধরনের গীত-কথায় তাহাকে সাফল্যলাভ করিতে হইবে। আর তাহাও হয়তো কর্মের মধ্য দিয়া, সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়াই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। মুখ তুলিয়া হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল : সর্দার, একটা কাম আমারে জোটাইয়া দেওন যায় না?

মনসব সর্দার একটু অপ্রতিভ বোধ করিল : তোমার লাহান মানুষরে খাটিয়া খাওনের কাম কেমন করিয়া পোষাইবে। আমি তালাশে বাহির হইছি ভাটির দেশে হাল-হালুটিয়া কাম-কায্যের মানুষের জন্য। সেই যাগো ভিটা নাই, মাটি নাই, গায় গতরে খাটিয়া দুইমুঠ ভাত জোটানোর জন্য যাগো আর অন্য সাধ্য নাই, চারা নাই—সেই কাম তোমারে দিয়া হইবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার মনসব সর্দারের হাসি আমলে না দিয়া বলিল : কেমন হইবে না সর্দার? আমার মনে কইতে আছে আমারও মনটা কেবল পুরাণ কথা আর পরান-কথার মধ্যে মজিয়া রইছে, আরও সত্য সাঁচা কিছু দেখতে চাই, জানতে চাই, তা না হইলে এই জীবনের আর কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাইতে আছি না। তুমি কও গীত বাঁধতে, কথা সাজাইতে, আমি এত চেষ্টা করি, তবু কোনো ভাব কোনো মিল যেন চতুর্দিকে আর খুঁজিয়া পাইতে আছি না। মনসব সর্দার একটুকাল তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ ঠা ঠা শব্দে হাসিয়া উঠিল : কীসের কোন মিলের জন্য যে তোমার এমন দুর্ভাবনা তা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার ওই কথা এক কথা, কবি, এক তরতাজা মাইয়া-মানুষ কোলে লইয়া দেখো সব মিল কেমন সহজ সরল হইয়া যায়। মনে গোস্বা লইও না কবি। আমার পিরকিতি তো জন্যেই। কোনো মাইয়া-মানুষ মনে ধরলে আমি মর্দ কোনো হায়-হুতাশের মধ্যে নাই। একদিন তারে মুরগির লাহান বগলদাবা করিয়া বাড়ি আনিয়া উঠাই। পেরথমে হেইগুলায় খুউব চিল্লায় চেঁচায়, কান্দে-কাটে, অমত করে খুউব, শেষমেষ কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই গলার উপর থেকিয়া তাগো হাতের বেড় সরাইয়া ছাড়াইয়া কাম-কায্যে যাওনও শক্ত হইয়া ওঠে। ওই একটা মিল হইলে সকল মিলই সহজ হইয়া যায়। —মনসব সর্দার শরীর দুলাইয়া হাসিতে লাগিল।

শিকদারের পিতামহ করমালীর সম্মুখে পড়িলে তাহাদের মধ্যে হয়তো একটা যুদ্ধই বাঁধিয়া যাইত। করমালী কেবলই এই দেহ ধারণ, এই জগৎ সংসারের উপরেই সমস্ত দুঃখের কারণ আরোপ করিত। একমাত্র পিতামহী আর তাহার পিতা করমালীর সেই সব বাড়াবাড়ি পছন্দ করিত না।

পিতামহী সেই শৈশবকালেই বলিয়াছিল : যে বয়সের যা ধারণ। দেহের জোর-এর ঘাটতি পড়লেই নানারকম ফিকির-জিকিরের দেখা দেয়! কানু, তোর গলাটা সুরাল, কিন্তু এই এমন কাঁচা বয়সেই আউগাইয়া আউগাইয়া বুড়া হইয়া যাইস না।

কিন্তু যে জিনিসটা শিকদারকে সেই গান-গীতের ভুবনের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল তা কেবল করমালীর আগ্রহই নয়, শিকদারও যেন নিত্যদিনের দুঃখ কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণার নাগাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সকলের সঙ্গে সমবেতভাবে অন্য কোনো ভুবনে চলিয়া যাইত। কেমন সেই ভুবন, তা কখনও জানে নাই, দেখেও নাই, কিন্তু রোমাঞ্চিত হইত। আসরের পর আসরে চতুর্দিকে সকলের উপস্থিতি, কলকণ্ঠ অথবা বিমুগ্ধিতে যেন তাহারও মনে করমালীর মতোই ভাবাবেশ আসিয়া পড়িত। শিকদার সেইসব ভাবনা মন হইতে দূর করিয়া দিতে চাহিল, মনসব সর্দারের দিকে ফিরিয়া বলিল : নাহ্ সর্দার, কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিয়েন না। আমি বাস্তবিকই এই জীবন বদলাইতে চাই।

মনসব সর্দারের হাসি থামিয়া গেল; সে নিজের পথে পা বাড়াইবার উপক্রম করিয়া বলিল : সে তো খুবই উত্তম কথা। তুমি, যেমন কইছি, এখন বড়োমিঞারে তুষ্ট করার উপায় দেখো, এই মুল্লুকে তোমার ভাতের অভাব হইবে না। আমি এখন ওই ভাটিতে এক চালান রওয়ানা করিয়া দেওনের কায্যে ব্যস্ত আছি। যাইতে চাও যাও, একবার ঘুরিয়া দেখিয়া আসবা। সেই মুল্লুক সহজ না, সেইখানে জীবনের জন্য সর্বক্ষণ যুদ্ধ করতে হয়, একহাতে ঠেকাইতে হয় রুষিয়া-ফুঁসিয়া ওঠা সমুদ্দুরকে, আর অন্য হাতে দৈত্য-দানবের গুষ্টির লাহান ঝড় তুফানরে। একটুক বিশ্রাম লইবারও যেন ফুরসত হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার আর পীড়াপিড়ি করিল না। অথচ মনে মনে তখনই স্থির করিয়াছিল সে আর মানুষের মন যোগাইবার জন্য ভাব-তত্ত্বের গান গাহিয়া বেড়াইবে না। যে-জীবন, কে ঐশ্বর্যকে জানে নাই, তাহার মধ্যেই একবার ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেখিবে। সেখানেও তো মানুষ আছে, জনতা আছে, কেবল নতুন গীত-কথা নয়, হয়তো তাহার এবং হোসেনেরও ভবিষ্যৎ গঠনের একটা সুযোগ মিলিয়া যাইবে।

মনসব সর্দার চলিয়া যাওয়ার পরেও সেই ভাটির মুল্লুকের কথা বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে আসিতে লাগিল। যায় নাই সে কখনও সেইদিকে, সেইখানকার কথাকাহিনি বর্ণনা কেবল লোকমুখেই শোনা। সেই শৈশবকাল হইতে গাঙপাড়ে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড নৌকাগুলি নানারঙের পাল উড়াইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। এক একটা নৌকার পিছনে শক্ত হাল ধরিয়া মাঝি সম্মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া খাড়া, ছইয়ের উপর অবলীলায় হাঁটা চলা করিতেছে মাঝি-মাল্লা, গলুইর পাটাতনে অন্যান্যদের কাজকর্ম, শীতের সময় নামিয়া গিয়াছে দক্ষিণে, আবার গ্রীষ্মের শেষে যেন প্রায় ডুবুডুব অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়া উঠিয়া আসিয়াছে উপরে : মাস্তুলে মোটা দড়ির গুন বাঁধিয়া পাড়ের কাদা, ঝোপ-জঙ্গল পার হইয়া চলা মাল্লাদের সে সম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। সেই সব মানুষের ঘন কালো দেহগুলি প্রখর রৌদ্রে যেন পাথরের মতো ঝলকাইয়াছে। মানুষের জীবন বদলাইবার জন্য ওই দিকমুখি হওয়া ছাড়া যেন আর কোনো গত্যন্তর নাই। আর, শিকদার অকস্মাৎ বেশ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করিল অন্যতর জীবনের আগ্রহ রহিয়াছে বলিয়াই জগৎ-সংসার চলিতেছে।

এক সময় ঘাট-মাস্টারের কথাও মনে পড়িল। তাহার এবং হোসেনের সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্তা বলিতে পারিলে শিকদার যেন অনেক শান্তি অনুভব করিত, একটা পথ পাইত, একটা অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত লওয়া সহজ হইয়া উঠিত।

বাড়ির পথে ফিরিতে ফিরিতে দেখিল একটা কড়ইগাছে অজস্র বাবুই পাখি বৈরি হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া করিয়া তাহাদের বাসাগুলির পরিচর্যা করিতেছে, এক বাড়ির গৃহিণী যত্ন করিয়া লতাইয়া দিতেছে সবজির লতা ঘরের জীর্ণ চালের উপর, কোথাও হইতে কানে ভাসিয়া আসিল ঢেঁকির শব্দ, কেউ কাক-চিল তাড়াইতেছে তাহাদের অঙ্গন হইতে। যেই দিকেই তাকাইল, জীবন কোনখানে স্তব্ধ হইয়া নাই; কোথায়ও কোনো কিছুই অসার কি অনিত্য বলিয়া মনে হইল না।

আমি তো অবলা নারী হইলাম অন্তঃপুরা
কূল ভাঙিলে নদীর জলে মধ্যে পড়ে
চড়া।
বসিয়া কাঁদে ফুলের ভ্রমর উড়িয়া কাঁদে
কাগা
শিশুকালের পিরিত হইল যৈবন কালে
দাগা ॥
সুজন চিনিয়া পিরিত করা বড়ো বিষম
ল্যাঠা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালো ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে
কাঁটা ॥
ঘরের বাহির হইতে নারি, কুলমানের
ভয়
পিঞ্জরা ছাড়িয়া মন যে বাতাসে উড়ায় ॥
কত করিয়া বুঝাই পঙ্খি না মানে সে
মানা
ভরা কলসি হইলরে বঁধু দিনে দিনে
উনা ॥

জোবেদা বাস্তবিকই আদৌ কোনো সুখের মুখ দেখে নাই। দেশের আরও অসংখ্য ঝি-এর মতো তাহারও যখন বিবাহ হইয়া গেল, কিশোরী তরুণীর নানা স্বপ্ন-কল্পনা লইয়া নিজ স্বামী সংসারের যে-আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, বাস্তবে তাহার কোনোই মিল পায় নাই। অথচ কোনো উপায় অথবা নিজ দুর্দশা হইতে মুক্তিরও সে কোনো পথ পাইতেছিল না।

শিকদারকে যখন মুহূর্তকালের জন্য গঞ্জের ঘাটে দেখিল, ইচ্ছা হইয়াছিল বটে অনেক কিছু, অজস্র কিছু তাহাকে বলে, কিন্তু পিছনে ছিল শাশুড়ি, তার স্বামী আসগরউল্লাও যে-কোনো মুহূর্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, সেই ভয়ে সে পর্দার উপর হইতে হাতখানি সরাইয়া লইয়াছিল। শিকদারকে আর দেখা গেল না বটে, কিন্তু সেও নতমুখ হইয়া রহিল।

শাশুড়ি-স্বামীর ইচ্ছা মতো ফকির-দরবেশ-ওঝাদের ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া অজস্র রকম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অপমান সহ্য করিয়া সে কেবলই একটা চরম মীমাংসার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। বিশেষ করিয়া যখন খেয়াল করিল যাহাদের নানারকম তুকতাকের উপর শাশুড়ি ও স্বামীর অগাধ বিশ্বাস, তাহাদের কাছেও সে যেন একটা মজার পুতুলে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের রীতি-নীতির বিষয়ে শাশুড়ির কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার আগেই সে জ্বলিয়া উঠিল : অলক্ষণীয়া বেলেহাজ মাগি এইসব রীতি-প্রকৃতির তুই কী বোঝস? একটা লবজ উচ্চারণ করলেও পাপে তাপে তোর জিহ্বা খসিয়া পড়বে। সন্তান চাই, বংশ জিয়াইয়া রাখতে হইবে। আমি অন্য কিছু বুঝি না। এইবারটা দেখিয়া লই, এবারও কিছু না হইলে মনের মতো বউ আনিয়া ঘরে উঠামু। তোরে লইয়া আমি একটা দিনেরও সুখ পাই নাই। পোলাটারেও আর ঘরমুখি রাখতে পারস নাই। চুপ চুপ। সবই তোর মানিয়া চলতে হইবে।

স্বামী আসগরউল্লার কাছেও কোনো কথা উঠাইবার সুযোগ হইল না। একান্ত নিজস্ব প্রয়োজন ছাড়া সে কখনও তাহার কাছে আসে না, কখনো কোনো কিছু বলেও না। মাঝে মধ্যে মনে হইয়াছে কখনও কোনো শব্দ তুলিতেও সে ভয় পায়; এই বিবাহটা যেন সে কেবল মা-কে খুশি রাখিবার জন্যই করিয়াছে, তাহাকে দেখাইবার জন্যই তাহার স্বামী-কর্তব্য করিবার চেষ্টা করিতেছে। জোবেদা তাহাকে কিছু বুঝাইতে গিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে, বরং আসগরউল্লাও অহেতুকভাবে তাহার উপর শাসন ও কর্তৃত্বের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতৃকুলের মধ্যেও তখন আর এমন কেউ ছিল না, যাহার কাছে আশ্রয় লইতে পারে। যাহারা ছিল, তাহাদের কাছে কিছু বলিলেও কেবলই শুনিতে হইয়াছে, পরের বাড়িতে মেয়েদের অমন একটু-আধটু অসুবিধা হয়ই; আরও বলে 'পর'-এর বাড়িকে আপন করিয়া লওয়ার মধ্যেই তো কৃতিত্ব, নারীজন্মের সাফল্য। বেশি খামখেয়ালি কি তেজ দেখাইয়া কোনো কন্যাই কখনও কোনো সংসার সুখের করিতে পারে নাই।

বিবাহিত জীবনের কয়েকটি বছরের মধ্যে সে চক্ষু তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়াও দেখে কেবলমাত্র একটা উদ্দেশ্যে তাহাদের ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোনো মূল্য নাই। আকাশে-বাতাসে কী যে আছে, পুঁই ডাঁটার মতো তরতরাইয়া বাড়িয়া উঠিবার আগেই সব নিয়ম সব আচার সব ব্যবস্থা যেন মট মট করিয়া ভাঙিয়া ফেলিতে উদগ্রীব সকলে। পিতৃকুল নানারকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়িয়া যায়, ঘরের কন্যাকে অধিককাল অবিবাহিতা রাখাও কাহারও পক্ষে সম্ভব হইয়া ওঠে না। জোবেদা তেজ দেখায় নাই, কোনো অনর্থ-অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে চায় নাই। কতকগুলি সহজাত বাস্তববুদ্ধি দিয়া সে শিকদারের প্রতিও উপেক্ষা দেখাইয়াছে। অথচ একমাত্র সেই শিকদারই জগৎ জীবন প্রকৃতি এবং নারী সম্বন্ধে কত বিমুগ্ধের মতো গীত-কথা শুনাইয়াছে। এক এক সময় নিরালা আমবাগান অথবা বাঁশঝাড়ের ধারে বসিয়া তাহার কথা শুনিতে শুনিতে কী এক আনন্দে, কী এক গর্বে ভরিয়া উঠিয়াছে বুক। সব কথা সে বুঝিত না, কিন্তু মনে হইত একটি কন্যার কামনা ব্যতীত তাহার মনে আর কোনো ধ্যান নাই, বাসনা নাই। আবার সেই কারণেই তাহার প্রতি একটা অবজ্ঞা আর উপেক্ষার ভাব ক্রমাগতই তাহার মনে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। সনাতন সংজ্ঞা যে পুরুষ ও পৌরুষের, তাহার সহিত কোনো মিল খুঁজিয়া পাইত না সেই শীর্ণদেহী স্বল্পভাষী লোকটির মধ্যে। জীবনের সঙ্গে সকলেই যখন যুদ্ধে যুদ্ধে পরিশ্রান্ত, ক্রমাগত সংগ্রাম ছাড়া যাহাদের মুখে আর কোনো বাণী নাই, কোনো আচরণের মধ্যে যাহারা কখনও পরাজয় অথবা হার মানিয়া যাওয়ার মনোভাব দেখায় না, সেইসব পুরুষের তুলনায় সে তাহাকে কখনও বড়ো করিয়া দেখিতে পারিত না; গুরুজনদের নানা বাক্য এবং পরামর্শ সে উপেক্ষাও করিতে সক্ষম হয় নাই। বিবাহ যখন স্থির হইয়া গেল, তখনও তাহার মনে আশা ছিল, শিকদার আসিয়া সব উলটাইয়া-পালটাইয়া দিবে। নানারকম রূপ-রস-কথায় তাহার পরিপূর্ণ দেহমন অন্য কোনো অবধারিত সত্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

এখনও পারে না। তবু ইচ্ছা হইয়াছিল, শিকদার আগাইয়া আসুক, বলুক তাহাকে কোনো কথা, কিংবা কোনো কথাও নয়, কেবল হাত বাড়াইয়া আহ্বান করুক তাহাকে, জোবেদা সব অগ্রাহ্য করিয়া তাহার সেই হাত আকর্ষণ করিয়া উঠিয়া যাইত। স্বাধীন স্বকীয় জীবন-যাপনের নামে সেই বন্দিনীদশা সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। মৃত্যু, একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত তাহার কাছে অন্য কোনো উদাহরণ পথ বর্তমান বলিয়া মনে করিতেছিল না।

কেমন সেই পুরুষ যে ভুবনকেও দেখে কোনো রজস্বলা রমণীর মতো, শীতে-গ্রীষ্মে, শরতে-হেমন্তে কেবলই তাহার কোনো বধূর বেশ, যাহার সারা দিনমান কামকলা ব্যতীত আর কোনো কর্ম নাই, অভীষ্ট নাই, সেই পুরুষকে জীবন যৌবন সমর্পণ করিতে কোন কন্যাই বা চাহিবে। জোবেদা কন্যা-স্বরূপ সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়া উঠিতেছিল যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসার বড়ো কঠিন ঠাঁই, সেইখানে ক্রমাগত পৌনঃপুণিক নিয়মের মধ্যেই হৃদয়াবেগকে শাসন করিয়া, সংযত করিয়া লইতে হইবে।

অথচ, আর পারতেছিল না।

শাশুড়ি বুঝাইতে চাহিল : আমি এই গৃহের কর্ত্রী। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আমার কর্তব্য আর শিক্ষার মধ্যে একটা সত্যই বড়ো। বউকে ফলবতী হইতে হইবে, পুত্রবতী হইতে হইবে। গৃহস্থের মঙ্গল, গৃহস্থের সুখ, তাহার সমৃদ্ধি কেবল সেই একটি উপায়েই চতুর্দিকে মেলিয়া ধরন যায়।

জোবেদা চেষ্টার ক্রটি করে নাই, অযাচিতা হইয়াও স্বামী সংসর্গ যাঞ্ঝা করিয়াছে, আসগরউল্লাহকে আর ঘন ঘন বাড়িতে আসিবার কলা কৌশল প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু জীবন বদলায় নাই।

এক সময় মনে হইয়াছে তাহার সমস্ত শৃঙ্গার সমস্ত আগ্রহ আসগরউল্লাহর কাছেও কোনো করুণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

অগত্যা, জোবেদা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, ক্রমাগত নিঝুম নির্বাক হইয়া উঠিতেছিল; সেই সময় সমস্ত ফেরেববাজ ওঝা-ফকিরের উপরেও সে আরও কঠিন কঠোর হইয়া উঠিল। তাহারা কখনও আভাসে-ইঙ্গিতে, কখনও জটিল দুর্বোধ্য ভাষায় আসগরউল্লা এবং তাহার মা-কে জানাইয়া দিতে চাহিল : কেবল সংসারে নয়, জীবনে দুর্ভিক্ষের জন্যই তাহার মতো রমণীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত রকম হেদায়েতের জন্য গোরুর দারোগাকে আরও দুইটি গোরু, ছাগলের দারোগাকে আরও পাঁচটি ছাগল, ধান-চাউলের দারোগাকে আরও দশ মন ধান, এবং ফি পুন্নিমায় তাহাদের মহফিলে হাজির থাকিয়া সমস্ত গুনাহগারির জন্য ক্রিয়া-কর্ম করিতে হইবে। শাশুড়ি এবং স্বামী দুইজনেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল; অবস্থা যতই ভালো হউক, সেই সাধ্য তাহাদের ছিল না; স্বয়ং জোবেদাও সমস্ত কিছুর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কেন এই জীবন রাখা, কী ইহার অর্থ? কী জিনিস সুখ-শান্তি? কীসের মূল্য এই জীবন যৌবনের যদি সমস্ত রকম কর্মকাণ্ডের প্রতি বাস্তবিক বোধোদয় না হইল? জোবেদা শিকদারকে কখনও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, সাধ্যও ছিল না; সে কেবলই গুমরাইয়া মরিতেছিল।

সেই প্রথম কৈশোরকালে একবার গুরুজনদের তিরস্কার শুনিয়া সে কেবলই একটা সমাধান খুঁজিয়া চাহিয়াছিল, কেন বিধাতা নর এবং নারীকে এমন পৃথক করিয়া সৃষ্টি করিলেন? তাবৎ জগৎ-সংসার যে কেবল পরস্পরের সৃষ্টির আগ্রহবশতই সর্বত্র ঘুরিয়া চলিতেছে, সেই বিশ্বাসকেও সে একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছিল না।

শাশুড়ি সেই একটা বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বুঝিত না, শুনিতেও চাহিত না। তাহার মতে বিশ্ব-ভুবনের সর্বত্র ওই একটি লীলাখেলাই সত্য তাহারই জন্য আজন্ম প্রস্তুতি, আমরণ কর্তব্য, বাহিরের যা-কিছু অসার, অনিত্য এবং মিথ্যা। জোবেদার মনের অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছিল সে মাঝে-মধ্যে পুকুর-ঘাটে সে নিজের নগ্ন অবয়বের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া নিজেকেই প্রশ্ন করিতে শুরু করিয়াছিল, কোনটা? বেশি সত্য, কোনটা? বাস্তবিকই তাহার রূপ-যৌবন, শ্রী অথবা হৃদয়, না তাহার শ্রীঅঙ্গ? জগৎ-সংসারে কোন মূল্যে কোন অস্তিত্বে সে সুখ শান্তি স্বস্তি বোধ করিবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনও চক্ষে পড়িত সম্মুখে ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে খেত-মাঠ, একটা কঠিন কঠোর আড়াল তুলিয়া আকাশও যেন রৌদ্রকে আরও রুদ্র করিয়া তুলিয়াছে, কোথাও হইতে ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক যেন কেবলই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাহিতেছে যে যদি মিথ্যা বলিয়া কিছু থাকে তাহা হইলে প্রকারান্তরে সত্যকেই স্বীকৃতি দিতে হইবে। জীবনের ইচ্ছা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, অতএব তাহার উদ্দীষ্ট এবং লভ্যও বর্তমান রহিয়াছে।

সেই রকম মনের অবস্থায় তাহার বারংবারই শিকদারের কথা মনে হয়। সেও যেন সারা জীবন ধরিয়া কী খুঁজিয়া চলিয়াছে, বলিতে চাহিয়াছে, অথচ তাহাদের দুর্লভ এবং ঘনিষ্ঠ ক্ষণগুলি কেবলই সাধারণ, অতি সাধারণ আলাপচারীর মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সে যেমন বলিতে পারে নাই, তরুণী কুমারী জোবেদার পক্ষেও উপলব্ধির সাধ্য হয় নাই।

এমন পুরুষ-পৌরুষ কি বাস্তবিকই আছে এই জগৎ সংসারে যে কোনো ললিত গলিত কাব্য কথার ধার ধারে না, হঠাৎ-জাগা বৈশাখের রুদ্র ঝঞ্ঝার মতো সে সমস্ত কিছুই লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে উন্মত্ত? আছে কি বাস্তবিকই তেমন কোনো রমণী যে পৃথিবীর মতোই সর্বংসহা, পৃথিবীর মতোই আকুলি-ব্যাকুলি অথবা ধৈর্যশীলা? মনে হয় শিকদার কেবলই জীবন আর পৃথিবীকে লইয়া কল্পনায় রূপারোপ করিয়াছে, যেমন চাহিয়াছে ঠিক তেমনটিই স্বপ্ন দেখিয়াছে, কখনও সাদামাটা বাস্তবকে সে গ্রাহ্যও করে নাই, আরও সম্ভবত ক্রমাগতই তাহার ধারণাও অতীতে রহিয়া গিয়াছে।

শাশুড়ি কখনও তাহাকে একান্তে অথবা ভাবনায় মগ্ন থাকিতে দেখিতে পারে না; সমস্ত দিক-দিগন্ত ঝমঝম করিয়া সে ধমকাইয়া ওঠে : মাইয়া-মানষের কোনো ধ্যানে বসনের নিয়ম নাই। সাধে কি আর চতুর্দিকে অমঙ্গল নামিয়া আসতে আছে? জন্ম দেওনের আগে বাপ-মা কি কোনো আদবলেহাজও শিখায় নাই?

অবশ্য সময় সময় তাহার বাক্য-বচন সমস্ত শালীনতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া যাইত, অবলীলায় ক্রমাগত তাহার মুখে উচ্চারিত হইত সেইসব কথা যাহার মধ্যে বারংবার একটা সত্যই যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিত যে সে স্বয়ং কোনো সুখ জীবনে পায় নাই। বড়ো মায়া লাগিত তাহার জন্য মাঝে-মধ্যে। অজস্র গালিবৃষ্টিও উপেক্ষা করিয়া সে খুশি করিবার জন্য ব্যস্ত হইত। আসগরউল্লার জন্যও সে আকুলি-ব্যাকুলি হইয়া অনেক কিছু করতে গিয়াছে। কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত; সে তাহাকে আরও বিধ্বস্ত করিবার জন্য উন্মত্ততা দেখাইয়াছে।

শাশুড়ি কেবলই নালিশ জানাইত কখনও পরোক্ষে, কখনও প্রত্যক্ষে : এই মাইয়া-মানুষ সহবত শেখে নাই, গুরু বুজর্গদের মান্য করিতে জানে না। নিয়ম করিয়া হেদায়েত করতে করতে হয়তো একদিন এর শুভবুদ্ধির উদয় হইবে। এর মধ্যে গোরুর দারোগাকে—

জোবেদাও দৃঢ় সংকল্প হইয়া উঠিতেছিল, কঠোরভাবে তাহাকে একদিন সেইসব দিনযাপনের ইতি টানিতে হইবে। একদিন সে নিশুতি রাত্রে নৌকা হইতে পাড়ের উপর উঠিয়া গেল।

তখন চতুর্দিকে ঘন অন্ধকার। উপরের আকাশে কতকগুলি তারা-নক্ষত্র যেন শৈশব-কৈশোরের বর্ণমালা দিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল। আকাশ সেই একই রকম, বাতাসেও যেন ভাসিয়া আসিল কোন অভয়। জোবেদা, কোনো দিক নির্দিষ্ট না করিয়াই জীবনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার কি আসিবারে মাঝি
এই ঘাটে নাও লইয়া
দিবস রাতি রইমু আমি
তোমার পন্থ চাইয়া।
আমি পল গুনিমু, পহর গুনিমু
গুনিমু দিনের পরও দিন
আমি আর কেশ না বান্ধিমু
নিন্দও না যাইমু
হইমুনা বসনে রঙিন
আমি কেমনে কাটাইব কাল
কইয়া যাও মোরে
তুষের অনলের লাহান পরান
ঘুষিয়া ঘুষিয়া পোড়ে।

আরও একটা দিন হোসেন থাকিয়া গেল বটে, কিন্তু মেহেরজানের তেমন আর কোনো উত্তর পাইল না; সে যেন আরও দূরে দূরে কোথাও নিজেকে গুটাইয়া রাখিয়াছে, সারা দিনমানে তাহার আর দেখা না পাইয়া অন্তত সান্ধ্যাহারের সময়ও কোথাও না কোথাও তাহার উপস্থিতি টের পাইবে আশা করিয়াছিল; একটু ইতস্তত করিয়া হোসেন মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াও থামিয়া গেল।

তাহার মা কেবলই বলিতেছিল : এত ছিদ্দত করিয়া আপন চোখেই তো দেখিয়া গেলা সব। আছি তো এই জঙ্গলের মধ্যে, আসমানে শকুন, বাইরে শিয়াল, এমনই ঘটনা দাঁড়াইয়াছে যে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। নানা কুলোকের চৌখ সবসময় চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখছে। কতজনে কত প্রস্তাব দেয়, আভাসে ইঙ্গিতে কী না বুঝাইতে চায়, আমরা ডরে মরি। এ কয়দিন তুমি আছিলা, কেউ তেমন সাহস করিয়া আউগায় নাই। এখন ভরসা কেবল আল্লার উপর। এই সব দেশে সেই বিশ্বাসটাকেই বড়ো করিয়া দেখন ছাড়া আমাগো আর গতিক নাই।

হোসেন সাধারণত আহারপ্রিয়; সাধ্যে যা কুলাইয়াছে তেমন কোনো ব্যঞ্জনের ত্রুটি ছিল না, কিন্তু সে তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করিল না।: নৌকা ঠিকঠাক করিয়া আসছি। শেষ রাত্তিরের জোয়ার লাগলেই ভাসিয়া পড়মু, কয়েকদিন আপনাগো উপর বড়ো উৎপাত করিয়া গেলাম।

ছবদারের স্ত্রী সেই কথা উড়াইয়া দিতে চাহিল : ছি, সেই কী কথা বাজান, কইছিলাম না তোমারে আল্লাহ জুটাইয়া দিছে। আমাগো বড়ো উপকার করিয়া গেলা। জাফর মন খারাপ করিয়া শুইয়া পড়ছে, ঘুমাইয়া পড়ছে না খাইয়াই। তোমারে কেন যাইতে বারণ করতে পারে নাই, সেই কথা লইয়া কী বচসা হইছে দুইজনে। বোধ করি মেহেরজানও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়ছে। এত দূরের পথে যাবা বাজান, এখন তুমিও সকাল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল একটু শুইয়া ঘুমাইয়া লও। আমার চোখে তো তেমন ঘুম আসে না, পুবের আসমানে হলক লাগতে না লাগতেই তোমারে উঠাইয়া দিমু।

: না চাচি, সেই সবের আর দরকার নাই। মাঝির কাম করি তো, এই যাত্রা করবার বিষয়টা কক্ষনোও তেমন কোনো আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। তায় জাফর উঠিয়া পড়লে আমারও যেন বৈঠায় হাত উঠবে না। আমি যাই চাচি, এখনই বিদায় লইয়া যাই।

জাফরের মা একটুকাল নীরব থাকিয়া বলিল : ছি বাজান, যাই কইতে নাই, বলো আসি। চিনিয়া জানিয়াই তো গেলা সব কিছু। ওই আশপাশের বাড়ির দুষ্টুলোকেরা চড়াও হইয়া পড়ার আগেই যেন আবার তোমার দেখা পাই, যদি নিজে আসতে নাই পারো, সংবাদ পাঠাতে ভুল করিও না।

জাফরের মা-ও এক সময় সরিয়া গেল বটে, কিছুক্ষণ পরে ঘরের মধ্যে তাহারও আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না; মনে হইল মেহেরজানকে দুই একটা কী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সেও শয্যায় গড়াইয়া পড়িয়াছে।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল প্রহর হইতে প্রহরে, কোথাও হইতে বুনা ফুলের উষ্ণতা, গন্ধ, অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল আরও ঘন হইয়া, মনে হইতে লাগিল বারংবারই যে তাহার সঙ্গে যেন মেহেরজানেরও দেহ সৌরভ ভাসিয়া রহিয়াছে, তা সে যতই দূরে দূরে থাকুক। নানারকম পুরাণ কথা শোনা মন, পরান কথার প্রত্যাশা করে। বীতনিদ্র শয্যায় সে কেবলই সতর্ক রহিল, এই বুঝি মেহেরজান কোনো সুযোগ পাইয়া কেঁওয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হয়তো তাহার বিপুল শরমজড়িত ভাবে হাতিনার পৈঠার উপরেও পা বাড়াইয়াছে। যদিও তেমন কিছুই ঘটিল না, কিন্তু হোসেন কেবলই ভাবিয়া চলিল যে তেমন হইলে হোসেনও এই যাত্রার জন্য আর কোনো ক্লেশ বোধ করিত না। মেহেরজানের সৌগন্ধভরা দেহটি হোসেন সর্বাঙ্গ দিয়া আপন করিয়া লইবে, তাহারও সব ভাবনা দূর করিয়া দিতে চাহিবে, আর মনে হইতে লাগিল যে জীবন-যুদ্ধের জন্য একটা শুভ উদ্দেশ্য চাই, প্রিয়জন পরিবৃত গৃহ সংসার না থাকিলে সেই যুদ্ধও ক্লান্তিকর হইয়া পড়ে, আর তাহাতে পরাজয়ের সম্ভাবনা যেন আরও অধিক হইয়া ওঠে। সে বাস্তবিকই অত্যন্ত আকুলভাবে মেহেরজানের সঙ্গে কিছু অন্তরঙ্গ সমঝোতার প্রত্যাশা করিতেছিল।

এক সময় পাখপাখালির কিচির-মিচির শোনা গেল উঠানের পাশের আম-জামের ডালপালার মধ্য হইতে। হোসেন পুবের দিকে মুখ বাড়াইয়া দেখিল উষার 'হলক' দেখা দিতেছে। ঘরের ভেজানো কেঁওয়ারের দিকে এক নজর তাকাইয়া হোসেন উঠানে নামিয়া যাইতে গিয়াও দাঁড়াইয়া পড়িল। হাতে একটা ছোটো পুঁটলি লইয়া ধীরপদে মেহেরজান নামিয়া আসিতেছিল। কয়েক পা কাছে আগাইয়া মুখের আঁচলের আড়াল হইতে মৃদুস্বরে কেবল বলিল : মা-য় সঙ্গে দেওনের জন্য তৈয়ার রাখছিল। কিন্তুক এখন যেমন ক্লান্তি লইয়া শুইয়া পড়ছে তাতে উঠাইতে মায়া হইল।

: তুমি, তুমি জাগিয়া ছিলা!

মেহেরজান সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না, হাতিনার খুঁটির কাছে আসিয়া পায়ের কাপড় আরও সংবৃত করিয়া লইল; তারপর মুখ নত করিয়া রহিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: আর তোমার দেখা পাইলাম না। একবার ভাবছিলাম ওই কাটা আঙুলটার বিষে কোনো জ্বর-জ্বারিও হইল বুঝি। এখন কেমন বোধ করতে আছ? কই, দেখি, দেখি।

মেহেরজান ব্যাকুলভাবে এইদিকে চাহিল : ছি, ছাড়েন আমার হাত, তেমন কিছু হয় নাই, কোনো উদ্বেগ নাই।—মৃগশিশু যেমন কোনো উদ্যত পশুর কবল হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, প্রায় সেই একইভাবে সে প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া অনুনয় জানাইল : আপনে এমন অবুঝ হইয়েন না। এমনিতেই আমাগো তেলেসমাতির শেষ নাই। আপনে যে কী চায়েন তা আমি বুঝি। কিন্তু আমার হাত-পাও বাঁধা, আমার কোনো উপায় নাই। যায়েন আপনে, সুমায় মতো নিজের কামে রওয়ানা হইয়ে যায়েন। যদি পারেন আবার আসিয়েন, পথ তো চিনিয়া গেলেন, আমার ঠিকানা বদল হইবে না।

তাহার শেষ কথাগুলির মধ্যে যেন একটা প্রত্যয় অথবা আশ্বাসের সুর বাজিয়া উঠিল হোসেনের কানে। সে কিছুক্ষণ মেহেরজানকে বিহ্বলভাবে নিরক্ষীণ করিল।

: তুমি চাও আমি ফিরিয়া আসি?

মেহেরজান কোনো উত্তর দিল না ঘাড় ফিরাইয়া ঘরের কেঁওয়ারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে তাড়াতাড়ি বলিল : পোলাপানের লাহান কথা জিগাস করিয়েন না। আর আমার উপর রাগও রাখিয়েন না। আরও বলি, এখন বড়ো বায়-বাতাস আর দেয়ই-বাদলের কাল। নৌকা লইয়া সাবধানে যাইবেন। বাজানের কাছে শুনছি, ওই দিকের গাঙে বড়ো বড়ো 'ঘোলা' আছে, হুঁশিয়ার থাকিয়া চলবেন।

হোসেন দৃষ্টি নামাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; এত কথা ছিল বুকে, কিন্তু অকস্মাৎ মুখে যেন কিছুই আসিল না পা-ও উঠিল না।

মেহেরজান একটু ইতস্তত করিয়া বলিল : নিয়ত করিয়া নামছেন, এখন আর পিছন ফিরতে নাই। হলক উঠিয়া আসছে, সকলে জাগিয়াও পড়বে, আপনের রওয়ানা হইতে আরও দেরি হইয়া যাইবে। চলেন, আপনেরে আমিই ঘাট পর্যন্ত আউগাইয়া দিয়া আসি। আশা করি, এর মধ্যে কোনো বাঘ আমারে ধরিয়া খাইবে না।

হোসেন শশব্যস্তভাবে মানা করিল : না, না, ঘাট অবধি তোমারে যাইতে হইবে না। তুমি যাও, ঘরে ঘুমাও গিয়া, মনে কয় তুমিও বোধ করি সারা রাত্তির একেবারেই ঘুমাও নাই। সকলের কাছে তুমিই আমার হইয়া বিদায় চাইও।

তবু কথা থাকিয়া যায়, কত বিষয় এমনকী আদনা কত কি জিনিসও একই সঙ্গে মনের মধ্যে গুমরাইয়া দুমড়াইয়া ওঠে, যে হন্যে কুকুরটা সেই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, যে কবুতরগুলি ঘরের চালের কোণায় কোণায় বকবকম করে যখন-তখন, যে ফড়িংগুলি কলমিফুলে লেজ দুলাইয়া দুলাইয়া প্রতি সকালের রীত-কৃত্য করে, যে গাছগুলি উঠানের ধারে মর্মর করিয়া ওঠে মধ্যাহ্নের বাতাসে, সমস্ত কিছুর সঙ্গেই এমন আত্মীয়তা হোসেন জীবনে আর কখনও বোধ করে নাই।

: মেহের।—প্রায় ধরা গলায় হোসেন আবারও কিছু বলিতে চাহিল : আমার এক বন্ধু আছে, কানু শিকদার তার নাম, কবিয়াল নামেই প্রায় ভুবনজোড়া তার খ্যাতি। সে কেবলই কয়, জীবন বড়ো সুন্দর, আর কেবলই মায়ায়-ভালোবাসায় বাঁধা। আমি তার মতো করিয়া বলতে পারমু না অবশ্য, তবু বলি, সেই বন্ধনে যেমন সুখ আছে আবার কষ্টও আছে। তার সঙ্গে একটা পরামর্শ আমার জরুরি কর্তব্য হইয়া পড়ছে। কয়েকটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেপ দিয়া কিছু রোজগার করতে হইবে সমূহ। তারপর, দেখবা এমন হইতে পারে তারে সাথে করিয়াই আবার তোমাগো এই মুলুকে আসিয়া হাজির হইছি। তুমি আর আসিও না। এইখান হইতেই হাসিমুখে বিদায় দেও।

মেহেরজান কাছাকাছি একটা বড়ো গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল হোসেন আর কাল বিলম্ব না করিয়া নৌকার বৈঠা হাতে তুলিয়া লইয়াছে। দাঁতে আঁচল চাপিয়া সে যতক্ষণ তাহাকে এবং তাহার নৌকাটিকে দেখা যায় নিথরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিল। হোসেন এবং তাহার সেই ক্ষুদ্র নৌকাখানি দৃষ্টির অন্তর্হিত হইয়া যাইবার পরও সেই গাছটির গুড়ির উপর ভর করিয়া বেশ কিছুক্ষণ নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় নিকট হইতে কাহারো গলা-খাঁকারির আওয়াজ পাওয়া গেল। মেহেরজান চমকিয়া দেখিল একটা ঝাড়-ঝোপের আড়াল হইতে প্রতিবেশী বসতির কালু গাজি বাহির হইয়া আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইতে ব্যস্ত হইল।

: শোনো মাইয়া।—কালু গাজি একরকম তাহার পথের উপরই নামিয়া আসিল : সব জিনিসই যার যার, খেয়াল-খুশি কিংবা ইচ্ছার উপর চলে না। কতকগুলি বিধি-বিধান মানিয়া চলতে হয় দশজনের মধ্যে থাকতে গেলে। এই যে ওই বেগানা লোকটা এতদিন তোমাগো বাড়িতে থাকিয়া গেল, তুমিও যে এখন তার জন্য এমন হাপুস-উপাস হইয়া পড়তে শুরু করেছ, এইটা দশজন জানলে যে কেলেঙ্কারির সীমা থাকবে না।

মেহেরজান কিছু বলিতে চাহিল। কিন্তু কালু গাজির দৃষ্টি লক্ষ করিয়া আবারও কাঁপিয়া উঠিল, তবু কথা গুছাইবার চেষ্টা করিল : ছি চাচা, অন্যায় তো কিছু করি নাই, কেবল পথের খাওয়নের পোঁটলাটা হাতে তুলিয়া দিতে নামিয়া আসছিলাম।

কালু গাজি সেইসব কথার প্রতি কোনো আগ্রহই দেখাইল না; মুখে একটা সহানুভূতিসূচক চুকচুক শব্দ তুলিয়া ধীরস্বরে বলিল : তোমরা যেন ইচ্ছা করিয়াই নিজেগো উপর একটার পর একটা মুসিবত ডাকিয়া লইতে আছ। ছবদারও আমার কোনো পরামর্শ কানে তোলে নাই। আমরা এমন ধারে থাকতে কোন দূর-মুলুকে উঠাইয়া দিলো তোমারে। আইজও তক সেই বুড়ার হাত ছাড়িয়া নিষ্কৃতি পাও নাই। এখন এইসব জানাজানি হইলে যে তার খাঁই আরও বাড়িয়া যাইতে পারে সেই খেয়াল আছে? এখন যদি ঝোপ বুঝিয়া কোপ দিতে চায়, তালাকের দুই তিন কী চার গুণ বাড়াইয়া দেয় তা হইলে উপায়টা কী হইবে, এ?

মেহেরজান ঘরে উঠিয়া যাইবার পথ খুঁজিল; আবারও মৃদুকণ্ঠে জানাইল : কোনো অন্যায় করি নাই, কেউ কিচ্ছু দেখে নাই!

কালু গাজি চক্ষু ছোটো করিয়া হাসিতে চাহিল : কেন, আমিও কী এমন মিথ্যা হইয়া গেলাম? আমি চোখ রাখতে আছিলাম, সবই দেখছি-বুঝছি, এখন যেমন করিয়া সব সামাল দেওন যাইবে সেই বিবেচনা তোমার বুদ্ধির উপরই ছাড়িয়া দিলাম। তোমার কেবল নিজের কথা ভাবলেই তো চলবে না। মা আছে, কাঁচা একটা ভাই আছে।

মেহেরজান একটু শক্ত হইয়া কালু গাজির দিকে একবার দৃষ্টি লইয়া বুলাইল; দেখিল সে যেন সাহস পাইয়া কোনো অনেকদিনের আশা লইয়া তাহার আরও ঘনিষ্ঠ চলিয়া আসিতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: ছি চাচা, এইসব কথা উঠাইয়া আপনার কী লাভ আছে? আপনার বাড়-বাড়ন্ত ঘর-পরিবার আছে। ছোটোকাল হইতে আপনেরে তমিজ করিয়া চলতে তো আমি কোনো ভুল করি নাই।

কালু গাজি হাতের দা-এর ডগা দিয়া কিছুক্ষণ মাথার পিছন দিকটা চুলকাইল; তারপর তেরছা দৃষ্টিতে মেহেরজানের দিকে তাকাইয়া চাহিল : হ, দেখছি তো আমিও তোমারে সেই ল্যাংটাকাল হইতে, তবে এখন যে এমন ঐশ্বর্যে ভরিয়া উঠবা তা কখনও ভাবি নাই। দেখলা তো একজন দুইজন জগৎজন। আমার সঙ্গেও একটা সমঝোতা করিয়া লইলে এমন কী আর ক্ষতিটা হইবে, এ তবধ করো, তবধ করিয়া দেখিও।

সম্ভবত উঠানের দিকে তাহার মা-এর সাড়া পাইয়াই কালু গাজি তখনকার মতো সরিয়া গেল। মেহেরজানের ইচ্ছা হইল তাহার হাতের দা-খানি ছিনাইয়া লইয়া সে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে; কিন্তু হাতে কোনো শক্তি অনুভব করিল না আর, মুখেও কোনো কথা জোগাইল না।

বঁধু, বিধির দেখা পাইলে তাহারে শুধাইও
এমন অবলা জন্ম কেন সে কপালে লিখিল?
গৃহের শোভা যৈবতী, তারও শোভা পতি
দেশের শোভা নর ও নারী, বসত ও বসতি
নদীর শোভা নৌকার বহর, খেতের শোভা ধান
আমি কেন খোয়াইলাম সকল জাতি কুল মান?
পরান-পঙ্খি বন্দী হইয়া আছে অন্তরাল
সেইদিকে যাই শাসন লইয়া যৈবন ও আকাল
শয়নে-স্বপনে তুষের আগুনে অন্তর উথলায়
বাসনা কুসুম-কেশর হইয়া শুখাইয়া যায়
বিধির দেখা পাইলে তুমি তাহারে শুধাইও
এমন বন্দিনী করিয়া সে কেন এ যৈবন গড়িল?

শিকদার নলসিঁড়ির ঘাটে গিয়াছিল হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাতের আশায়, সেই সঙ্গে ঘাট-মাস্টারের সাক্ষাতের ইচ্ছাটাও ছিল প্রবল। তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া চতুর্দিকের ভুবনের উপর সন্দেহ দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে শিকদার বাড়ির পথ ধরিয়াছিল। কিন্তু আপন-বাড়িতে উপস্থিত হইয়া সে চমকিয়া গেল।

তখন পড়ন্ত বেলা। খাল পার হইতে বাড়ির সংকীর্ণ পথটুকুতে নামিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল হয়তো বা হতশ্রী গৃহ-পরিবেশে আবারও সমস্ত উৎসাহ-সংকল্প নিভিয়া যাইবে। অথচ চক্ষু তুলিয়া দেখে সম্মুখের উঠান ছিমছাম, ঘরের হাতিনাটাও কেমন ঝকঝক করিতেছে। একটু বিস্ময় লইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া মনে হইল হয় কেউ অতি যত্নে সব কিছু গুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়াছে, অথবা আপাতত এই নিবাস ছাড়িয়া অন্যখানে যাইবার সংকল্পেই উলটা একটা মায়া-মমতাই তাহার দৃষ্টিতে রং মাখাইয়া দিতেছে। কিন্তু ঘরে যেন কাহারও সাড়া, উনুনের দিক হইতেও ধোঁয়া ছড়াইতেছে। মনে মনে একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবিল, কী তাজ্জব, হোসেনই ঝাঁট-পাট লাগাইতেছে নাকি? সে তো কখনও সেই রকম কিছু করে নাই। পরক্ষণে ঘরে ঢুকিয়া শিকদার অবাক হইয়া গেল। একহাতে একটা খুঁটি ধরিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, সাধের দোতারাটাও হেলায়-ফেলায় নামাইয়া দিল পাশে, নিজের চক্ষুকেও যেন তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না।

ইতিমধ্যে পাশের পাক-ঘরের খাটাল হইতে রন্ধনরতা অবস্থায় পিছনে সাড়া পাইয়া সে ফিরিয়া তাকাইয়াছে, মাথার ঘোমটা খসিয়া পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি তা উঠাইয়া সে একধারে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সে শিকদারের পায়ের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। শিকদার যেন তখনও পুরোপুরি সম্বিৎ ফিরিয়া পায় নাই, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, জোবেদা না অন্য কেউ, তাহাকে স্পর্শ ঠিক হইবে কি হইবে না। এমনও মনে হইল কাব্যকথার রূপ দিয়া জীবনকে দেখিতে দেখিতে সে যেন তাহার একান্ত বাস্তবতার সীমারেখায়ও আর খেয়াল রাখে নাই।

এক সময় সে কেবল অস্ফুট প্রশ্নে যাচাই করিয়া লইতে চাহিল : তুমি জোবেদা? জোবু? এমন তো আমি স্বপ্নেও দেখি নাই।

জোবেদা ধরা গলায় বলিল : আমারে মাফ করো।

শিকদার তাহাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিল : কীসের মাফ? কেন মাফ? তুমি কখন আইলা? কার সঙ্গে আইছ?

জোবেদা শাড়ির আঁচলে নাক মুছিয়া বলিল : কেউর সঙ্গে না, আমি একলাই চলিয়া আইছি। তারা আমারে খেদাইয়া দিছে, আমিও আর কোনো কূল পাই নাই। মনে কইল একমাত্র তোমার কাছেই আমার হয়তো কিছু মূল্য আছে। এই দেখো—জোবেদা পিছন ফিরিয়া পিঠের কাপড় সরাইয়া দেখাইল, পিঠে অজস্র আঘাতের চিহ্ন কালো কালো দাগ লইয়া ফুলিয়া রহিয়াছে : গলায় দড়ি দিতে গেছিলাম সব জ্বালা জুড়াইতে। দড়ি লইয়া গাছের ডালে বাঁধিতে গিয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল তোমার কথা, সেই ছোটোকালে তুমি কোথায় হইতে এই দড়ি, এই তক্তা যোগার করিয়া দোলনা বাঁধিয়া দিতা। আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইত না, হাওয়ায় উড়িয়া যাইত গায়ের বসন, গুরুজনের শাসনও যেন কেউরই কানে আসিয়া পৌঁছিত না। তারই কাছে আছিল একটা হিজল ফুলের গাছ। তার লাল লাল ফুলগুলান পুকুরের পানির উপর হাওয়ার গতির সঙ্গে ঘুরিয়া ভাসিয়া বেড়াইত। তুমি কখনও কখনও কোঁচড় ভরিয়া একগোছা সেই ফুল আমার সামনে উজার করিয়া দিতা। আমিও সেই ফুলের লাহান উড়িয়া ভাসিয়া ছড়াইয়া পড়তে চাইতাম। তোমার সেই জোবেদা, আমি যেন লোহার শিকলেই এই এতগুলান বচ্ছর বাঁধা পড়িয়া আছিলাম। মুক্তি খুঁজিয়া আমি তোমার কাছেই আইলাম।

শিকদার একধারে বসিয়া পড়িল, হাত তুলিয়া বলিল : সবুর জোবু, একটু ধীরে ধীরে সব খুলিয়া বলো। আমি অবুঝদার বোকাসোকা মানুষ, এখন যেন আরও সব জট পাকাইয়া যাইতে আছে।

জোবেদা চক্ষু মুছিয়া বলিল : মাপ তো চাইলাম! তোমারেই এই নিদান কালের পুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়া তোমার কাছে আইলাম। মনে তো কয় একদিন তুমি আমারে চাইছিলা। এই লও, এখন আমি তোমার। দেশের মানুষ, তামাম দুনিয়ার মানুষ কয় আমার অভাবে, আমার জন্যই তোমার জীবন এমন শূন্য, এমন বিরান হইয়া গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইজ আমিই আসছি! আমারে আর পায়ে ঠেলিয়া দিও না। তুমি আবার আমারে সব নতুন করিয়া সাজাইতে দেও। তুমি সেই কোন ছোটোকাল হইতে আমারে কত কন্যার কাহিনি শুনাইছ, আর আমিও স্বপ্ন দেখছি এক পুরুষের, যদি কোথাও কেউ না-ই থাকে তবে সেই পুরুষ তুমি হও। আমারে উদ্ধার করো। শিকদার এক সময় মাটির দিক হইতে চক্ষু তুলিয়া জানিতে চাহিল : নিজ বাড়িতে, বলি ভাই-এর বাড়িতে গেছিলা?

জোবেদা মাথা নাড়িল : হ, গেছিলাম। সে কোন মুলুকে গেছে কড়ির যোগাড়ে। তার বউ আর একপাল বাচ্চা-কাচ্চার মধ্যে আমি আর কোনো দিক দিশা না পাইয়াই তোমার কাছে চলিয়া আইলাম।

শিকদার চঞ্চলভাবে বারান্দায় নামিয়া আবারও উঠিয়া আসিল : এমন বুদ্ধিমতী মাইয়া হইয়াও কাজটা তুমি ঠিক করো নাই জোবু, কাজটা ভালো করো নাই। সংসার খেলা কোনো মিছামিছি বিষয় না। ইচ্ছা মতোন সব কিছু করণ যায় না? এখন যে ছি ছি ধিকারে দেশ ভরিয়া যাইবে। আমি সকল বিবাদ-বিসম্বাদ এড়াইয়া এমন আপন একান্তে পড়িয়া রইছি, জগৎ-সংসারের বিচারে আমি অক্ষম-অধম, দীন-দরিদ্র, যতই মাথা উচাইতে চাই, দেখি, আমার কোনো সাধ্য নাই, কোনো সামর্থ্য নাই। জগৎ-সংসার কতকগুলি নিয়মের মধ্যে ঘুরপাক খাইতে আছে। পুকুরের মাছ, গাছের ফল, ঘরের কন্যা যতই সরেস হউক, তার উপর দীন-হীনের কোনো অধিকার নাই। তোমারেও আইজ আমিই মাফ করিয়া দিবার কোনো অধিকার রাখি না। অবুঝ হইও না, আমার তো মনে কয় তোমার ভাই-এর বাড়িতে থাকাটাই ঠিক হইত। তুমি ভুল বুঝিও না, আমি কতদিন তোমারে এমন কাছে দেখি নাই, খুশি-অখুশির কথা না জোবু, মনে কয় কাজটা বড়ো কাঁচা হইয়া আছে।

: হায়রে পুরুষ!—জোবেদা মুখ ফিরাইয়া লইল : আপন প্রয়োজনেও তুমি যে কেন নিজের দাবি ছিনাইয়া লইতে জানলা না, সেই কথা ভাবিয়াও আমি অবাক হইয়া যাই। কোন অধিকারে কোন কন্যার স্বপ্ন দেখো তুমি যদি এমন অত্যাচারের মুখেও রুখিয়া খাড়াইতে না পারো? কী সেই গীত-কথা কাব্যের মূল্য যদি আসল জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক না থাকে? ঠিক আছে, আমার কোনো ভাবনাই আর তোমার করিতে হইবে না। শিকদার লক্ষ করিল জোবেদা আবারও কোনো অজ্ঞাতের দিকে পা বাড়াইবার উপক্রম করিতেছে; একটু ইতস্তত করিয়া সে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

জোবেদা কাঁধের উপর দিয়া সরাসরি তাহার দিকে তাকাইল। সেই দুই চক্ষু যাহার সহিত একদিন শিকদার নীলকমলের তুলনা দিয়াছে, সেই দুই-ঠোঁট যাহার সঙ্গে সে পাকা লঙ্কার উপমা খুঁজিয়াছিল, কণ্ঠের নীচে সেই কাঁপন যাহার মধ্যে সে নিজের হৃৎকম্পনের অভিব্যক্তি দেখিতে চাহিয়াছিল; দৃষ্টি সরাইয়া সে কেবল বলিল : আবারও কোনো হঠকারিতা করিও না। এখন সাঁঝের আন্ধার নামিয়া আসিতে আছে। এখন কোন বেঘোর বেদিশার মধ্যে পড়িয়া যাবা। না হয় কাইল ভোরই ভাই-এর বাড়িতে চলিয়া গেলা। ইতিমধ্যে সব বিষয় একটু ভালোভাবে বুঝ-সুঝ কী বিবেচনা করণ যাইবে। এত পরিচিত দুইটি মানুষ পরস্পরের এমন কাছাকাছি হইয়াও দূরে দূরে সরিয়া গেল আবারও।

শিকদার হাতিনায় বসিয়া রহিল স্তব্ধভাবে। কয়েকবারই ইচ্ছা হইল জোবেদা আরও কিছু বলুক তাহাকে, কেমন করিয়া এই দীর্ঘ বৎসরগুলি কাটাইয়াছে, একরকম নিজ হইতে নির্বাচন করা একটা মানুষকে সে-ই অকস্মাৎ খারিজ করিয়া দিয়া আসিয়াছে, না সে-ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো আপন সুবিধার জন্য তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। সে কয়েকবার ঘরের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া জোবেদাকে উদ্দীষ্ট করিতে চাহিল, কিন্তু তাহার আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ইচ্ছা করিতে লাগিল সেও জোবেদাকে বলে এই পাঁচ-পাঁচটি বৎসর সে কী দুঃসহ অবস্থার মধ্যে দিয়া কাটাইয়া চলিতেছে। অন্য সকলে যখন তাহাদের ঘর-সংসার কর্ম লইয়া ব্যস্ত, শিকদারের বুকের মধ্যে কেবলই যেন জ্বলিয়া চলিয়াছে তুষের অনল, কোনো কর্মে, কোনো ধর্মে সে আর উৎসাহ বোধ করে নাই। আকাশে বর্ষার মেঘ পাকাইয়া গুরু গুরু ডাকে ধাইয়া গিয়াছে কত উৎসব কত কর্মের আহ্বান জানাইয়া, সে তবু নিঃশব্দ গৃহে ততধিক মেঘভার মনে লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। খেত পড়িয়া রহিয়াছে, সে কর্মে নামে নাই, বীজবপনে উৎসাহ বোধ করে নাই; শরৎকালে আর ডোঙা লইয়া বিলের মাছ কিংবা শাপলা তুলিয়া আনারও আগ্রহ দেখাই নাই; হেমন্তে সোনার ধান ভরে নাই তাহারও উটান, কেন না তাহার গৃহে সে নাই, যে-গৃহিণী তার ঝাড়িয়া তুষ উড়াইয়া বাছিয়া, সিদ্ধ করিয়া নবান্নের উৎসবকে সার্থক করিয়া তুলিবে, ওই উঠানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছড়াইয়া শুকাইয়া গোলা ভরিয়া রাখিবে, ভুবন ভরা এত শ্রীর মধ্যে তাহাদেরও একটি খণ্ডশ্রী উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। শীতে সেও তো পারিত গাছে গাছে উঠিয়া পাটালিগুড়ের উপাদান সংগ্রহ করিতে, সন্ধ্যায় চুলাশালের পাশে বসিয়া সেই গুড়ের ভিয়ান দিতে দেখিয়া তাহারও বুক গর্বে-আনন্দে ভরিয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু শিকদার কিছুই বলিল না, কেবল জোবেদার অভাবেই যে এতগুলি বৎসর এই রকমই নিষ্ফলা হইয়া রহিয়াছে সে সম্বন্ধে সে নিজেও হয়তো নিশ্চিত ছিল না! অথচ, তবু ইচ্ছা করিতে লাগিল জোবেদার কাছে উঠিয়া গিয়া ধীরে ধীরে বলে : আমারে ভুল বুঝিও না জোবু। তোমার উপর এমন অত্যাচারের জ্বালা আমি কি নিজেও টের পাইতে আছি না। পুরস্কারের কথা কও, একবার চৌখ মেলিয়া দেখো জগৎ-সংসারের দিকে কত কন্যা এমন দুর্দশার মধ্যে খাবি খাইয়াও কুল পাইতে আছে না। ওই পুরস্কারের আর-এক রেওয়াজ এর উপরে তার, এই জিনিসের উপরে সেই জিনিসের দাবি নির্দিষ্ট করিয়া দেওন। আমার কি সাধ ছিল না। এখনও কি নাই? আইজ যখন বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলাম মনে কইল সব দিক যেন উজালা হইয়া উঠছে। ওই যে তুমি যেমনভাবে কাজে ব্যস্ত আছিলা পাকের ঘরে, কীসের একটা বিভায় যেন কেবল চুলার আগুন না, তোমার মুখ-চৌখও রাঙিয়া উঠছিল, তার আলোক হলকে আমি আশ্চর্য বোধ করলাম, মুগ্ধ হইয়া গেলাম, মনে হইল, এই মধ্যখানের এতগুলান বচ্ছর যেন একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু না। আমি কাব্য লইয়া মজিয়া আছি, এখনও তক স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক দেখি নাই, কেবল মনে করছি আমার ধ্যান লইয়া, হ, এইরকমই তো হইবে, কিন্তুক বাস্তবে তেমন হয় নাই, বোধ করি কখনও হয় না। তবু, যেমন উচিত তেমন ঘটাইবার, সেইরকম একটা স্বপ্ন মনে জিয়াইয়া রাখন যেন আমার জীবনের একটা না-লেখা দলিল হইয়া রইছে। আমার চিন্তায় ভাবনায় এই মস্তিষ্কে এই দেহের প্রত্যেকটি রক্তের বিন্দুতে প্রত্যেকটি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে বুকের কাঁপনে আমি টের পাই আমার মধ্যে অনেক যুগের মানুষের ব্যথা-বেদনা দুঃখ কষ্ট আনন্দ যেন একটা মুক্তি, একটা ব্যাপ্তি খুঁজতে আছে। কিন্তু জোবু, আমি তারে কোনো রূপ দিতে পারি না। এখন, এই এতকাল পরে আমার খেয়াল হইতে আছে আমি জীবনের কথা কইছি, প্রেম-প্রীতি ভালেবাসার কথা কইছি কোনো একটা পোষা তোতা পঙ্খির লাহান কতকগুলি শিখানো কথা আউড়াইয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা আমার মন-মস্তিষ্ক-হৃদয়, এই শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে উচ্চারিত হয় নাই। যা কিছু করিয়া চলিয়াছি তা যেন কেবল নিজেরই প্রতিষ্ঠার জন্য, আনন্দের নামে কী দিতে আছি মানুষেরে তা কী জিনিস, বিষ না মধু? এক একবার আমার নিজেরও মনে হইছে আমিও যেন ওই হাট-বাজারের ভুয়া ধন্বন্তরি ওঝার লাহান কেউ, যেন একটা ফাঁকি একটা ধাপ্পার উপর নিজের ভালাই-গুছাইয়া লওনের পেশায় নামছি। না, জোবু, আমার মন ভরে নাই। ভালোবাসার গীত গাই, অথচ জানি না কেমন সেই ভালোবাসা, জীবনের কথা কই, কই জগৎ-সংসারের কথা, কিন্তুক কতটুকু তার জানি? কেমনই বা ঈশ্বর, কী এ জীবনের আদত লক্ষ্য এই সব ভাবনা-চিন্তায় কক্ষনো কূল পাইতে আছি না। কেনই বা এই সুন্দর ভুবনে এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত অভাব তার একটা মীমাংসা না পাইলে আমি যেন কোথায় দিয়া কী শুরু করমু তা বুঝিয়া উঠতে পারতে আছি না। এমন তো আমি ছিলাম না, তবু কেন এমন হইলাম।

কিন্তু সেই সব কোনো কথাই শিকদার বিশেষ গুছাইয়া বলিতে পারিল না। আরও বলিতে চাহিয়াছিল : এখন আমার মন-প্রাণ কী চায় জানো জোবু, একজন সাধারণ খুবই সাধারণ গৃহস্থ হইতে। তুমি বারবার আমারে দেখতে চাইছ খুব বড়ো কেউ হইতে, গণ্যমান্য হইতে, কেচ্ছা-কাহিনির নায়কের লাহান হইতে, কিন্তুক এখন দিনে দিনে বুঝিয়া উঠিতে আছি সেইসব কিছুই আর আমার মন টানতে আছে না; মন কেবলই কইতে আছে, কেউ না আমি নগণ্য হইতে চাই, যেন তা হইলেই সকল প্রীতির সোয়াদ পাওয়া যাইবে। তুমি তো জানোই আমার কোনো লোভ নাই। কোনো উচ্চাশা করি নাই, এখনও নাই। এই যে তুমি এতকাল পরে এমন করিয়া আসলা, এখন কী করিয়া যে সব সুসার করি চিন্তা করতে গিয়া আমি যেন আরও আউল-বাউল হইয়া পড়তে আছি।

সেই সমস্ত কথার অর্ধেকই হয়তো শিকদারের মুখে ভাষাও পাইল না। জোবেদাকে দেখিল হাতিনার একধারে বসিয়া একটা জোনাক জ্বলা ডালিমগাছের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, মুখ ফিরাইয়া একবার শিকদারকে লক্ষ করিয়া আরও যেন কী খুঁজিল তাহার মধ্যে, তারপর নিজ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল।

একটুকাল ইতস্তত করিয়া সহজ হইতে চাহিল শিকদার : ওই দেখো, জীবনের যেইদিকে তাকাইছি কেবলই যেন চৌখে পড়ছে রীত-প্রকৃত-প্রীতের কথা। কিন্তুক এখন কী মনে হইতে আছে জানো? ওই দুই জোনাক-জোনাকির একত্র হওনের মধ্যে আরও কোনো গভীর তত্ত্ব আছে। দেহ-মনের ক্ষুধার কি অন্ত আছে। কীট-পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ারের জগতে একে যেন অন্যকে ধ্বংস না করিয়া ক্ষান্ত হয় না, তৃপ্ত হয় না। কিন্তুক মানুষের সমাজে নিশ্চয়ই তা হইতে পারে না। এমন সুন্দর ভুবন সৃষ্টিকর্তা যেন আরও কোনো বড়ো ভালোবাসার জন্য বিছাইয়া রাখছে। কিছুকাল ধরিয়া আমি কেবলই তা তবধ করার চেষ্টায় আছি। জানো, টের পাই, এখন আমার গীত-গানের ধারা, তার রকম-সকম বদলাইয়া যাইতে শুরু করছে।

জোবেদা সেই একইভাবে বসিয়া থাকিয়া তাহার দিকে আরও একবার চক্ষু বুলাইয়া লইল।

: সমস্ত সৃষ্টিটাই তো একখান গীত-এর লাহান। যেন কোনো বড়ো, এমন বড়ো যার ধারণাও আমরা করতে পারি না,—সেই রকম কেউর সৃষ্টি। কত রকম সুর-স্বর কত রঙ্গ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলা-লীলা তার মধ্যে। আবার তারই মধ্যে এক একজনের ভুবন, তার আপন আপন গীত-কথা। কিন্তুক যার জীবনে তা নাই, কী কারণে তা নাই তার একটা বুঝ না পাইয়া স্বস্তি পাইতে আছি না। আমার গীত-গান দিয়া এই অপ্রীতির কষ্ট ঘুচাইবার ইচ্ছা জাগতে আছে। মনে কয় আমার লাহান কবির কাম হইবে সেইসব কারণগুলানের মীমাংসা ধরাইয়া দেওয়া। এত সুন্দর ভুবনের মধ্যে কোথায় অন্যায় আছে, কোথায় অসত্য, কোথায় অসুন্দর দৌরাত্ম্যে করতে আছে তা ঠিক ঠিক দেখাইয়া দিতে না পারলে এই সমস্ত গীত-গানেরও কোনো অর্থ হইবে না। কবির কাজ তো ম্যাজিক দেখানো না জোবু, তাতে সত্য দেখাইতে হয়, সুন্দরের দিকে আকৃষ্ট করতে হয়।

জোবেদা উঠানের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শিকদারকে দেখিতেছিল, দুই হাতের জোড়ে বাঁধা হাঁটুর উপর মাথা কাত করিয়া। এক সময় যেন চিন্তার মধ্য হইতে অস্ফূটস্বরে জানিতে চাহিল : কোথায় কোন কবি কবিয়ালরে সেই কাম কেউ করতে দেখছে?

শিকদার উৎসাহের সঙ্গে তাহার কাছে গিয়া বসিল : আছে জোবু আছে। বয়স খুবই অল্প আছিল, ঘোরে পড়ছিলাম অন্য প্রকার ধ্যান-জ্ঞানের। সেই কালে ওই দূর সদর শহরের এক কবির আসরে তার গান শুনতে গেছিলাম। তখন একটু আজব মনে হইছিল, সব বিষয় ভালো করিয়া বুঝিও নাই। এখন দিনে দিনে সেই স্মৃতিটা বড়ো উজ্জ্বল হইয়া উঠতে আছে। শোনো, যাত্রাগানের লাহান সেই আসর। বাঁশ পুঁতিয়া, উপরে রঙিন শামিয়ানা টান টান করিয়া বাঁধা যাতে কোনো দুষ্ট হাওয়াও যেন কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। তার মধ্যখানে বিরাট একটা চৌকি দেখলাম মঞ্চের, একধারে বাদ্যযন্ত্র কোলে লইয়া বসা দোহারের দল, আর এক কবিকে দেখলাম মঞ্চের এই দিকে সেই দিকে বীরদর্পে পা ফেলিয়া তিনি যে গান গাহিতেছিলেন, কখনও কথায়, সুরে তা যেন ভুবন কাঁপাইয়া দিতে আছিল। তার মাথায় পাগড়ি, গায়ে জোব্বা, চৌখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। সব কথা তার বুঝিও নাই, শোনারও তেমন বড়ো অবসর ছিল না। তবে কয়েকটা চরণ এখন মনে আছে 'সইবোনা মোরা এই অপমান'। আর একটা গীতের কথা ছিল 'স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, স্বদেশ কারে কয়, এই যমুনা গঙ্গানদী তোদের ইহা হত যদি, পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?' কী তেজ বীর্য সেই সব কথায় তখন তাদের নামও শুনছিলাম, তাগো ছোটো ছোটো কবিতা-পত্র গানের বইও বিক্রয় হইছে আশে-পাশে, কিন্তুক সেইখানে যাইতে হইছিলও লুকাইয়া, কোনো রকম প্রমাণাদিও আর সঙ্গে রাখনের সাহস হয় নাই। যাদের গীত তিনি গাইলেন সেই মুকুন্দ দাশ, গোবিন্দ দাশদের দেখার বা শোনার কোনো সুযোগ হয় নাই সত্য, কিন্তু তার অন্য একখান গীতের রকম-সকম দেখিয়া যেন একেবারেই চমকাইয়া গেছিলাম। মাথার পাগড়ি আর গায়ের জোব্বা খুলিয়া ফেলিয়া তিনি ধরছেন হালিয়া-চাষার বেশ। খুউব অসন্তোষ আর গোস্বা দেখাইয়া মঞ্চের এইধার সেইধার ঘুরলেন কয়েকবার, তারপর হাতের ইঙ্গিতে সকল বাদ-বাজনা-কোলাহল থামাইয়া তিনি মাথা ঝাঁকাইয়া কইয়া উঠলেন, 'নাহ এই পিরিতিজ্ঞা করলাম আমি ছুঁইয়া এই হুক্কা-কলকিভায়, জন্মেও আর হাল দিমু না খানখেতে কি আউশ ভিটায়।' সঙ্গে সঙ্গে সব দোহারেরা গলা বাড়াইয়া জানতে চাইল : ক্যান, ক্যান, ক্যান? বিষয়টা কী, কী? গায়ক আবারও ঘুরপাক দিল মঞ্চের উপর বড়ো বড়ো পা ফেলিয়া, তারপর হঠাৎ সকলের [illegible] তুলিয়া যেন বিচার চাইল : 'এই খেত-মজুরের জোরে তিনি চলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুড়িগাড়ি হাঁক্কাইয়া আর জোঁহের কামড় খাইয়া আমি মরি কপাল চাপড়াইয়া।' তোমারে কী কমু জোবু, চতুর্দিকে চাইয়া দেখি আসরের সমস্ত মানুষ যেন সেই দুর্ভাগ্যের দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ছিল। আমারও সেই ধরনের গীত-গানের ইচ্ছা হয় এখন জোবু, কেবল সুন্দর দেখিয়া চৌখ ভরাইলেই হয় না, অসুন্দরের বিরুদ্ধেও খাড়া হইতে হয়।

জোবেদা ধীরস্বরে বলিল : সেই সব তো সমাজপতি-রাজা-বাদশার কার্য, কোন কবি কখন সাধ্য পাইছে?

শিকদার অন্যমনস্কভাবে বলিল : পায় নাই, কিন্তু সাহায্যও তো করতে পারে। অন্যায় শাসন-শোষণের উপর যারা নিজের সুখে ভিত বানায়, তারা দুঃখীর ফরিয়াদরে অন্যমুখী করিয়া দেয়। আর তখন তাগো চাতুর্যও এমন হয় যে দুঃখী মানুষ তার দুঃখমোচনের আদত পথ হাতড়াইয়া পায় না। তারা নিভৃতে কাঁদিয়াই সারা হয়।

শিকদার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিয়া উঠিয়া পড়িল : আমারে একটা কামে বাহির হইতে হয় কিছুকালের জন্য। তুমি ঘরে আসো, বাহিরে ঘোরাঘুরি করিও না, আর ঘরের কেঁওয়ারটাও বন্ধ করিও রাখিও।

জোবেদাও উঠিয়া আসিল, কিন্তু কোনো কথা তুলিল না।

বঁধুর রূপের কথা বলব কী রে
আমার দৃষ্টি নাই
জীব জগতের সব এই আছে
নিজের সৃষ্টি নাই।
সেই অরূপ-স্বরূপ জ্ঞানের বলে
প্রীতির উদয়
তার বিরহে সবই মিছা
ভাঙেরে হৃদয়।
প্রীত করে জীব-জগৎ
প্রীতে বাঁধে ঘর
প্রীত জীবনানন্দ, প্রীতে নাই পর
প্রীতিই ঈশ্বর ॥

যে যাহাই বলুক শিকদার অন্ধকারের কখনও গ্রাহ্যে আনিতে চায় নাই। কেবল চাঁদ তারার আলোক নয়, জোনাকিপুঞ্জের আভা নয়, দৃষ্টিশক্তির কথাও নয়, চতুর্দিকের জীবনের সঙ্গে পরিচিতি বোধও তাহাকে কখনও আশ্বস্ত আবার কখনও বা বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। ঘর-উঠান, আম-জাম-সুন্দরী বাগানের মধ্য দিয়া দিক-চলাচলের পথও সে অন্ধকারেও চলিতে পারে। কোনোখানে হঠাৎ খাড়া হইয়া বুক ভরিয়া নিশ্বাস লইয়া বলিতে পারে কোন দিকে তাহার দাদির হাতে রোয়া সিঁদুরে আমের গাছটা, কোনখানে দাদা করমালী লাগাইয়াছিল সোনালি ডাবের গাছগুলি, আর কোনখানেই বা তাহার মা-র বট-বড়ইর তলা। কোন গাছে কোন পাখ-পাখালিগুলি রাত্রির আশ্রয় লয় তাহাও অজানা নাই। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সেই ঘর-বাড়ি গৃহস্থালী কাব্য-কবিতার মতো সাজাইবার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্ন করমালীও দেখিয়াছে, সেও চাহিয়াছে। কিন্তু এমন একটা সময় আসিয়াছে যখন করমালী আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সকল সমস্যার সমাধান খুঁজিয়াছে সে এমন এক পরিমণ্ডলে, যেইখানে এই ইহজীবন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়, সংসার এক কষ্টকর পীড়ার মতো ভার, সবই কর্মফল না হয় ললাট-লিখন, যা হইবার তা হইবেই, কেউ তাকে খণ্ডাইতে পারে না। সকল নিয়মের যিনি নিয়ামক তাঁহার ইঙ্গিত ব্যতিরেকে একটি বৃক্ষপত্রও নড়ে না। শিকদারও তাহার সেইরকম বিশ্বাসে নিজেকেও অটল রাখিতে পারিলে সুখী হইত।

হউক অন্ধকার, তবু যেইদিকেই তাকায় শিকদার দেখে বংশ বংশ ধরিয়া মানুষের সমস্ত জীবনাচার একপ্রকার অসহায় বার্ধক্যের প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে; নদী-খাল, খেত-মাঠ, ঘর-বাড়ি, বন-জঙ্গল, পশু-পাখি, তৃণ-লতা, কীট-পতঙ্গের পরিবেশে ভরা প্রকৃতিতেও ক্রমাগত অনেক রকম পরিবর্তন ঘটিয়া চলিয়াছে। তাহা ছাড়া শৈশব দৃষ্টিতে যা দেখিত, পরিণত বয়সে তা অন্যরকমের মনে বাহিরের ও ভিতরের উভয় রকম প্রকৃতিও ক্রমাগত বদলাইয়া চলিয়াছে। একদিন যা মনে হইত পরমকাম্য সুখ, অন্যদিন আবার তা মনে না-ও হইতে পারে। বাহিরের প্রকৃতির মতো চিত্ত-চারিত্র্যের পরিবর্তনও তো জীবনানুগ হইতে বাধ্য। সুতরাং সেই জীবনাচারে সংগ্রাম অপরিহার্য। তাহার পিতা সেই চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কূল পায় নাই। এক একবার মনে হইয়াছে সমস্ত জগৎ-সংসারও সেইরকম সাফল্য সহ্য করে না। রাত্রিকালে সমস্ত দিক-দিগন্ত গাছপালা শান্ত স্তব্ধ হইয়া আছে, কিন্তু অকস্মাৎ কোনো ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে আলুথালু হইয়া নৃত্য করিয়া সকল জীব সংসার কি ফল ও ফসল তচনচও করিয়া দিতে পারে। গাঙ তাহার খেয়াল-খুশিমতো পাড় ভাঙিয়া আকৃতি বদলায়, মানুষ তাহার অজ্ঞানে-অবহেলায় বদলাইয়া দেয় প্রকৃতি। দুঃখ দৈন্য দুর্দশাও যেন সে স্বয়ং পথ করিয়া বহাইয়া দেয়। ঘন গাছপালায় ঘেরা ছোটোখাটো ঘর-গৃহস্থালী কতরকম আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিয়া আসিতেছিল যুগ যুগ ধরিয়া, কৃষি কাজের সুসমন্বিত কত ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল বংশ-পরম্পরায়, তাহার কার্য-কারণ খেয়াল করিয়াও শিকদার মনে করিয়াছে জীবন-সংগ্রামের রীতি-নীতিগুলির মধ্যেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, মৌল বিষয়গুলির প্রতি যথাযথ আনুগত্যের অভাব আরও দুর্গতির সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

প্রতিটি বাড়িয়ালের ঘর-বাড়ি, খেত-মাঠ, গাছ-পালা, পুকুর-নালা খাল, বিন্যস্ত করিবার কালে একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ ও পূর্বপুরুষদের খেয়াল ও যত্ন লক্ষ করিয়াও শিকদার মুগ্ধ হইয়াছে, বিস্মিত হইয়াছে, এমনকী একটা গর্ববোধও জাগিয়া উঠিয়াছে বুকে। সামান্য গৃহস্থ-রমণীও জানিয়া আসিয়াছে কোনখানে কোন সময় কোন গাছ লাগাইতে হয়, তাদের সহ-অবস্থানের সুফল-কুফল, পুকুরে হাঁস পালনের সঙ্গে হেলঞ্চা-মালঞ্চা-কলমিশাক লতাইয়া দিবারও কী সম্বন্ধ, কোন ফল-মূল লাগাইতে হয় গৃহাবর্জনার ঠাঁই-এর কাছে, কোন সময় কোন কোন গাছের কলম বাঁধিয়া আরও উন্নততর ফল-ফলারির সৌভাগ্য রাখিয়া যাওয়া যায় পরবর্তী বংশধরদের জন্য, কোন লতা-পাতা-শাক-সবজি, ফূল-ফলের বাগান প্রতি গৃহে অত্যাবশ্যকীয়, সেই বোধ বুদ্ধি ও জ্ঞানের অভাব তাহাকে বিমুগ্ধও করিয়াছে। সে কখনও বুঝিয়াও উঠিতে পারে নাই বড়ো বড়ো গাছগুলির ডালপালার ভাঁজে জন্ম লওয়া ফুলের ঝাড়গুলিকেও মানুষ পরগাছা বলিয়া কেন হিংস্রভাবে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। রাজ্যরাষ্ট্র ভাঙিয়াছে-গড়িয়াছে, আর এক-একটা ঝড় যেন সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্য সমস্ত পূর্বস্মৃতি সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি কৌশলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে। এরও বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভ শিকদারের মনে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। তাহার গৃহস্থালীকেও সেও হয়তো সুশোভনভাবে গুছাইয়া লইতে পারিত। শৈশবকাল হইতে জোবেদার সঙ্গে জীবনের যত খুঁটিনাটি লক্ষ করিয়াছে তাহার প্রতি মমতা অথবা বিরাগ অনুভবের মধ্য দিয়াই তাহারা একে অন্যের কাছাকাছি আসিয়াছিল। এখন এতকাল পরে তাহার আবির্ভাব শিকদারকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। জোবেদার নিকটে বসিয়া আবারও সে সেই অতীত দিনগুলির মতো তাহার কাছে নিজের নতুন গীত-কথার বিষয় তুলিয়া একটু সংকুচিতও বোধ করিতে লাগিল। প্রায় তাহাকে বলিতে যাইতেছিল একটা নতুন গানের কথা, জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল : এই কয়েকদিন ধরিয়া কতকগুলি পদ কেবলই মনে মনে গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া চলছি, শুনবার ধৈরয আছে?

ভাগ্যিস, জিজ্ঞাসা করে নাই, কেবল অভিমানের বিষয় নয়, পদগুলি তখনও তাহার মনের মতো হয় নাই। তাহার উপর জোবেদা হয়তো তাহার সেই পরিবর্তন আদৌ পছন্দ করিতে পারিবে না। ইতস্তত পায়চারি করিতে করিতে শিকদার নিজেকে সংযত করিয়া লইতে চাহিল।

কবি কি বাস্তবিকই কখনও অন্যান্যদের মতো গৃহস্থ হইতে পারে, না তাহাকে ক্রমাগতই ডাক দিতে থাকে অন্যতর ভুবনের মায়া? কেন তাহারা চিরকাল কোনো মোহগ্রস্তের মতো স্বপ্নই দেখিয়া চলিবে, বাস্তবকেও কেন সকল স্বপ্ন সাধ পূরণের সংগ্রাম করিবে না? তাহার ভাব-ভাবনা বিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে স্বয়ং কি কখনও কোনো ধনী মানী বিশিষ্ট জন হইতে চাহিয়াছিল? তাহার কণ্ঠস্বরের সাধুবাদ শুনিয়া আসিতেছে শৈশবকাল হইতে। অভ্যাসে এবং চর্চায় সেই স্বর কারুকার্যময় করিয়া তুলিতে তাহার প্রায় কোনোই বেগ পাইতে হয় না।

কিন্তু কী হইবে শুধু স্বর লইয়া যদি তাহার সঙ্গে উপযুক্ত রকম প্রাণের কথা না থাকে। সেই রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও মনে হইল তাহার অন্তরের কথাগুলি যেন তখনও সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে; চতুর্দিকের নৈঃশব্দের মধ্যেও কত কত পুরাণ-কথা জোনাকির মতো জ্বলিয়া জ্বলিয়া তাহাকেও আকৃষ্ট করিয়া চলিয়াছে। কোথাও হইতে 'কোরা' পাখির ডাক ভাসিয়া আসিল; খালের ধারে নলবনের মধ্যে ডাহুকও হয়তো বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহার নিশীথ-অভিসারে। হউক চতুর্দিক অন্ধকার, তবু তাহারই মধ্যে জীবন লীলা অব্যাহতরূপে বহিয়া চলিয়াছে। বাসনা কি কামনার ঊর্ধ্বে জীবন নাই, কিন্তু কোন কামনা তাহার জীবনে সর্বাপেক্ষা বড়ো সত্য? সে কি কেবলই ওই জোবেদাকে আকাঙ্ক্ষা, না অন্যতর কিছু?

শিকদারে কখনওই মনে হয় নাই কবি হইতে গিয়া তাহাকে এমন বিপুল সব প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে, না কল্পনাতেও ছিল এই নিঃসঙ্গতা। জীবনের সবখানে গতিশীলতা রহিয়াছে ঠিকই, কিন্তু সে-ই ক্রমাগত বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছিল। জনতা যে ভাষায় তাহাদের ভাব-ভাবনা প্রকাশ করে শিকদার তা যথাযথ চয়ন করিয়াও দেখিয়াছে কোনোখানে অসঙ্গতি আসিয়া গিয়াছে, তাহার মৌল বিষয়, নানারকম পরম্পরায় এমন কোনো রূপ পরিগ্রহ করিতেছে যার জন্য সমস্ত কথা, কাব্য-কথকতাকে নতুন করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজাইয়া লওয়া প্রয়োজন, প্রচলিত রীতি-নীতি এবং বাধা-বন্ধের বাহিরেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিবেদন উপস্থাপন অতি আবশ্যকীয় বলিয়া মনে হইয়াছে।

এক সময় জোবেদা কাছে ছিল, নতুন বাঁধা কোনো গান কোনো গীত তাহাকে প্রথম না শুনাইলে সে তাহার রচনাও সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিত না। জোবেদা সকল বিষয় বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও ক্রমাগত তাহাকে উৎসাহ যোগাইয়াছে মন দিয়া শুনুক বা না শুনুক, বুঝুক কি না বুঝুক কেবলই বলিয়াছে : ইসস, অনেক মাইয়া ছেইলারা কী হিংসা যে আমারে করে! সককলে মনে করে একদিন তুমি খুব বড়ো কবিয়াল হইবা। তোমার বাড়ি-ঘর-বিষয়-সম্পত্তি রাজ-রাজাগো পুরীর লাহান ঝলমলাইয়া উঠবে।

কেবল শিকদার স্বয়ং তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখে নাই। দেশে দেশে বাড়িতে বাড়িতে সকলের ফরমায়েশি গীত-গান শুনাইয়া ইনাম আনাম সাধুবাদ অবশ্যই জুটিয়াছে, কিন্তু কেবলই তাহার মনে হইয়াছে যে অন্যকে ফাঁকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ফাঁকি দিয়া চলিয়াছে, মানুষকে তেজ-বীর্য লইয়া সংগ্রামী হইতে উদ্দীপ্ত না করিয়া সে তাহাদের বিভ্রান্তিকেই আরও কায়েম করিয়া রাখার ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে। একমাত্র ঘাট-মাস্টার ব্যতীত অন্য কেউই তাহার গভীর সংকোচ এবং বেদনার কারণ কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে নাই।

এখন সে নিজেকে এমন একটা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতেছিল যার মধ্যে কোনো কন্যার জন্য আকুলতা-ব্যাকুলতাই আর বড়ো কথা নয়, বরং মুখ্য হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে জীবনযুদ্ধে পরাস্ত প্রায় সমস্ত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ। তাহাদের মধ্যে আর সখিনা কি জোবেদার মধ্যে পার্থক্য খুবই অল্প। এমন কতকগুলি অবস্থা-ব্যবস্থা সকলের জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে যা এমনই পুরাতন এবং অসঙ্গত যে তাহাকে ক্রমাগত মানিয়া চলিবার মধ্যেও বাস্তবিকই কোনো পৌরুষকার নাই।

নতুন ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী বিচিত্রভাবে তাহাকে একটি গীত শোনায়; তারে তারে গম গমাগম ধ্বনি তুলিয়া যে উদাত্ত কণ্ঠে জানায় :

রাজা-রাজ্যের গীত-গানে আছে সর্বজনা
অভাগার কাহিনি কেউ করে না বর্ণনা।
ধুলপতি হালিয়া চাষা কিন্তু জমিজমা নাই

জোবেদা হয়তো জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল : ওইটা কেমন নাম হইল?

শিকদার বেকুব হইবে না, বলিবে : ধনপতি না, গণপতি না, সারা গায় চুল-দাড়িতে ধুল-ধুলাট মাটির কাম খুঁজিয়া বেড়ায় এক কান্দা হইতে আর-এক কান্দা, ধুলপতি নামটাই তো মানানসই। শোনো আবার :

ধুলপতি হালিয়া চাষা, তার জমিজমা নাই
ঠাঁই পায় না জলে-স্থলে বুঝি আসমানেও তাই।

: নাহ জুত শোনাইতেছে না, আবার ধরি :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধুলপতি হালিয়া চাষা আর তার কলাবতী বউ
খাটিয়া খাওয়ার কামও পায় না, সুখে নাই কেউ।
জলে-স্থলে ঠাঁই নাই, না আছে থির পেশা
রৌদে পড়ে, জলে ভেসে খোঁজে দিক-দিশা।
একদিন সে বাসনা বোনে বউ কোলে নিয়া
হেনকালে নিদান আসে দুই চক্ষু রাঙাইয়া
তোর কর্ম হাল-হালুটি ভোগসুখ সকল আমার
এই নিয়মে বাঁধা আছে সব জগৎ-সংসার।
ধুলপতি কয়, মহামতি, এ কী কথা হইল
এ নসীব বদলাইতে এত রাজ্যরাষ্ট্র গেল।
দাস আর দাস নাই, না দুঃখ ললাট-লিখন
সালাম কইরে কাতারে শামিল হইয়াছি যখন।
মহামতি গোস্বায় আগুন ছড়িল হুংকার
ঠাটায় ফাটাইয়া দিল যেন দিক চরাচর
বটে, বটে, মহামতি কয়, বড়ো বাড় বাড়িয়াছে
আমার মুখের উপর কথা কে কবে বলিয়াছে।
বল ব্যাটা আমি গুরু, আমি প্রভু, পামর বর্বর।
ধুলপতি কয়, ধীরে গরিব কেন বানাইছে ঈশ্বর?
কানু বলে বিধি তো কাঙাল করে না প্রকৃতি
তবু দুঃখ কেন ভোগে এত জনা জনম অবধি?
দেশের শোভা খেতে মাঠে কারিগরের কাজে
যেই জনা করে সে কাজ তার কি দুঃখ সাজে?
নারীর শোভা যৈবন যেমন দেশ শোভা সুখ
কোন সে পাপে দুঃখী জনায় বিধাতা বিমুখ?
প্রেম গীতি শুনাইতে বলে সদা সর্বজনা
অপ্রেম রহস্য মোচনই এখন কানুর বাসনা।

কিন্তু কয়েকবার আবৃত্তি করিয়াও শিকদারের মনে হইল মনের মতো কিছু হয় নাই; নতুন কোনো ধরনের গীত-গান বাঁধিতে এখন তাহাকে আরও গভীরে যাইতে হইবে, কেবল দূর হইতে দেখা নয়, সেই সব দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণাকে তাহার সর্বেন্দ্রিয় দিয়া অনুভব করিতে হইবে। সেই সংকল্পে জোবেদা কি উৎসাহিতা হইতে পারিবে? কখনও কোনো রমণী কি তেমন হইয়াছে।

শিকদার বড়ো চঞ্চল বোধ করিতেছিল, একবার মনসব সর্দারের উদ্দেশে রওয়ানা হইয়াও থামিয়া গেল। তাহারা সমাজপতি, প্রভুর মনোরঞ্জনের বাহিরে তাহাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা লইবার নাই। জোবেদা যে স্বামীর নিকট হইতে তাহারই আশ্রয়ে আসিয়া উঠিয়াছে সে বিষয়টা কেউই ভালোভাবে গ্রহণ করিবে না। অত্যাচারিতকেও আশ্রয় দিতে পারে দেশের রাজা সমাজপতি অথবা বীরবিক্রম পুরুষ। শিকদার গৃহস্থ হইতে পারে নাই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি হইতে পারে নাই, না হইতে পারিয়াছে কাহারও দুঃখমোচনের জন্য কোনো উপযুক্ত সঙ্গী-সাথি। একটা গভীর মনোকষ্ট সে যেন আর কিছুতেই দমাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

আসমানে জুড়িয়া আছে সেই একই চন্দ্রতারা
জীবনও বহিয়া চলে যেন নদী স্রোতধারা
সর্বসাধের সাক্ষী এই পুরী বাড়িয়াল কূল
চৌদিকে প্রহরী তাল-তমাল-শিমুল-বকুল
যেই দিকে চাই দেখি বিষয়ে বস্তুয়ে মিল
সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি কখনও করে না নিখিল।
মোর মনে নিশিদিন অন্তর্জ্বালা দহ্মিয়া জ্বলে
ওরে ও ডাহুক এমন পিরিত করো কোন বলে?
জননী মৃত্তিকা গোপনে ফুটাও তৃণ ফুল দল
কার জন্য মেলিয়া ধরো সোনার ফসল?
আসমানে-জমিনে হাওয়ায় ভরাও বাসনা
তার অধিকার সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ জীব কেন পাইল না?

বারংবার বহু কথা কখনও সংলগ্ন, কখনও অসংলগ্নভাবে শিকদারের মনে এক এক রূপে এক একভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আরও খেয়াল করিতে লাগিল সে বাস্তবিকপক্ষে নিজের জীবনকে সুখে ঐশ্বর্যে ভরিয়া তুলিবার কামনা কখনও হয়তো করে নাই। কেবলই কানে বাজিয়া ওঠে সদা করমালীর সেই গীত কথা :

একদিন এই ভবের খেলা সাঙ্গ হবে
ধন-দৌলত সব পইড়ে রবে
একলা তুমি আসিয়াছিলে
একলা চলিয়া যাইতে হবে রে
মাটির দেহ মাটিতে মিশাইবে—

কেন জীবন-যৌবন এবং জগৎ-সংসারের প্রতি এমন ঔদাসীন্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মনে? বুদ্ধির তুলনা ছিল না। জীবন জগতের কোনো কোনো ঘটনার সম্মুখে একেবারে অসহায় হইয়া পড়িত। মাঝে-মধ্যে গাঙের বাঁকের কাছে বসিয়া কী এক ঘোর ভাবনায় নিমজ্জিত হইয়া থাকিত। খুশি খুশি হইতে তাহাকে দেখিলে, আদর করিয়া কিশোর শিকদারের ছোটো হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া আবারও তাহার ভাবনার মধ্যে তলাইয়া যাইত। সে বারংবারই জানিতে চাহিত : কী এমন দেখো তুমি ওইদিকে চাহিয়া দাদু, আমি তো ওই কাশবনের চূড়াগুলান ছাড়া আর কিছুই দেখি না।

করমালী আরও আদর করিয়া তাহাকে জড়াইয়া লইত প্রায় বুকের মধ্যে; দেখবি, আরও একটু বড়ো হ, তখন দেখবি। এখনও বোধ করি চৌখ ফুটে নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিকদার একটু গোস্বা করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইত : হ, এইটা একটা কথা হইল। আমি আইজও তো গহন পুকুরে ডুব দিয়া মাছ হাতাইয়া উঠাইছি। অন্যেরা মনে করে আমি যেন পানির তলার সবও দেখতে পাই।

করমালী হাসিয়া বলিত : সে তো অন্ধের লাহান হাতড়াইয়া কিছু ধরা। ঠিক ঠিক জিনিস চিনতে হইলে সবরকম দৃষ্টি চাই, যে-জিনিস চাই তার সম্বন্ধে একটা ধ্যান চাই। আসলে আমার মাঝে মধ্যে কী মনে কয় জানো ওই কাশবনের আড়ালে, ওই দূরে দূরে গাঙ যেইখানে আঁকাইয়া-বাঁকাইয়া দূর দিক সীমানার মধ্যে মিলাইয়া গেছে, তার সব কিছুর মধ্যে দেখি একজন অসহায় কন্যার মুখ, ক্যান জানি না, সেই মুখখানি যেন উপবাসে কাতর, নিজ যৌবনের ঐশ্বর্য লইয়া তার বিড়ম্বনারও শেষ নাই।

করমালী আপন মনেই গুন গুনাইয়া উঠিয়াছিল :

আমি এই তারে দেখি রসের পসারি
এই তরে উদাস
এই তার অঙ্গে কুমারী রঙ্গ পলক না ফেলিতে
বৈধব্যের বাস।

কী তোরে বলিরে, একটা পুরা চেহারা যেন কক্ষনোই দেখিয়া উঠিতে পারি না। আমার মা-এর কথা মনে পড়ে। ওই গাঙ ধরিয়া কোথাকার কোন মুলুক হইতে তাহারা ভাসিয়া আসিয়াছিল।

: কোন মুলুক হইতে?—শিকদার বারংবার সেই ইতিহাস শুনিতে চাহিত। পিতামহ করমালী মাথা দোলাইত : জানি নাই, কেউই কখনও জানে নাই। জীবনের কিছু থির নাই রে, মানুষ কি কখনও একই জাগায় একইভাবে বসত করতে পারছে? তামাম দুনিয়ার মানুষ যেন হাজার হাজার বছর ধরিয়া নিজের স্থায়ী ঠাঁই বানাইতে সবখানে ঘুরিয়া-ফিরিয়া সারা হইতে আছে। আমি আরও কী ভাবি জানিস, কী এই জীবন ধারণ, কষ্টের লাঘব না আনন্দ-উৎসব?

শিকদার তৎক্ষণাৎ হাততালি দিয়া বলিত : উৎসব, উৎসব, আনন্দ-উৎসব?

করমালী ইচ্ছা করিয়াই আর কোনো ভারী ভারী প্রসঙ্গ তুলিত না, তাহার হাত ধরিয়া বাড়ির পথে চলিতে চলিতে বলিত : এইবারে তোমারে এই বৈশাখী-মেলায় লইয়া যামু। দেখিও, শত রকম দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মানুষের মনের আনন্দের বাসনাটাও কেমন কাতর হইয়া পড়ছে। এই জগৎ-সংসারে দুঃখ আছে বলিয়াই আনন্দও যেন বৈরী হইয়া রইছে।

এতকাল পরে শিকদারেরও নতুন করিয়া খেয়াল, চতুর্দিকে প্রাণ আছে, চাঞ্চল্য আছে, আছে সর্বকালের সকল-প্রকার গতিময়তা, কিন্তু সহজ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ নাই। কেন নাই? কখনও কি ঝড়-ঝঞ্ঝার মতো কোনো দস্যু আসিয়া সবদিকের সব জীবের জীয়ন-কাঠি হাত করিয়া নিজ স্বার্থেই এমন করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে?

পথ অন্ধকার হইলেও শিকদার হোসেনের বাড়ির দিকে পা উঠাইল।

নিদয় বঁধু আমার পরান তুমি
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাসরিতে নারি আমি।
যখন দেখিয়ে ও চন্দ্র বদনে
ধৈরয ধরিতে নারি
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশ বার মরি ॥
মোরে করো দয়া দেহ পদছায়া
শুনো শুনো পরান-কানু
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু ॥
সৈয়দ মতুর্জা ভনে কানুর চরণে
নিবেদন শুনো করি
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়
জীবন মরণ ভরি ॥

হোসেন তখনও বাড়ি ফিরে নাই। কয়েকবারই মনসব সর্দার না হয় জোবেদাদের বাড়ির দিকে পা উঠাইয়াও শিকদার থামিয়া গেল। কেবলই মনে মনে পর্যালোচনা করিয়া দেখিল, জোবেদার পাশে খাড়া থাকাই এখন আশু প্রয়োজন। মনসব সর্দারের কথা কড়ার রাখিয়া হয়তো তাহারও সাহায্যে একটা উপায় মিলিয়া যাইবে।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জোবেদা প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাহার মুখ অন্ধকার, প্রদীপের আলোর নিকট হইতেও সে দূরে সরিয়া রহিল।

: কই, কী তৈয়ার করলা তুমি, আগে খাইতে খাইতে কথা হউক।

শিকদার নিজেই প্রদীপটি তুলিয়া লইয়া পাক-ঘরের খাটালে বসিল। কবে সেই কোন ছোটেকালে তাহার চড়ুইভাত খাওয়ার আমেজটা ফিরাইয়া আনিবার জন্য সে চেষ্টার ত্রুটি রাখিতে চাহিল না। কিন্তু জোবেদাকে যেন প্রায় জোর করিয়াই উঠাইয়া আনিতে হইল। সে তাহার সাধ্যমতো যা কিছু প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিল সবই শিকদারের সম্মুখে সাজাইয়া দিল।

: কই, তুমিও বসো।

জোবেদা মাথা নাড়িয়া একটু দূরে বসিল : নাহ্, তায় আমার খিদা নাই। শিকদার তবু আহার্যগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া বলিল : তবু এত পদ তুমি করলা কেমনে করিয়া? আমার ঘরে তো কক্ষনো কিছু থাকে না। এই মলান্দী মাছগুলানও যে সেদিন ধরিয়া কোথায় কোন হাঁড়ির মধ্যে রাখছিলাম তা আর স্মরণেও আছিল না। এমন গৃহিণীর উপরেও যে অত্যাচার করতে পারে, সেইটারে তো মানুষ বলিয়াই মনে হয় না।

জোবেদা কোনো মন্তব্য করিল না। খাটালের উপরে এক হাতে ভর দিয়া সে কাত হইয়া বসিয়াছে, নতমুখ কী ভাবনায় আচ্ছন্ন, দৃষ্টিতেও আর কোনো ঔজ্জ্বল্য নাই।

শিকদারের পক্ষে কোনোক্রমেই বুঝিবার সাধ্য ছিল না যে সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ অমন সেই স্বামী আসগরউল্লার আহার-তৃপ্ত মুখ যেন ধক করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল বুকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে। যতই সে অত্যাচারী হউক, এই অতি সামান্য মাছের আহার তাহার মুখ কোনো শিশুর খুশিতে ভরিয়া তুলিত।

: আহা, এত দুশ্চিন্তা করণের কী আছে? ব্যবস্থা একটা হইবেই। কেবল ঝোঁকের মাথায় না, বুদ্ধি করিয়া আউগাইতে হইবে। পুরুষকারের কথা কও, এইরকম একটা বিষয়ে হাউমাউ করার মতো মানুষের কক্ষনোও অভাব হয় না। অথচ আমি তো দেখি কত আসল ঘরে মুষল নাই, বিচার নাই।

জোবেদা হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া অস্ফুট গলায় বলিল : আমার মরিয়া যাওনই ভালো আছিল। তোমার জীবনটা নষ্ট করিয়া দিছি বলিয়া শুনছিলাম, এখন আবার আর-এক উৎপাত বিপদের লাহান হাজির হইলাম।

শিকদারের মুখে আহার রুচিল না, একদৃষ্টে সে বেশ কিছুক্ষণ জোবেদার দিকে চাহিয়া রহিল। কিশোরী জোবেদা এখন পরিণতা যুবতী রমণী। তাহার দেহভঙ্গি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দীর্ঘ কেশজাল তেমন স্পষ্ট করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া যেন কখনও দেখে নাই। সে মুখে যাই বলুক, এই মুহূর্তে তাহার অন্তরে ও মস্তিষ্কের যে দুশ্চিন্তাই থাকুক, মনে হইতে লাগিল, জোবেদার আকুল-ব্যাকুল দেহটি ভুবন যেন তাহার সমস্ত মায়া-মমতা যত্ন দিয়া গড়িয়া দিয়াছে। শিকদার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

: শোনো, তারা কি বাস্তবিকই তোমারে তাড়াইয়া দিলো না তুমিই নিজের ইচ্ছায় চলিয়া আসছ?

জোবেদা মুখ তুলিয়া তাকাইল শিকদারের দিকে, মনে হইল দৃষ্টি জলে ভরা, আর এতটা অসহায়তা যেন বিপদগ্রস্ত শিশুমুখ ছাড়া অন্য কোথায়ও দেখা যায় না।

শিকদার গলা নরম করিয়া আবারও প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করিল : জবাব দেও জোবেদা, একটা সঙ্গত সমাধান বিচরাইতে হয়। জীবনটা কোনো সংসার-সংসার খেলা না, সামান্য ভুলচুকের জন্যও অনেক সময় অনেক বড়ো মূল্য দিতে হয়, সহ্য করতে হয়। আমার দাদা করমালী কি আমার বাপ-মা-এর সংসারেও আমি কোনোদিন একটানা শান্তি বলিয়া কোনো জিনিস দেখি নাই। মনে কয়, একটু সংসার-সুখ ভোগের জন্য অনেক বড়ো কষ্ট সহ্য করতে হয়।

জোবেদার দৃষ্টিতে এইবার যেন একটা সংশয় ফুটিয়া উঠিল : এই কথার অর্থ? তুমি কি আমারে আবার ওইদিকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দেওনের বুদ্ধি করতে শুরু করছ?

: আহা, এমন ঝট-চাপট যোগ-বিয়োগ করিও না।—শিকদার তাহাকে আশ্বস্ত করিতে চাহিল। জানোই তো, আমি বোকা-সোকা মানুষ। কোনো দিন কোনো সংসার-জ্ঞান রাখি নাই। দেখি মানুষের সংসার, নানান কথা আউলায়, তার কোনো বিষয়ও হয়তো তেমন পরখ করিয়া দেখি নাই। এখন এই যে একটা যোগ্য মীমাংসা তুমি যেমন চাও, তেমন আমিও চাই। তাই কই, একটু খুলিয়া বলো।

জোবেদা তবু সহসা কোনো উত্তর দিল না; শিকদারও বারংবার তাহার মুখ চক্ষু নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে চাহিল, কতখানি তাহার আপন প্রয়োজনে, আর কতখানি শিকদারের প্রতি মমতাবশতই এখন এমনভাবে ছুটিয়া আসিয়াছে। শিকদার তখন প্রায় স্থির করিয়া লইয়াছে, সুতরাং আর টলিতে চাহিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: কইলাম তো,—সেই সন্ধ্যার ঘটনা আবারও সংক্ষেপে বলিতে চাহিল জোবেদা, যেন একটা সুযোগ পাইয়াই তারা আমারে এক কাপড়ে সেই গাঙের পাড়ে ফেলাইয়া দিয়া গেল। বনের পশু কী চিল-শকুনেরও খাদ্য হইয়া যাইতাম। কেমন করিয়া যে এই পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইলাম, সেই তবধ যেন এখনও আমার পুরা হয় নাই।

শিকদার মন দিয়া শুনিল। তারপর সম্মুখের খাবারের থালা সরাইয়া বলিল : এই শেষ বিষয়টাই আমি ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে চাই। এইটা কি কোনো মানুষের কায্য হইছে? তবু বলি, তুমি দশজনের বিচার চাইতে পারতা, দেশের প্রধানগো দরবারে গিয়া নালিশ জানাইতে পারতা। এখন যে অবস্থা তাতে উলটা তো তোমারেই সে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। সেই রকম কোনো ফাঁক দেওয়ার সুযোগ করা ঠিক হইবে না।

: কী কইতে চাও?—জোবেদা সিধা হইয়া বসিল : রাজ্য-রাজা সাজাইয়া-সাজিয়া যারা প্রধান হইয়া বসে তারা কবে কখন কোন ন্যায়-বিচারটা করছে? আমি যা ভালো মনে করছি, তা-ই করছি। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যে পথে আমারে চালাইয়া নিছে সেই পথে আসছি। দোহাই তোমার, তুমিও আমারে আবার গুরুবাক্য শোনাইও না।

শিকদার সহজ হইতে চাহিল : না, সেই কথা না, জোবু। আমি তো মনে করি, তুমি তোমার ভাই-এর বাড়িতে গিয়াই ঠাঁই লও। যতই অসুবিধা হউক, যতই কষ্ট হউক, কিছু সবুর কিছু আনা এখনও করণ দরকার। অনেক অন্যায় হইছে, হইতে আছে। তা শেষ করিয়া দেওনের জন্য বুদ্ধি কৌশলও চাই।

জোবেদা নতমুখে নিজের হাতের দিকে চাহিয়া বলিল : হায়রে পুরুষ। আমি ভুল করিয়া থাকতে পারি, তবু আরোও ভুল বাড়াইবার ইচ্ছা করি না। আমি তো দেখি মরণ ছাড়া গতি নাই।

শিকদার কাছে আগাইয়া তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইতে চাহিল : জোবু কতো বড়ো হইয়া গেছ তুমি এখন, তবে এইসব কোনো বুদ্ধির কথা হইতে আছে না। আমি তোমার কষ্ট বুঝি। তবে একটা সঙ্গত উপায় বাহির করিতেই হইবে। অস্থির হইলে কোনো সমস্যারই মীমাংসা হইবে না। কিন্তু জোবেদা তাহার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া গেল : ঠিক আছে, আমার পথ আমি নিজেই দেখতে পারমু, তোমারে আর ব্যাকুল হইতে হইবে না। শিকদার বুঝিতে পারিল জোবেদা কোনো নিরাপত্তা বোধ করিতেছে না, কিন্তু অধিক কিছু বলা বা করার বিষয়েও সে স্থির নিশ্চিত হইতে পারিতেছিল না। স্বভাবমতো ঘুরিয়া-ফিরিয়া সে আবারও তাহার প্রিয় ঠাঁই, ঘরের সেই বারান্দায় গিয়া বসিল।

বাহিরে ক্রমে ক্রমে আরও গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল রাত্রির অন্ধকার; চতুর্দিকে অজস্র ঝিঁঝি আর জোনাকির দল ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিতে লাগিল তাহাদের রাজ্য-সাম্রাজ্য; একটা কোরা-পাখি কোথাও হইতে মাঝে মাঝে ডাকিয়া ডাকিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল।

: জোবু?

ঘরে উঠিয়াও শিকদার জোবেদার আর কোনো সাড়া শব্দ পাইল না। প্রদীপটা ঘরের খাটালে তখনও প্রায় নিবু নিবু অবস্থায় জ্বলিতেছিল; সেইটা উসকাইয়া দিয়াও কোনোদিকে তাহার দেখা পাইল না; অবশেষে একসময় দেখিল ঘরের পিছনে বারান্দার মাটিতে বসিয়া সে একদৃষ্টে সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, মুখচক্ষু নিরীক্ষণ করিয়া মনে হইল সে যেন অতি নিদারুণ কোনো সংকল্পের জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লইতেছিল। শিকদার বাতিটা খাটালের দুয়ারের কাছে নামাইয়া রাখিয়া ডাকিল : জোবু! জোবেদা?

জোবেদা কোনো উত্তর দিল না, হয়তো-বা শিকদারের গাঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে একটু চকিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই হাঁটুতে বাহু বাঁধিয়া সে নিজেকে লুকাইতে চাহিল।

শিকদার আবারও তাহার মুখ উঁচাইয়া নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল : জোবু, ঘরে আসো। ঘুমাও তুমি, তোমারে ঘুমাইতে দেখলে আমিও শান্তি পাই। জোবেদা মৃদুস্বরে বলিল : ঘুম আসে না। অনেকদিন ধরিয়া আমার চৌখে আর ঘুম নাই।

শিকদার আরও অপ্রস্তুত বোধ করিল। এমন ঘনিষ্ঠ সে জোবেদাকে কখনও পায় নাই, পাইলেও হয়তো অনুভব করে নাই, ইচ্ছা হইতে লাগিল তাহার দুঃখের সঙ্গে সেও একাত্ম হইয়া যায় নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দেয়। জোবেদার কাঁধের উপর হইতে হাত সরাইয়া সে বলিল : কতদিন ধরিয়া আমি কেবলই চেষ্টায় আছি গীত-গানের নতুন কোনো পদ বাঁধিবার, কী যে আকুল-ব্যাকুল হইছি। আর এখন দেখো, এখন এই একটুকাল আগেও কত গান গীত-কথা হইয়া যেন আমায় অস্থির করিয়া তুলছে। কয়েকটা পদ তোমারে বলি।—শিকদার সুর গ্রাহ্যে আনিল না, যেন কোনো তন্ময়তার মধ্য হইতে ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিয়া গেল :

ভুবন বরনী কন্যা আইলো আমার পুরে রে
মেঘ উড়াল দিয়া
সে যেন বনের পঙ্খি, কেমনে রাখিবরে
তারে পিঞ্জরে বাঁধিয়া।
দেহ এমন রূপের পিঞ্জর রে
তবু পরান নাহি রয়
কোন সে পিঞ্জরে পুষিয়া রে
পঙ্খি ঘরে রয়।
আউলা-বাউলা বাতাস বয় রে
বাসনা উথলিয়া ধায়
কুয়া-পঙ্খি মতোই কাঁদেরে
এ নিশিও পোহায়।

জোবেদা হঠাৎ তাহার দিকে ঘুরিয়া বসিল : তুমি এই এতগুলান দিন রাত্রি কেবল এইসব তত্ত্বকথা সাজাইয়া কাটাইয়া দিলা? এই এমন আমারে ছাড়া অন্য কোনো কন্যা কি তোমার কক্ষনো মন টানে নাই, মনে ধরে নাই, বাসনায় আসে নাই?

শিকদার অপ্রতিভের মতো হাসিতে চাহিল : যাই দেখছি কেবল তোমারই কথা মনে পড়ছে। কেন জানি না, হয়তো বা কোনো বেয়াধিও হইবে, এই ভুবন, জীবন নারী, শিশু-ফুল ফল জগৎ সংসার কেবলই একটা একাকার রহস্য হইয়া থাকে। তারে যখনই রূপ দিতে যাই, একটা শরীলে বাঁধতে চাই, কোথায় হইতে তোমার স্মৃতিটাই উদয় হইয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। সব নারী বারংবার কেবল তোমার কথাই আমারে মনে করাইয়া দিছে। এমন তো আমিও চাই নাই।

জোবেদা শিকদারের ঠোঁটের উপর তর্জনী চাপাইয়া তাহাকে বাঁধা দিল : অথচ অন্য কোনো নারী আসে নাই তোমার দুঃখ সুখের সাথী হইতে, দেয় নাই দেহ সুখ। নারীকে না জানিয়া কীভাবে তুমি এত সহজে বলো জীবনের কথা? কবি তুমি ওই বাতিটা নিভাইয়া দেও, আরও আন্ধার, আরও নিশি গাঢ় হইয়া ঘিরিয়া আসুক চতুর্দিক দিয়া। আকাশে ওই তারা জ্বলুক, সাক্ষী হইয়া থাকুক ওই গাছ-পালা, ফুল-লতা জোনাকির মেলা। এই দেখো, এই আমি যার জন্য এখনও তোমার কাব্য কথার অন্ত নাই, সে আমি সম্পূর্ণ নিরাবরণ করিয়া মেলিয়া ধরলাম, তোমার কাছে। তুমি যতি সত্যই কোনো দৃষ্টির দাবিদার হইয়া থাক, দেখো কী আছে এই দেহে। বলো বাস্তবিকই এর কোনো মূল্য আছে কি নাই। কবি, যদি ইচ্ছা হয় অনুভব করিয়া দেখো, যা-ই ঘটিয়া থাকুক আমার জীবনে, আমি এখন ফুল কলির লাহান নিজেরে দিলাম। তুমি যা-ইচ্ছা করো, তুমি পারো আমার সকল সংশয় সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিতে, পারো তোমার লাহান বিশ্বাসী হইতে। দেখো, আমিও তোমার মধ্যে মিশিয়া যাইতে চাই।

কথাগুলি একই সঙ্গে বলে নাই জোবেদা। অপটু শিকদারের নিকট কোনো শৃঙ্গার কলা দেখাইবার অধীরতাও তাহার ছিল না আর শিকদারও জীবনে সেই প্রথম বারের মতো অনুভব করিল দেহ কত রহস্যে ভরা। কত চপল-চটুল নদী ও সমুদ্রে গিরিপর্বত শস্যমালা ক্ষেত্রে, সীমায় নিঃসীমের কোনো রূপে, কোনো বর্ণগন্ধে যেন তাহার তুলনা চলে। কৈশোরে সংসার-খেলার সময় হইতে যে বাসনার বীজটি উভয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে শুরু করিয়াছিল, এই বার যেন ধীরে ধীরে তাহা পত্রেপল্লবে শাখা-প্রশাখায় ফুলে ও ফলে ভরিয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল ভুবনের সকল রঙ্গ রস বর্ণ-গন্ধের মধ্যে। এক সময় নিশি পোহাইল, আর তাহারও সচকিত হইয়া উঠিল।

: নাহ, এইসব ইচ্ছাটাই সব না জোবু, একটা উপায় বাহির করতে হয়। জোবেদাও নিজেকে সংযত করিয়া লইতে চাহিল। শিকদার অন্য কিছুর প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ না করিয়া সে তাহাকে কোনো পরম শান্তির মতো ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলে সে হয়তো বাস্তবিকই খুশি হইতে, যে-সোহাগ তাহার দেহেমনে মাঝে মধ্যে অমন অত্যাচারী আসগরউল্লার জন্যও দেখা দিতে উদগ্রীব হইয়া উঠিতে চায়, সেইরকম কোনো তৃপ্তি সোহাগে শিকদারকেও আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারিলে সে কোনো কিছুকেই আর পরোয়া করিত না। একদিন শিকদারের পৌরুষকারের বিষয় লইয়া কবে কী ব্যঙ্গ করিয়াছিল, অথচ আসগরউল্লাহকে করিয়াছে ঘৃণা; কিন্তু যেইরূপ দয়িতা রমণী সে হইতে চাহিতেছিল, সে সম্বন্ধেও তাহার কোনো স্থিরনিশ্চয়তা ছিল না।

ভুবন জুড়িয়া দেখি দিবস-নিশীথে
দেহ মন ভাসে রঙ্গে-রীত প্রকৃতিতে
কারে তুমি দুঃখ বলো কারে কও সুখ
পিরিত না জানিলে তারে জীবনও বিমুখ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইক্ষণে মৃদু হাস্য, এই ক্ষণে রাগ
কিছু কার্য, কিছু ভাষ্য, আদর-সোহাগ
নরনারী রঙ্গে রসে কাটাইলে নিশি
এই রসে-বশে বাঁধা আছে জগৎ সংসার
তারে এড়াইতে পারে হেন সাধ্য আছে কার?

ঘটনা জানিয়া মনসব সর্দার তাহার স্বভাবমতো ঠা ঠা করিয়া হাসিয়া উঠিল, শিকদারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল : এইবার সে না একটা কামের লাহান কাম হইতে আছে মর্দ। মনে কয় বিষয়টা সম্বন্ধে আরও অনেক আগে থেকিয়া উদ্যোগ করণ উচিত আছিল। আমি তো তোমারে কইছিলাম, ইশারাও দিছিলাম। তুমিই যেমন কেমন, সাহস লইয়া আউগাইলা না।

শিকদার বিনীতভাবে তাহার কারণ দেখাইতে চাহিল : সর্দার, আপনাগো রাজ-রাজ্যে বাস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা কই, তাই বলিয়া কখনও কোনো জোর জবরদস্তির মধ্যে নিজেরেও জড়াইতে চাই নাই। আমি তো মনে করি কেবল আমার চাওয়াটাই বড়ো কথা না, অন্যজনও আমারে চায় কিনা তার প্রমাণ না পাইলে আমার পৌরুষ উৎসাহী হয় না।

: আর এখন?—মনসব সর্দার দৃষ্টি নাচাইয়া থামিয়া উঠিলেও প্রসঙ্গটা বদলাইতে ব্যস্ত হইল : তবে একথা অবশ্য ঠিক, চলতি সমাজ-বিধি নিয়মাচারেরও খেলাপ করণ যায় না। এমন বড়ো এস্টাটটা আমার চালাইতে হয়, রাজ-রাজ্যের উপর যাতে কোনোরকম দোষারোপ না পড়ে সেই দিকে চোখ রাখতে হইবে নিশ্চয়। আমি তা ভাইবে বিচারাইয়া বাহির করতে আছি। এখনই। যদিও ঠিক ও হইতে আছে না তবু সে এখন আছে তোমার বাড়িতে। থাউক, কেউ জানলো না আর কোনো জানান দেওনেরও দরকার নাই। বড়োমিঞার দরবারে গিয়া ওঠলেও অনেকরকম ফ্যাকড়-ফ্যাচাং-এর বিপদ আছে। দেখি, এখন বিষয়টা কী দাঁড়ায়। তুমি চিন্তা করিও না। কেবল এই কথাটা খেয়াল রাখিও যে, নিজে পরিষ্কার থাকলে কেউরে কিছু ডরানের কারণ নাই। কী বলো, এ?

শিকদার তাহার ব্যস্ততা লক্ষ করিয়াও বলিল : আমার আরও একটা আরজ আছে সর্দার। সেই দিন আপনে ভাটির দেশে বসতের কথা কইতে আছিলেন। আমরা সেইখানে যাইতে পারি না?

মনসব সর্দার একটুকাল অবাকভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল : আরে, এখন সবে একটা ব্যবস্থা সুসার হইয়া উঠতে আছে আর এখনই এই দেশত্যাগের কারণটা কী হইছে?

শিকদার নতমুখে বলিল : দেশত্যাগের বিষয় আদৌ না সর্দার। সব সুসার হইবে কিনা সেই বিষয়েই সন্দেহের কারণ আছে। আমরা বুঝ করিয়া দেখছি তার ওই ভাইর বাড়িতে এমন দীর্ঘকাল সে থাকতে পারবে না।

: দীর্ঘকালের কথা আসে কেন? তার ভাইরে পাইলে ওই ব্যাটারে তলব করিয়া সব ডিশমিশ করিয়া দিমু।—মনসব সর্দার আর সময়ক্ষেপণ করিতে চাহিল না।

: তেমন সহজ না সর্দার। বিধি-বিধানে অনেকরকম বাধা-নিষেধও আছে। আর সেই কথা ছাড়াও আমারও যেন কেন বিশ্বাস হইতে আছে না যেমনটা চাই তেমনই সত্য হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। আমি আরও চাই ওই মুলুকের জীবনের মধ্যে গিয়া কিছুদিন বাস করি। অন্তত একটা ঋতু, একটা সন্দের কাল কাটাইয়া আসিয়া নিজেগো মতে বসবাস আর কঠিন হইবে না।

মনসব সর্দার একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল : না মর্দ, মাঝে মধ্যে তুমি বড়ো জটিল হইয়া যাও, কোনো রকম ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাও। বেশ তো, সেইরকম যদি চাও, সে ব্যবস্থাও করণ যাইবে। বড়োমিঞার বাড়ির উৎসবের পরে পরেই আরেক বহর রওয়ানা দিবে সেইদিকে, সেইসঙ্গেও যাইতে পারবা—তবে সমূহ বিষয়গুলান আমারে একটু পরিষ্কার করিয়া লইতে দেও। আর হ, আমার কথা যেন মনে থাকে, ওই উৎসবে তোমার গীত-গান এমন হওয়া চাই যাতে আমাগো দেশ-দশের মুখ থাকে হ, সেই কামে ত্রুটি রাখিও না।

অথচ সেই ফরমায়েশটা পূরণ করার বিষয়েও শিকদার বেশ অস্থির বোধ করিতেছিল। কতদিন ধরিয়া সে মনের মতো পদ সাজাইতে চাহিয়াছে, এমন কিছু গাহিতে চাহিয়াছে জীবনের সমস্ত কর্মে সমস্ত আচারে যাহার কোনো অর্থ হয়, সংগ্রাম হইতে মানুষকে বিমুখ করিবার জন্য নয়, বরং সেই সংগ্রামের জন্য আরও উজ্জীবিত আরও উৎসাহী করিয়া তুলিতে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেইরকমও কোনো পদ-রচনাই তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু মনসব সর্দারের আশ্বাস পাইয়া সে নিজেকে একটু হালকা বোধ করিল। বাড়ি ফিরিয়া দেখিল জোবেদা তাহার সংসার সাজাইতে ব্যস্ত, কাদায়-গোবরে মাখামাখি হইয়া দুলিয়া দুলিয়া সে আলপনা আঁকিয়া চলিতেছিল বাড়ি ভিতে-খাটালে : অন্তত পুথি-পত্রগুলি বারান্দা হইতে নামাইবারও অধিকার সে তখনকার মতো পাইল না।

: কতদিন কেউর হাত পড়ে নাই—জোবেদা বাহু উঁচাইয়া মুখের উপর হইতে কাদামাখা হাত সরাইতে সরাইতে বলিল : এখনও কাঁচা। একটু শুকাইয়া উঠুক তা না হইলে সব পরিশ্রম নিষ্ফল হইয়া যাইবে।—সে হাঁপাইতেও ছিল, তাহার আঁটঘাটভাবে শাড়িমোড়া দেহের দিকে শিকদারকে তাকাইতে দেখিয়া সে তাহাকে বেশ একটু ভর্ৎসনা করিয়া সরাইয়া দিল।

: তুমি যাও, ওই আমগাছের তলায় জাল-খালুই বাহির করিয়া রাখছি। কিছু মাছের যোগাড় করো, ঘরে মুখে দেওনের অন্য কিছুই নাই।

যদিও মনে অন্য উদ্বেগ, তবু শিকদার অপ্রসন্ন বোধ করিল না। বরং একটা খুশিই ছড়াইয়া পড়িল সমস্ত দেহমনে, চিন্তায়। ঘর-গৃহস্থালির ছন্দ, চিত্র এবং কাব্য সে নিত্যদিন দেখিতেছে, দেখিয়াছে; এই ইহ-জীবনটাকেও এমন সুসম্বদ্ধ ছন্দে ছন্দে সাজাইবার গীত-গান সে কেন উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে?

মনে পড়িল একবার সে সদর-শহরে এক নৃত্যগীতের আসের গিয়াছিল কৌতূহলী দর্শন-শ্রোতা হইয়া। বিরাট কাণ্ড, সব উঁচা উঁচা মহলের ধনী-মানীজনের কারবার। মঞ্চের উপর রেশমি পোশাক পরা গায়ক-গায়িকারা ভাটিয়ালী ভাওয়াইয়া শোনাইল, দুম দুম করিয়া মঞ্চ কাঁপাইয়া জেলে নৃত্য দেখাইল, আরও কত কী কী। সেইদিন হইতে শিকদারের মনে একটা ইচ্ছা ক্রমাগত প্রবল হইয়া উঠিতে শুরু করিয়াছিল। যদি সে পারিত একটা প্রকাণ্ড মঞ্চের উপর সেও একটা বিপুল দলবল লইয়া দেখাইত, 'সদা হাস্য মুখ গুড়ক পান' কত দেশের মানুষের অন্তর্জীবনে কত ছন্দ, কত গীত-গান-নৃত্য তাহাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিটি কর্মে-ধর্মে জীবনাচারে। সাহেব-বিবিদের কেবল সেইটুকুই চক্ষে পড়ে যার কথা অন্য কেউ বলিয়াছে অথবা প্রয়োজনে লাগে। যাহাদের জীবনে সকল ছন্দ সকল সুর আরও বিস্তৃত আরও মনোহরণ হইয়া উঠিবার কথা, তাহার স্বাভাবিক বিকাশও যেন ক্রমাগত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। কোনো কোনো আসরে তাহার ওস্তাদ এবং তাহাকেও পল্লীগীতির গায়ক অথবা পুথিয়াল বলিয়া পরিচয় করাইয়া দেওয়ার মধ্যেও খুব অস্বচ্ছন্দ বোধ করিয়াছে ব্রাত্যজনদের মতো।

যদি পারিত সে দেখাইত একই সঙ্গে, বিরাট পেটকাটা নৌকার মধ্যে মাল্লারা কী ছন্দে, আগু-পিছু করিয়া দাঁড় টানে, হালের মাঝি বুকে হালের হাতল চাপিয়া দোল খায় নৌকার পিছনে, চাষি যেমন করিয়া পাট ধোয় বুক সমান জলাশয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া, ধান কাটে সারি-সারি বসা কৃষকেরা, কী ছন্দে ঢেঁকিতে পাড় দেয় কী ধান এলাইয়া দেয় গৃহস্থের বউ-ঝি, ঘরের পিড়া কী বাইরের উঠান লেপে ক্ষীরের মতো কাদামাটি দিয়া, কী ছন্দে কোল দেয় শিশুকে, দোল দেয় প্রতিটি গৃহকর্মে আর তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া একা-বৈঠার নৌকা চলায় কেরায়া নায়ের মাঝি, গলুই-এর পাটাতনের উপর বসিয়া জাল বোনে জেলে, কর্মকারেরা করাত টানিয়া অথবা অন্য হাতিয়ার চালাইয়া ক্রমাগত তাহাদের অখণ্ড জীবন-কাব্যকে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীত-কথা নয়, কোনো আত্মবিলাপও নয়, একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন-গীত কথা প্রস্তুত করিতে পারিলে সে যেন বাস্তবিকই সন্তুষ্টি বোধ করিত। কিন্তু আপাতত সেইসব চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া ছাড়া তাহার আর অন্য কোনো গত্যন্তর ছিল না। মাছ ধরা শেষ করিয়া আসিয়া সে জোবেদাকেও সেই ইচ্ছাটার কথা বলিবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু মাছের খলুইটার মধ্যে উঁকি দিয়া জোবেদার মুখভাব পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। সে একটু বিব্রত বোধ করিল : কী হইল?

জোবেদা খলুইটা হাতে লইয়া সরিয়া গেল : কী আবার হইবে। আবারও মনে কইলো সেই বাড়ির মলাঙ্গি মাছগুলান যেন এইদিকেও সাঁতরাইয়া আসতে শুরু করছে। তুমি যাও, এখন বারান্দায় উঠিয়া বসতে পারো, আমার অনেক কাজ পড়িয়া আছে, তবে তেমন একটা দেরি লাগবে না।

শিকদার একটু সাফাই দিতে চাহিল যে মনে অন্য চিন্তা ছিল বলিয়া মাছ ধরার বিষয়ে তেমন মনোযোগ দিতে পারে নাই, হউক সেই মাছ ক্ষুদ্র, কিন্তু সেই বাড়িতেও যদি সে এমন চমৎকার রাঁধিতে পারিয়া থাকিবে, তা হইলে মাছগুলি যেন ইচ্ছা করিয়াই আসিয়া ধরা দিয়াছে। কিন্তু কিছুই বলা হইল না। সে বেশ একটু গৃহস্থ-গৃহস্থভার-ভারিক্কি লইয়া তাহার প্রিয় ঠাঁইটিতে উঠিয়া গেল; কোলে লইল দোতারা, সম্মুখে খুলিয়া বসিল পুথিপত্র, বড়োমিঞার বাড়ির উৎসব আসন্ন, অথচ কোনো কিছু সম্পন্ন করা হয় নাই, যদিও তাহার উপর এখন অনেক কিছুই নির্ভর হইয়া রহিয়াছে। কোনো চেষ্টার নয়, একদিক-সেইদিক কয়েকবার দৃষ্টি বুলাইয়া সে আপন মনেই গুনগুনাইয়া উঠিল :

মনা, তুমি বুঝি আর মান রাখতে পারলানা
আমি সুমুখ দুয়ার খুলিয়া দিলাম
তুমি তখন পাছ দুয়ারে ডাকো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন আবার সেই দুয়ারে গেলাম
মনা, তুমি আবার কোনখানে যে ঢাকো।

হঠাৎ সেই অনায়াসে উচ্চারিত পদ গুলির প্রতি সে অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিল, দোতারায় বোল বাঁধিয়া সে আরও আগাইয়া যাইতে চাহিল :

মনা, তুমি বুঝি মন জানতে পারলা না।
তুমি কেবল কেবল বাহির দেখো
আর অন্তরে যেই বসত বাড়ি
তার মধ্যে আছে কোন জনা গো
সেই কবিরাজ সেই নাড়ী গো ধরতে পারলা না ॥
মনা, তুমি বুঝি আপন মনও জানলা না
তুমি যেইখানে যাও সব ঠমক-ঠমক
কেবল কেবল করছে আপন হারা
চতুর্দিকে চায় আরও চমক-চমক
মনা, কার ফাঁদে যে কারে বাঁধে সেইটা জানলা না ॥

কিন্তু চরণগুলি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আবৃত্তি করিয়াও শিকদার সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; মনে হয় সবই চটুল-চপল, তাছাড়া সেই নিত্যকালের ভাব-বিলাসের কথাবার্তাই আবারও ফুঁড়িয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। সমালোচনা নয়, তিরস্কার নয়, কোনোরকম আত্মবিলাপের কথাও নয়, তাহাকে অন্তত অবশ্যই নতুন কোনো কথা খুঁজিয়া পাইতে হইবে। কথাও নতুন না হউক, হউক সে হাটে-মাঠে-ঘাটে, জীবনের খণ্ড খণ্ড ভগ্নাংশের মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া শস্যকণা, তাহাকেও ধুইয়া মুছিয়া দেহাতি পিঠার মতো সাজাইয়া লইতে পারিলেও সে অধিকতর খুশি হইবে। তাহার মন বলিতে লাগিল সেই কথা সে এইবার খুঁজিয়া পাইবে, সে কাহারও বিশেষ কথা নয়, জীবনেরই গান গাহিবে। সেই জীবনের কথায় আবার বিশেষ বিশেষ, সামান্য বিশিষ্ট হইবে। শিকদার চক্ষু বন্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে তাহার দোতারায় ক্রমাগত নতুন বোল তুলিয়া নতুন কথা জুড়িয়া দুঃসাধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মগ্ন হইয়া রহিল।

জোবেদা একসময় আড়াল হইতে তাহাকে কিছুক্ষণ দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না।

অরুণ-বরুণ কিরণমালা
রূপ ভোমরার ঘর।
শিশুর কালে দেখাইলা কোন
অচিন সওদাগর
হাতে তাহার মোহন বাঁশি
মাথায় শোভন তাজ
রূপ-স্বরূপের মধ্যে দেখি
মনের মহারাজ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসিও তুমি যাইওরে তুমি
যেমন পরান চায়
প্রাণের কথা পুরান হইলে
আমার বিষম দায়
কাদা ছানিয়া গড়োরে কুমার
সাধের সংসার
তাহার সাথী প্রাণের সাথী
এই জনমও সার ॥

দেশের প্রধানের বাড়িতে বিপুল উৎসব, আর আয়োজনও বিরাট। সমস্ত পুরীতে নানা সজ্জা, একধারে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বাঁধা শামিয়ানার তলে মূল অনুষ্ঠান; অন্য এক প্রাঙ্গণে শত শত অতিথিদের জন্য নানারকম দীয়তাং ভূজ্যতাং-এর ব্যবস্থা গৃহপুরীর তোরণ দ্বারে বিদেশ হইতে বায়না আনা বাদ্যদলের নৈপুণ্যে; সমস্ত দিক-দিগন্তে সেই উৎসবের রেশ ছড়াইয়া পড়িতেছিল। দায়ে পড়িয়া শিকদারকে আসিতে হইল বটে, কিন্তু সে আরও অপ্রস্তুত বোধ করিল, আরও ঘাবড়াইয়া গেল।

সকল কিছুর তদারকে ব্যস্ত মনসব সর্দার স্বয়ং। দেহে তাহার বাহারের সাজ, তেলমাখা চুলে টেরি কাটিয়া ফুলতোলা টুপি চাপাইয়াছে একধারে; হাতে মুখে, দাড়িতে, বগলের লাঠিতেও নানারকম রূপ-প্রসাধন করিয়া সে সকলেরই অতি দ্রষ্টব্য হইয়া উঠিয়াছে; তাহার চোখে মাখা সুর্মার গুণে দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল আরও তীক্ষ্ণ বলিয়াই সম্ভবত শিকদারের সসংকোচে উপস্থিতি তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। যেমন তাহার স্বভাব সে তৎক্ষণাৎ প্রায় হুড়মুড় করিয়াই তাহার সামনে আসিয়াছিল, তারপর হাত ধরিয়া শামিয়ানার তলায় একধারে বসাইয়া দিল; তারপর কানে কানে বলিল : এইখানে কেবল গায়ক-কবিয়ালদের আসন। আশে-পাশের সকলকেই বাহির হইতে আনা হইছে। তারাই শুধু করবে পয়লা। তুমি যেন কিছু মনে করিও না। আর, এই মর্দ, ঘাবড়াইও না।

শিকদারকে সে একরকম চাপিয়া বসাইয়া দিয়াই আবার অন্য কোনো দিকের তদারকিতে ছুটিয়া গেল। জোবেদার হাতে ধোওয়া সামান্য সাধারণ জামাকাপড় যথাসম্ভব বিন্যস্ত করিয়া শিকদার অন্যান্য গায়কদের সসংকোচে দেখিয়া লইতে চাহিল। তাহাদের একজনও তাহাকে লক্ষ করিতেছিল, একটু ঝুঁকিয়া জানিতে চাহিল : মনে কয় কোথায় যেন একবার দেখছিলাম আপনারে। কী ধরবেন, শারি না জারি?

শিকদার মাথা দোলাইল; কোনোটাই নয়, এখনও সে মনস্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই, সেই এমন বিখ্যাত কেউ নয়, হয়তো সে তাহাদের মতো গুণীদের সঙ্গে একই সারিতে উপবেশনের যোগ্যতাও রাখে না।

: একলা? অন্য কোনো বাদক দোঁহারও নাই?

শিকদার আবারও মাথা নাড়িল; হাসিতে চাহিল : আপনাগো লাহান বড়ো আমি কেউ না। আমার সঙ্গী এই—বলিয়া সে নিজ দোতারাটা দেখাইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: সর্দার খাতির করে, সেই সুবাদে আসা।

: ও!—সেই লোকটি দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্যদের সঙ্গে আলাপে মনোযোগ দিল।

ইতিমধ্যে সর্বত্র একটি চাঞ্চল্য দেখা গেল। কোথায় আসিয়া বসিয়াছেন দেশ-প্রধান এবং তাহার সমস্ত সভাসদগণ তা শিকদার অনেক উঁকি ঝুঁকি দিয়া দেখিতে পাইল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জারি শুরু হইয়া যাইতেছে টের পাইয়া সে সেইদিকে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিল। তাহারই পাশে বসা দোহার এবং মূল গায়ক যে ভঙ্গিতে এবং দৃঢ়তায় সকলের সম্মুখে দাঁড়াইল, কেবল মাত্র তাহা লক্ষ করিয়াই শিকদার অবাক হইয়া রহিল। সময় লাগিল সেই মূল গায়কের কথাগুলি উপলব্ধি করিতে। দেশে দেশে আসরে আসরে ক্রমাগত গাহিয়া গাহিয়া হয়তো তাহার কণ্ঠস্বরে আর তেমন কোনো তারুণ্য নাই, কিন্তু এমন কিছু ছিল যা সমস্ত আসরকে যেন মুহূর্তকালের মধ্যে স্তব্ধ করিয়া দিল, যেন একটা বিরাট সমুদ্র তাহার অঙ্গুলি হেলনে স্তব্ধ হইয়া গেল।

পিছন দিক হইতে তবু কে কাহাকে ফিসফিস করিয়া বলিল : গণি বয়াতী, গণি বয়াতী তার এই জারি সে সাতদিন সাতরাত্রি ধরিয়া গায়। মনে কয় এখন সে কেবল মুখ রাখার জন্য আরেক রকম করিয়া শুরু করিয়াছে।

: হিসস্।

শিকদার সেই বয়াতীর নাম-ধাম জানিয়াছে, কিন্তু এইরকম মুখোমুখি হইবার কোনো অবকাশ পায় নাই। সে লক্ষ করিল কী বিপুল শ্রম আর অধ্যবসায় করিয়া একজন গায়ক এমন করিয়া মানুষের সমস্ত মনোযোগ, তাহার হৃদয়ের সমস্ত তরঙ্গের উত্থান-পতনের উপর নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিতে পারে। কোথায় কোন দিগন্তের সেই ধূ ধূ মরুভূমি, গাছপালা নাই, বাতাস নাই, মাথার উপর একটা প্রচণ্ড সূর্য জ্বলিয়া জ্বলিয়া চতুর্দিক জ্বালাইয়া দিতেছে, মরুভূমির বালুকণাগুলি যতই স্থান পরিবর্তন করিতে চাহুক, সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের নিয়ামকের আজ্ঞা ব্যতীত তাহাদের কোনো অস্তিত্ব নাই, অবয়ব নাই, ভরসা নাই। গায়কের মুন্সিয়ানা এবং প্রত্যয় দেখিয়া সে আরও ক্ষুদ্র আরও অপ্রস্তুত বোধ করিতে লাগিল। অথচ সে তাহার সেই সব বর্ণনাকেও অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। সম্ভবত সে স্বয়ং গীত-কথা তাহার সুর লয় তাল এবং তাহার শ্রোতা-সচেতন কঠিন-কঠোর শ্রম উপলব্ধি করিতে সক্ষম বলিয়াই সে খেয়াল করিল কী নৈপুণ্যে সে এমন জনগণ মন-নন্দিত কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে পারিয়াছে। শিকদার আরও উন্মুখ হইয়া সেই কবিয়ালের বর্ণিত জগৎ, তাহার কীর্তিত সত্যের মধ্যে তাহার অনুভবের মধ্যে নিজেকে একাত্ম করিয়া লইতে চাহিল। দোঁহারেরা যে-প্রতিধ্বনি তুলিল, যে-ধূয়া তারস্বরে প্রচার করিতে চাহিতেছিল, তাহার যান্ত্রিকতা এবয় কপটতা খেয়াল করিয়া সে ক্ষুব্ধও হইয়া উঠিতেছিল, বেশ কয়েকবারই মন চাহিল সে স্বয়ং উঠিয়া গিয়া দোঁহারদের কীর্তন বন্ধ করিয়া দেয়, বলে তাহারা শ্রোতাকে মূল হইতে বিচ্যুত করিতেছে নিরাকার রূপকে সাকার করিবার প্রগলভতায় মত্ত হইয়াছে, কিন্তু সে অধোবদন হইয়া রহিল।

এক সময় মনসব সর্দার তাহাকে ডাকিয়া নিল : খাওয়া-দাওয়া করছ মর্দ? জীবনটা কেবল কারবালা কি রোজ-কেয়ামতের ডরে ভরাইলে চলে না, যিনি হায়াত দিছেন, অন্তত তার সম্মানেরও কিছু ভালো-মন্দ মুখে দিতে হয়। তুমি এখন ওইদিকে যাও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিদমতগারদের বলা আছে, তোমার ইচ্ছামতো খাও-দাও, ফূর্তি করো, আমি যতক্ষণ আছি তোমার কোনো ভাবনা নাই।

শিকদারের ইচ্ছা হইল তবু, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, যে-ব্যবস্থার উপর ভয় করিয়া সে এমন সহজ সরলভাবে সমস্ত কিছুর মধ্যে গলিত মিশ্রিত হইয়া যাইতে চাহিতেছে, তা সবই ঠিক আছে কিনা; কিন্তু একটুক্ষণ কোথায়ও থির হইয়া থাকা যেন মনসব সর্দারের ধাতে নাই, ব্যস্ত না থাকিলে সে হয়তো কোনো সুখও অনুভব করে না। সে অমন জম-জমাট আয়োজনের মধ্যে আহারেও অভ্যস্ত ছিল না, তাহার উপর সেই সব খাদ্য এমনই উপাদেয় যে শিকদারের পক্ষে মনে হইল উপবাসে না থাকিলে তাহার অন্য সকল চৈতন্যও অবলুপ্ত হইয়া যাইবে।

জারির গায়ক তখনও বর্ণনা করিতেছিল ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের কাহিনি; কীভাবে জীবনের সমস্ত অধিকার হইতে বিপুল মানুষের গোষ্ঠীকে বঞ্চিত রাখিয়া একদল স্বার্থপর শয়তান দিক-দিগন্ত পরম আহাজারিতে ভরিয়া তুলিতেছিল। দোঁহারদের ধূয়া শুনিতে শুনিতে আবারও তাহার মনে হইতে লাগিল জীবনের সকল সত্য নিশ্চয়ই কোনো যৌথ উপলব্ধির বস্তু, গায়ক এবং দোঁহার-শ্রোতা যথার্থই একাত্ম হইতে পারিলে মানুষের সমাজেও হয়তো আর কোনো দুঃখের ঠাঁই থাকিত না।

: এই বয়াতীর এক একটি ভাব, এক একটি পদ ভালো করিয়া বুঝতে হয়, তার মধ্যে ডুব দিতে হয়। আশপাশের জনতার মধ্য হইতে কে একজন বলিল : বয়াতীরও বয়স হইছে, এখন এক গুষ্টি সাগরেদরাই তারে এখান থেকিয়া উড়াল দেওয়াইয়া আরেক খানে লইয়া যাইতে আছে। এই সমস্ত গীত-কথা কি এক দুই পহরে বুঝিয়া উঠার জিনিস। ওনার আসর সাত-দশ দিন রাত্তির ধরিয়া চলে, এক একটি পদ এক একটি ভাব প্রবলই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বয়ান করে। মনে কয় নিজেও যেন তারে পরখ করিয়া লয়।

মুখ ঘুরাইয়া শিকদার সেই লোকটিকে দেখিতে চাহিল; কিন্তু কাছাকাছি জনতার মধ্যে সেই ব্যক্তিটিকে আর বিশিষ্ট করিয়া দেখিতে সক্ষম হইল না; আরও উৎসুক হইয়াছিল এই কারণে যে তাহার কথার মধ্যে যেন পিতামহ করমালীরই কোনো কোনো উক্তি কানে বাজিয়া উঠিল।

তিনি বলতেন : ওরে মনা,—কখনও তিনি আসল নামে, কখনও বা বে-নামে ডাকিতে তাহার মন চাহিত, এক এক সময় শুধুই ডাকিতেন, কিছু বলিতেনও না, কখনও কারণ জানিতে চাহিলে হাসিয়া বলিতেন, 'ডাকি, এমনিই ডাকি, ডাকিয়াও একটা সুখ আছে রে।' সেই পিতামহ বলিতেন : বারংবার হইবেই তো। তবে কান পাতিয়া শোন, কক্ষনো সবই এক রকম না! ওইখানেই কৃতিত্ব, যেন কোনো একটা সত্যের দিকে নানানভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাহার পর এক সময় সত্যকে ছুঁইয়া দেওয়া। গায়ক যখন তার সেই খেলায় সম্পূর্ণ ডুবিয়া যায়, তখন তার চতুর্দিকের শ্রোতারাও যেন তারই অবয়ব হইয়া ওঠে। এমন যে সব লোকগীতি তাও বড়ো উঁচারকম বিষয় হইয়া যায়। কখনও মনে করবি গায়ক যেন কোনো জহুরি, মনি-মাণিক্য পরখের লাহান কতভাবে, কত দিক হইতেই না দেখে, তার সুর স্বর অন্যের চৌখেও পরীক্ষা করাইয়া লইতে চায়। এ জন্যই যেন সেইসব আসরের আর অন্ত থাকে না। আবার এমনও দেখি কোনো গায়কের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবই যেন কোনো পরম কী চরম পাওয়ার শামিল হইয়া ওঠছে। বড়ো হ, দেখবি, তোর চৌখেও ধীরে ধীরে অনেক কিছু স্পষ্ট হইয়া উঠবে।

আরও কিছু কিছু কথা মনে পড়িয়া গেল। বাড়ির কাছাকাছি ছোটো গাঙের পাড় ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে একসময় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেন; একটু এইদিক-সেইদিক দেখিয়া হাতের লাঠি উঁচাইয়া বলিতেন : এই দেখ কেউ কয় এরেই গঙ্গা, অথচ আসল গঙ্গা কত দূর। একবার একদল ব্যাপারীর সঙ্গে উজাইয়া যাইতে শুরু করছিলাম মেঘনায়, তারপর সেইখান দিয়া ব্রহ্মপুত্রে। আমিও দেখতে চাইছিলাম কোন রাজ্য হইতে এমন শিরা-উপশিরার লাহান নামিয়া আসছে সব। যখন গীত-কথা শুনি, তখনও মনে হয় তারও একটা উৎস আছে। একবার যে প্রান্তে আসিয়া খাড়া হয়, তারে আরও গভীরে যাইতেই হয়। কিন্তু আমার লাহান অভাজনরা পারে না, পায়ের তলায় কাদা নরম, দেহ মনে আর জোর নাই, আমরা কেবলই বিহ্বল হইয়া পড়িয়া রই।

শিকদার মন হইতে দূর করিয়া দিতে চাইল সেইসব কথা। আসরের জারি তখন আরও জমিয়া উঠিয়াছে; সাত-দশদিন না হউক, অন্তত সন্ধ্যার আগে তা সমাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হইল না। তাহার দৃষ্টি আবারও মনসব সর্দারকে তালাশ করিতে লাগিল। আবারও মনে হইল, সেই আসরে সে নিতান্তই অপ্রস্তুতভাবে উপস্থিত হইয়াছে। আরও অনুভব করিল তাহার মন স্থির নাই, চিত্ত স্থির নাই, সে যেন আর কখনও এমন কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি হয় নাই।

ইতিমধ্যে জারি শেষ হইয়া গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থাবার মতো একটা হাত তাহার ঘাড়ে পড়িল : এই মর্দ, কোথায় তুমি এখন ঘোরাঘুরি করতে লাগছ? এখন উপাসনা আর দোয়া-দরুদের পর কিছু খানা-পিনা। তারপরই তোমার পালা।

শিকদার সরাসরি তাহার দিকে চাহিয়া কিছু বলিতে গেল; কিন্তু সে শিকদারের কাঁধে একটা চাপ দিয়া বলিল : আমারে এত্তোবড়ো এস্টাট চালাইতে হয়, তায় আইজকার কাণ্ডকারখানা তো দেহো; তুমি কিছু দুশ্চিন্তা করিও না। যাও যাও, সককলের সঙ্গে শামিল হও, একলা হইতে নাই।

চতুর্দিকে লোকজন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি করি করিয়াও যেন আর সুযোগ হইল না। মনে মনে সে নিজেকে প্রবোধ দিবার সুযোগ করিল, সেই গোপন বিষয়টি যখন মনসব সর্দার ব্যতীত অন্য কেউই জানে না, জানিবার কোনো কথাও নয়, সুতরাং সুসার মতো সবই ঠিক না থাকিলে মনসব সর্দারই তাহাকে কোনো একান্তে ডাকিয়া জানাইয়া দিত। অন্তত তখনকার মতো সে বাস্তবিকই সেই দুশ্চিন্তার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চাহিল।

শ্রীঅঙ্গ যেমন তাহার বিভূতিভূষণ
মৃদুভাষ অরণ্যের কথোপকথন
নিশা হইয়া ঢাকে সব দশ দিশা
আকুলি-ব্যাকুলি করে জীবন-অন্বেষা
আশার প্রদীপ জ্বালে গগনের তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথে নামিয়া পথ খোঁজে এক দিশাহারা
দুঃখ বলে সুখ দেও, সুখ বলে আসো
জগৎ কাঁদিয়া বলে কারে ভালোবাসো?
আমি আমি করি ভরো জগৎ-সংসার
ভুবনে নামিয়া দেখো সবই নিরাকার
গৃহে আছে অন্তঃপুরা অন্তরেতে গৃহ
একে আন মিশাইয়া বিধি বানাইছে দেহ ॥

গানের আসরে শিকদার যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখনও তাহার বুক কাঁপিতেছিল। দীর্ঘদিনের অনভ্যাস, তাহার উপরে কোনো গীত-কথার প্রস্তুতিই যেন তাহার ছিল না। সম্মুখে স-পরিষদ দেশের প্রধান, অজস্র গুণীজন, দেশ-বিদেশ হইতে আসা অগণ্য জনতা; কেবল শামিয়ানার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ডে-লাইটগুলির আলোই একসময় সেই চতুর্দিক নিরাবয়ব করিয়া দিল। এক সময় খুশি হইয়া দেখিল, সেই এক সময়ে পাশে-বসা দোঁহারদের কয়েকজন তাহার কাছে আসিয়া ফরাশের উপর বসিয়াছে। একজন একটু হাসিয়া ফিস ফিস করিল : যদি কোন ধূয়ার দরকার হয়।

মনসব সর্দারও বুক ফুলাইয়া চতুর্দিকটা দেখিয়া লইল; তারপর শিকদারের দিকে ফিরিয়া ইশারা করিল : কই, দেরি কেন মর্দ, শুরু করো।

শিকদার চক্ষু বুঁজিয়া দুই হাত বুকের কাছে জড় করিয়া আনিল; সমস্ত আসর তখন ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; শিকদার সমস্ত অন্তঃকরণ হইতে, তাহার মধ্যে কোনো ডুবুরির মতো ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া তাহার গীত-কথাগুলি আহরণে মন দিল।

আমার বন্দনা গ্রহণ করো, প্রভু দয়াময়
অভয়-শরণ, মাঙে বরাভয়, হইও সদয়।
তোমারই মহিমা এই বিশাল পৃথিবী
একভাবে মাটি আর অন্য তিনে বিপুল জলধি
কত জীব কত প্রাণ ইহাতে বিচরে
আশা-বাসনা যা-ই কিছু তারা বোধ করে
সেই অরূপ-স্বরূপ সব তোমা হইতে হয়
তুমিই স্বজন করো, দিতে পারো জয়
তোমারই বরাবরে প্রথম প্রার্থনা আমার
রাখিও রাখিও মান এই অধম বান্দার।

নতমস্তকে যেন অত্মগতভাবে সেই প্রার্থনা করিয়া শিকদার এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর এক এক করিয়া চতুর্দিকের শূন্যের দিকে চাহিয়া পৃথিবীর সমুদয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীর্থক্ষেত্র এবং নগরাদির বন্দনা গাহিয়া সে চক্ষু মেলিয়া আসরের জনতার দিকে তাকাইল:

অতঃপর বন্দনা আমার যত সভাজনে
এমন ভূষণ দিয়াছে অকিঞ্চনে।
আকাশ আছে, পঙ্খি ওড়ে, বৃক্ষ আছে ফল।
দেশ-দশা গীত কথা সুরস্বর আমারও বল!

সমস্ত আসার শিকদারের প্রতিটি কথা কান পাতিয়া শুনতে লাগিল; সে ধীরে ধীরে তাহার কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ গ্রামে তুলিতে তুলিতে দেশ প্রধান এবং সমবেত গুণীজনেরও বন্দনা করিল; তারপর একসময় আরও উচ্চতর কণ্ঠে জানাইল :

সর্বশেষে বন্দী আমি সেই মহাজনে
আনিয়াছে এই খানে যে এত সভাজনে।
যার জন্মে এত মর্মে হুন খুশি বয়
কালে সে-ই এক মহাজন হইবে নিশ্চয়।

এই সময় শিকদার পাশে ঝুঁকিয়া দোঁহারদের একটা ইঙ্গিত করিয়া আরও উচ্চকণ্ঠে দুইটি পদ গাহিল:

যার সঙ্গে এত রঙ্গে সব এক সাথ
তার জন্য জগৎ ধন্য আল্লা-রাহামাত।

দোঁহারেরা শেষ দুইটি চরণের আবৃত্তি শেষ করিতে না করিতেই আসরের চতুর্দিক হইতে বাহবাধ্বনি উঠিল; এক ঝলক বাতাস, অথবা একটা সমুদ্র তরঙ্গই যেন ধাইয়া আসিল চতুর্দিক হইতে। শিকদার একটু অবাক হইয়া পড়িলেও, তাহার মুখেও একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল যখন দেখিল বড়োমিঞাও খুশি মুখে নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়াছেন; আর মনসব সর্দারও মহা উৎসাহে আসরের ফরাশের উপর বসিয়া পড়িয়াছে, দুই হাতে বিশাল বুক বাঁধিয়া সে চতুর্দিকের সকলকে দেখিয়া লইতেছে। মুহূর্তকালের জন্য হইলেও শিকদারের মনে একটা সন্দেহ ছায়াপাত করিয়া গেল, এমন সমাদর সম্বর্ধনা তাহারই কোনো ক্রিয়াকাণ্ড নয় তো? কিন্তু আসর তখন প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, মনে হইল তা যেন কোনো ভালোবাসার পাত্র-পাত্রীর মতোই উন্মুখ ঋজু হইয়া দাঁড়াইল।

আর কোনো বিনয়-ভনিতা নয়, অতঃপর মূল গীত-কথা শুরু করিয়াছে শিকদার। বাস্তবিকই তাহার কোনো প্রস্তুতি ছিল না, তাহার সমস্ত জীবনটাই যেন একটা ধনুকের মতো টানটান হইয়া উঠিতেছিল। প্রতিদিনের জীবনাচার দেখিয়া যেই সব ভাব-ভাবনা তাহার মনে ক্রমশ একটা জীবন উপলব্ধি প্রস্তুত করিতেছিল, এইবার যেন একটা জ্যা-মুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরের মতোই তীব্র-তীক্ষ্ণ হইবার বাসনায় অধীর হইয়া উঠিল। তবুও সে সংযত হইতে প্রয়াস করিল, চক্ষু নিমীলিত করিয়া সে নিজেকে শাসন করিতে চাহিল। সমস্ত হৃদয়ের কূল-উপকূল ভাসাইয়া কোনো দুর্দম নদ কিংবা নদী যেন তাহাকেও উন্মূল করিয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছিল, কিন্তু শিকদার আত্মস্থ হইতে চেষ্টা করিল। ক্রমে ক্রমে যে গীত-কথা, তা অভিনব, কখনও কথকতা. কখনও গীত, কখনও কোনো জীবন দৃশ্যের খণ্ড খণ্ড চিত্র। কী সুন্দর এই পৃথিবী, কী বিচিত্র এই জগৎ-সংসার। ইহার মধ্যে নদীর মতো জীবন-প্রবাহ কখনও জোয়ারে, কখনও ভাটায় বহিয়া চলিয়াছে, সেই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ তরঙ্গমালা নৃত্য করিতেছে, জাগিয়া উঠিতেছে, আবার ভাঙিয়া পড়িতেছে, কোথায়ও ফুলমালা কুঁড়ি স্বরূপে চক্ষু মেলিতে চাহিতেছে আবার কোথাও শুষ্ক শীর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, একই সঙ্গে জীবন ও মৃত্যু, আনন্দ ও বেদনার দোলায় দোলাইয়া জীবনকে কোন শক্তি কোন ইচ্ছা একই সঙ্গে এমন সুখের এবং এমনই দুঃখের করিয়া তুলিতেছে? যে ইচ্ছায় নদীর তরঙ্গগুলি পাড় ধরিয়া উপরে উঠতে চায়, তাহার বধূ সমস্ত জীবনকে কেবলই শৃঙ্গার-সজ্জার মতো যত্নে সাজাইয়া তুলিতে চায়। যে-ইচ্ছায় শত দুঃখ কষ্টে অভাব-অসুবিধা-অস্বাস্থ্যের মধ্যেও ফসলের ঋতু-ধর্মকে সমীহ করিয়া সম্ভ্রম দেখাইয়া জীবনাচারে ব্রতী থাকে, যে-ইচ্ছায় কিশোরী-যুবতীর বুকের মধ্যে কামনা-বাসনা প্রদীপ-শিখার মতো কাঁপে, যে-ইচ্ছায় যুবক-তরুণ সমস্ত অন্যায়, সমস্ত অত্যাচারকে নির্মূল করিবার জন্য প্রশস্ত বক্ষপট পাতিয়া দেয় হিংস্র দানবের সম্মুখে, সেই আগ্রহ, সেই ইচ্ছা, সেই ব্যাকুলতা অহরহ বিশ্ব-ভুবনের দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার নিকট হইতে মুক্ত হইবে, না অন্য কোনো স্বার্থকতার পথ দেখাইবে না কেবল কোনো অতি পুরাতন পুরাণ-কথা শুনাইয়াই তাহাকে তুষ্ট করিতে চাহিব, কিছু চাহিব কী আদৌ চাহিব না? কেন এইভাবে দিন আসে দিন যায়, দিনও রাত্রির মতোই অন্ধকার হইয়া ওঠে, রাত্রিরও যেন আর কোনো অবসান আছে বলিয়া মনে হয় না। শিকদার কখনও শ্রুত-বিশ্রুত গীত-কথা, কখনও নিজ ধ্যান-ধারণা সৃষ্ট কথা-পূর্ণ বহাইয়া দিতে চাহিল। কখনও কখনও নিজ কথার অনুসরণ নিজ কানে শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছিল। এত কথা, এত ভালোবাসা, এত আকুলতা-ব্যাকুলতা কবে কখনও সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার মধ্যে? সে কি বাস্তবিকই কোনো রমণীদেহেরও উত্তরে অন্য কোনো জীবনানন্দে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু সে তখন যেন কোনো তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের উপর সওয়ার হইয়াছে, দিক-দিশা ঠিক রাখাই তখন তাহার চিত্ত-চৈতন্যে প্রধান হইয়া রহিল, সে আপন কর্তব্য ভুলিল না।

এক আসন্ন সমুদ্রযাত্রার জন্য সে নিজেকে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করিয়া লইতেছিল। কবে কোন শৈশবকালে দেখা এক সমুদ্রের কথা সে জোবেদাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। পিতামহ করমালীর সঙ্গে সেই মুলুক দেখিতে গিয়াছিল। দীর্ঘ যাত্রা, ভাটার টানে তর তর করিয়া নামিয়া যাইতে থাকিলেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল এক সময়; যখন জাগিয়া উঠিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে চতুর্দিকে কুয়া, কুয়াশা, কে যেন বলিয়াছিল কুহকের মেলা। নৌকা দুলিতেছিল। মাঝি-মাল্লা এবং অন্যান্য সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল দিক-দিশা ঠিক রাখিতে :

'বদর বদর বলে ভাই, কোনো ডর নাই।
উপরে সাগরমাথা, দক্ষিণে জলধি, উরসে,
আগুলিয়া আছে পরম অবধি।'

দাঁড় টানিবার তালে তালে প্রধান মাল্লার প্রতিধ্বনি তুলিয়া অন্যেরা যা কিছু আবৃত্তি করিয়াছিল শিকদার সেই কচি বয়সে সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, মনেও রাখে নাই আর। অকস্মাৎ এক সময় যেন সমস্ত কুয়াশার যবনিকা সরিয়া গেল। প্রসন্ন রৌদ্রের মধ্যে এক দীর্ঘ বেলাভূমি যেন কোনো রমণীর মতো কেশজাল ছড়াইয়া বিশ্রান্তে শয়ান, পক্ষীকূল, বৃক্ষরাজি লতা ঘন বন যেন তাহারে ফিরিয়া অন্য কোনো পুরী গড়িয়া তুলিয়াছে। কত কত নিঃসীম অসীম দূর দূরান্ত হইতে চঞ্চল তরঙ্গমালা যেন অলঙ্কার পরাইয়া দিতে আসিতেছে সর্বক্ষণ; পবন-বীজনে কলকণ্ঠ জলস্বরে যেন ধরিত্রীর দশ-দিন আর অযুত-নিযুত কালে কত কথা সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছিল।

পিতামহ করমালীর সর্বাঙ্গসিক্ত দেহাবয়ব তখনও তাহার চক্ষে ভাসে। সে যেন সেই বিপুল জলধির মধ্য হইতেই জাগিয়া উঠিয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল : দেখ মনা, এই পলি-রেণু জমিয়া জমিয়া গড়িয়া ওঠে দেশ-মহাদেশ, আবার তাহার উপর জীব-জীবন সকল আশা-বাসনা, কত ভুল-ভ্রান্তি। এই মাটি সকল সময় চোখে পড়ে না, কিন্তুক মাঝে মধ্যে আমারও মনে কয় যেন এরই শক্তি আমাগো জীবনেরও নিয়ামক হইয়া রইছে।

AMARBOI.COM

কিশোর শিকদার তাহার কিছু কথা বুঝিয়াছে আবার অনেক কথা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। ভাব-তত্ত্বে যাহাই থাকুক, বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রমশই উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছিল জীবনের মৌল প্রয়োজন মাটি জল বায়ু; মানুষ তাহার ভোগ ব্যবস্থা সুসার মতো করিতে পারিলে পৃথিবীতে অনেক দুঃখ থাকিত না। যতদূর মনে পড়ে, সেই দিন সেই ধরণী ভূমি জল বৃক্ষলতা দল দাম ভরা ফুল ও ফল বড়ো ঐশ্বর্যময়ী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। কোথায় দুঃখ জীবন-জীবিকা কেন কেবল দুঃখভার ভরা ক্রন্দন হইয়া উঠিয়াছে? করমালী কেবলই বলিয়াছে : বড়ো হ মনা, বড়ো হ, আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবি। শিকদার আবারও সেইরকম একটা সুযোগ, আরও গভীরতর অভিজ্ঞতার আগ্রহে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মনসব সর্দারও একটা সমাধান পাইয়া উৎফুল্ল বোধ করিয়াছে : হ, এইটাই ভালো হইবে। তুমি যাইবা শুনিয়া অনেক গরিব গুর্বারাও সাহস পাইছে। মুলুক তো সহজ না, তোমারে সঙ্গে পাইলে তার গো খাটন-খাটনি তেমন কষ্টের হইবে না। যাও কবি কর্মে কাজে তাগো মাতাইয়া দেও। এই এস্টাটের শ্রীবৃদ্ধিতে দশেরও শ্রী, তুমিও এই বিষয়টা ভালো করিয়া বুঝিয়া লও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু জোবেদা তেমন উৎসাহ বোধ করে নাই। বিধি-ব্যবস্থা, লোক-নিন্দা প্রভৃতি বিষয়গুলি সে তলাইয়া দেখিলেও বড়ো অনিচ্ছার সঙ্গেই সে তাহার ভাই-এর বাড়িতে গেল। নৌকায় উঠিবার আগে সে কিছুক্ষণ নিথরভাবে শিকদারের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল; তারপর মাথার উপর আঁচল টানিয়া ধীরস্বরে জানিতে চাহিয়াছিল : আসবা তো আমারে নিতে, না তুমি আমার দায়মুক্ত হতে চাও?

শিকদার নির্ভয় দিয়াছে : কোনো দুশ্চিন্তা নাই। সব ব্যবস্থা মনসব সর্দার নিজ হাতে তুলিয়া লইছে। ভাটির মুলুকের কাজে এই সংসারেরও লাভ হইবে। শিকদার বাস্তবিকই বুঝিয়া উঠিতেছিল ক্রমাগত যে জীবনধারণের মৌল শ্রম এবং সংগ্রাম হইতে পৃথক করিয়া গীত-কথার কোনো মূল্য নাই। অথচ কী রকম হইতে পারে সেই কথামালা সে-বিষয়ে সে তখনও যেন একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিন্তু একটা বিশেষ ধ্যান তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল যে সেই ভাটির দেশের রূঢ় কঠোর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে সে সকল ধ্যান-ভাবনা কর্তব্য এবং জীবনাচারকে সুশৃঙ্খলভাবে গুছাইয়া লইবার সুযোগ পাইবে।

আসরে গীত-কথা নিবেদন করিতে সেও যেন এক সময় কোনো গভীর হইতে করমালীর মতোই জাগিয়া উঠিল; জগৎ-জীবন, সৃষ্টি ও ভালোবাসার সমুদয় চিত্র এবং তাহার কাহিনি-কলকতার পল্লবে সে যেন তাহার সকল সাধ আকাঙ্ক্ষাকেই আবিষ্কার করিয়া চলিল।

সে কি তাহার বংশধারা? করমালীও তো কেমন অভিভূত হইয়া পড়িত গানে গানে, কথায় কথায়, চতুর্দিকের সমস্ত জগৎ ত্যাগ করিয়া যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে চাহিত অন্য কোনো রহস্যময় জগতে, কখনও তাহাকে মনে হইত সমস্ত বাহ্যজ্ঞান চৈতন্যরহিত। কিন্তু তাহাতে জগৎ-সংসারের জীবনের কী সার্থকতা লাভ হইয়াছে? জীবন-গড়ন-গঠনের মৌল ভিত্তিগুলি কেবলই যেন খুলিয়া খুলিয়া ভাঙিয়া ডুবিয়া যাইতে শুরু করিয়াছিল। পিতামহী সামাল দিতে চেষ্টা করিয়াও পারেন নাই। তাহার পিতৃদেব বাইজু মন দিতে চাহিল গণ্ডা-কড়ি হিসাব সওদাগরিতে। সর্বস্বান্ত হইয়া সে আর কোনোদিকে কোনো উদ্যম নিতে পারে নাই।

শিকদারের মধ্যে সেই বহুকালের অসাফল্য কেবলই গুমরিয়া মরিয়াছে; সকল ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার একটা রূপাবয়ব আবিষ্কারও তাহার ধ্যানে-মনে হয়তো সবসময়ই জাগরূক ছিল। আসরের উৎসাহে সেও যেন নিমজ্জিত হইয়া গেল।

ডাকিও না ডাকিও না কোকিলা রে
নিশির আন্ধারে
পবন বঁধুয়া তুমি বিলাইও না
ফুলের গন্ধরে ॥
চন্দ্রমা করিওনা উজলরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুঞ্জ বন বীথি
চরণে শৃঙ্খল আমাররে
জনম অবধি ॥
নিদ নাই রে নিশীথে কালে
দিনমানে দাস
কানু বলে সৃষ্টি যেন
ধরে উপহাস ॥

সেই আসরে শিকদারের গীত-কথকতা কোনো প্রচলিত ধারা অনুযায়ী হয়তো ছিল না, কিন্তু তাহার অভিনবত্ব এবং বক্তব্য গুঞ্জনের গুঞ্জন বহাইয়া দিয়া যাইতেছিল। এক সময় সে নিজেও অনুভব করিল তাহার হৃদয়াবেগ, দৃষ্টি এবং মনোযোগ যেন ক্রমাগত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে; মূল বিষয়কে অবলম্বন করিয়া সে চতুর্দিকের ওই জীবন এবং নানা রূপ-অরূপের সঙ্গে বর্তমান জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য গাঁথার আকাঙ্ক্ষাটাই কেবল ব্যক্ত করিতে পারিতেছে। আর একই সঙ্গে সে স্বয়ং যেন একটা নতুন দিশা স্থির করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। জগৎ-সংসার চতুর্দিকের অবস্থা-ব্যবস্থা, তাহার মতো সামান্য সাধারণ জনের জীবৎকালে যে-নতুন শিশু সকলের মধ্যে আসিয়াছে, সে জীবনকেই গীত-কথার মতো অপরূপ করিয়া তুলিবার পথ দেখাইতে পারিবে এই শুভ কামনা জানাইয়া সে শেষ করিল।

সমাদরের অভাব হইল না, স্বয়ং বড়োমিঞাও প্রত্যাশার অতীত ইনামও দিলেন, কিন্তু সে তৃপ্তি বোধ করিল না। এক সময় সকল ভিড় এড়াইয়া সে নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মনসব সর্দারের সঙ্গে কিছু অত্যন্ত জরুরি কর্মকর্তার প্রয়োজন ছিল বটে, কিন্তু সে বাস্তবিকই ব্যস্ত। একবার যখন সামনা সামনি হইতে পারিল সে ঠা ঠা হাসিয়া বলিল : এখন বাড়ি গিয়া ভালো করিয়া একটা ঘুম দেও গিয়া মর্দ। কোনো চিন্তার কারণ নাই। সব ব্যবস্থা হইতে আছে।

সে তাহার একজন সহকারীকে নির্দেশও দিয়া দিল : ওই ভাটিতে যারা যাইবে, তাগো বেশ কিছু জন এইখানেও হাজির দেখছিলাম। দেখো দেখি, খুঁজিয়া পাতিয়া আমার কবিয়াল ভাই-এর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে পারো কিনা। এমন কবিয়াল তাগো সঙ্গেও ওইখানের লড়াইয়ের মধ্যে যাইবে শুনিয়া অবধি তারগো উৎসাহের শেষ নাই।

কিন্তু তখনকার মতো অন্য কিছুই যেন আর তাহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল সেই আসরে বাস্তবিকই মনের মতো কিছু বলিতে পারে নাই, তাহার সুর-স্বর-কথা কোনো কিছুরই যেন যথাযথ প্রস্তুতি ছিল না। সে এতদিন শুধু ভাবুকের মতো তন্ময় হইয়া জীবন-জগৎ-সংসার লইয়া ভাবিয়াছে বটে; কিন্তু কোনো কিছু ধাপের পরে ধাপ সাজাইয়া নির্মাণ করে নাই। সমস্ত দিক হইতে নানা ভাব, নানা ভাষা-ভাষ্য; কখনও স্বপ্ন স্মৃতিতে সঞ্চিত উক্তি-ব্যক্তিরাই যেন সমস্ত গীত-কথা নিয়ন্ত্রণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়াছে। যদিও সে তাহার শ্রীহীন গৃহাঙ্গনে ফিরিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, তবু মনে হইতে লাগিল সেই ভাটির দেশে জীবনকে যেন সাগরের তলা হইতে গড়িয়া তুলিতে হয়, গভীর গহনে ডুবিয়া শ্রমিক মানুষ যেইভাবে মুক্তা আহরণ করে, আধি-ব্যাধি, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া যাহারা জীবন সাজাইবার দুঃসাধ্য প্রয়াস করে, কেবলমাত্র তাহাদের সঙ্গে সাকুল্যেই সে সম্ভবত জীবনকে অন্যতর কোনো দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে, উপলব্ধি করিতে পারিবে। আরও বুঝিতে পারিবে জীবনে কোনটা বড়ো, শ্রম না প্রেম? অথবা দুয়েরই কী উপায় সম্ভব হইতে পারে? এক সময় সে হোসেন-এর বড়ো অভাব বোধ করিতে লাগিল।

অন্ধকার বারান্দায় শুইয়া বারংবার মনে হইল জোবেদার কথা। সেও নিকটে থাকিলে হয়তো সে এমন অতৃপ্ত, এমন অস্থির বোধ করিত না। পারিপাট্যভরা গৃহ-সংসার না সাজাইয়া সমাজভুক্ত না হইয়া কোনো জীবনকথাই হয়তো গড়িয়া তোলা যায় না। মনে হইতে লাগিল ঘাট-মাস্টার ঠিকই বলিয়াছে, সুষ্ঠ গড়ন-গঠনের পথ দেখাইতে না পারিলে কোনো গীত-কথা কি আনন্দ যেন সার্থক হইয়া ওঠে না। কেবল দুঃখ নয়, আশা-ভরসা, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আপন বিশ্বাস শক্তি ও ক্ষমতার বিষয়েও সচেতনতা সৃষ্টি করিতে না পারিলে তাহার মুখে আর কোনো কাব্যকথাও সাজিবে না।

বাকি রাত্রিটুকু ব্যাপিয়া আরও একটা চিন্তা তাহার মন অধিকার করিয়া রাখিল, কেন সে কেবল মাত্র গীত-কথাকেই জীবনের সর্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে? এ কি কেবল সেই শৈশবকাল হইতে অনুসরণ করা একটা অভ্যাস, জীবনের আসল সংগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া বিশিষ্ট হইয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা, না বাস্তবিকই তাহার মধ্যে এমন কোনো গুণ আছে যা অন্য কাহারও নাই। কতটুকু বোধ তাহার নিজস্ব? সেই সব বোধবৃত্তির কথা সে একের পর এক আবৃত্তি করিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে কী এমন লাভ হইয়াছে তাহার? এমনও তো হইতে পারে সে কেবল অলীক দিগ-দিগন্তের দিকেই সকলের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিয়াছে, সত্যকারের জীবন-গঠনের কঠিন কঠোর সংগ্রামের মধ্যেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। বিধি যাহার কপালে লিখিয়াছে গাহিয়া ধূয়া ধরানোর বিষয়টাই যদি সত্য হয় তাহা হইলে মানুষের কোনো চেষ্টা, কোনো সংগ্রামেরই কোনো অর্থ নাই।

AMARBOI.COM

ভোর ভোর সময়ে সে হোসেনের বাড়ির দিকটা ঘুরিয়া আসিল। একবার ভাবিল সময় থাকিলে একবার গঞ্জের ঘাটেও তাহার তালাশ লইতে যাইতে পারিত; হয়তো ঘাট-মাস্টারের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলিয়া অনেক বিষয় পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু ভাটির দেশে রওয়ানা হইবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছিল। মনসব সর্দারের ব্যবস্থার উপর নিজেকে নির্ভর রাখিতে হইল।

দিন গড়াইয়া যাইতে না যাইতেই খালের ঘাটে কিছু নৌকা দেখা গেল। প্রত্যেকটিতে এক একদল জনমুনীষ। একে এক মুলুকের, অন্য আরেকের। অধিকাংশেরই কোনো জমি নাই, জীবিকা আহরণের কোনো বৃত্তি নাই, একমাত্র কৃষি কাজ ব্যতীত; জীবনের অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কর্ম নাই, পেশাতেও তাহার ভুক্ত হইতে পারে নাই। বিধাতা জীবন দিয়াছে, এখন তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার ফরজ আদায়ের জন্য তাহারা যোদ্ধার সংকল্পে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহাদের মধ্যকার বয়স্ক একজন শিকদারের কাছে আগাইয়া নিজ পরিচয় দিল, আমি আরও একটা খন্দ কাটাইয়া আসছি সেই চরে। এতদিনে নিশ্চয় আরও মজবুত হইয়া জাগছে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হইতে পারে; কোনো দিকে কোনো লোকালয় কি বসতি তো এখন হয় নাই। আমাদের সব একেবারে গোড়া হইতে গড়িয়া তুলতে হইবে। সর্দারের হুকুমে একটা নৌকার পুরা একটা দিক আপনাগো জন্য আব্রু করিয়া দেওয়া হইছে। দেখবেন একবার পছন্দ হইল কিনা?

শিকদার একটু সংকোচ বোধ করিল। নৌকাটির দিকে একবার উঁকি দিয়া দেখিল বটে, কিন্তু আরও অনেক বিষয় তখনও সম্পন্ন করা বাকি। যে লোকটি তাহার এবং হোসেনের ঘর-বাড়ি পাহারায় থাকিবে তাহারও কোনো উদ্দেশ্য নাই তখনও অবধি। কাহার ঘরেই এমনি কোনো বিশেষ সম্পদ নাই যা কোনো দস্যু আসিয়া লুটিয়া লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু হোসেন একরকম আমানত দিয়া গিয়াছে, এমন দেরি করা তাহারও কথা ছিল না যদিও। তাহা ছাড়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া যত দেখে শিকদার, যতবারই দৃষ্টি পড়ে ঘাটে বাঁধা ভূমিহীন, প্রায় ভিটাবাড়িহীন জন-মুনীষদের উপর, ততবারই মনে হইতে লাগিল সেই ভিটা এর গৃহের ভিত প্রাঙ্গণও তো একটা সম্পদ, সম্পত্তি। এত দরদ এত যত্ন করিয়া গড়িয়া তোলা প্রতিটি ঘর-বারিয়াল, প্রতিটি বৃক্ষ-লতাপাতা, প্রতিটি নালা-খাল-জলাশয়ও একটা গভীর ইচ্ছার প্রতীক এক একটা সংগ্রামের কাহিনি। এক কালের মজা গাঙ এখন যা খাল, তাহার পাড় ভাঙিয়া আগাইয়া আসার গতি রোধ করিয়াছে সারির পর সাড়ি বড়ো গাছ। একবার, কয়েক বছর আগে হোসেনের ঘরের একদিকের চাল ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছিল, অথচ প্রভাত হইতে না হইতেই এইদিক-সেইদিক হইতে আসা আরও দশজনের বাহুবলে আবারও মজবুতভাবে খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবতন্ময় শিকদার আবারও ভাবিতে শুরু করিয়া দিল, এই রকম যৌথসম্পর্ক এবং মনোভাব থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেন নিরাশ্রয় নিরাবলম্বন হইয়া পড়ে? আপাতভাবে সে তখনও তাহার কোনো সদুত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

ইতিমধ্যে মনসব সর্দার আসিয়া গেল। সঙ্গের লোকজনদের অন্যদিকে পাঠাইয়া সে শিকদারের বারান্দার ধারে বসিল হাতের লাঠিখানাকে একধারে ঠেস দিয়া রাখিয়া। তাহার হাবভাব এবং গম্ভীর মুখচক্ষু লক্ষ করিয়া শিকদার একটু বিচলিত বোধ করিল।

: বুঝতেই তো পারতে আছো, মর্দ, সে আসে নাই। এই যাত্রায় তোমার যাওয়া হইবে না। শিকদার বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ কোনো প্রশ্নও করিয়া উঠিতে পারিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: আমার ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি ঘটে নাই। লোকজন ঠিকমতোই তারে আনতে তার ভাইয়ের বাড়ি গেছিল, গিয়া দেখে সেখানে সেও নাই, আর তার ভাইয়েরও কোনো উদ্দেশ নাই। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ঘরের পোয়াতি মাইয়া ছেইলাটার কাছে জানা গেল, আগের দিন তার স্বামী আসগরউল্লা স্বয়ং আসিয়া তারে লইয়া গেছে, সঙ্গে কয়েকজন লোকজন নাকি আছিল। অনেক কথা কাটাকাটিও নাকি কিছু হইছে। মাইয়াছেইলাটির তেমন কোনো বোধ-তবধ নাকি নাই, কেবল এক সময় দেখছে, সেই কন্যা এক সময় যেন আপনা হইতেই তারগো নৌকায় গিয়া ওঠছে। তার ভাইটার এত তালাশ চালাইলাম কিন্তুক কোনো হদিস করতে পারলাম না। এত্তো বড়ো এস্টাট চালাইতে আছি আমি, আর এই সামান্য বিষয়টারই কোনো মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারলাম না।

শিকদার দৃষ্টি নত করিয়া সমস্ত বিষয়টার আকস্মিকতা কাটাইয়া উঠিতে চাহিল।

: আমার তো মনে কয় এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো জোর-জবরদস্তির ব্যাপার স্যাপার আছে। লোকবল তো আমারও আছে। তবে মনে হইল, সেইসব হাঙ্গামা আইন-আদালতের হৈ চৈ তোলার আগে বেশ একটু চিন্তা-ভাবন দরকার আছে, তোমার সঙ্গে কিছু কথা পরিষ্কার করিয়া লওনও প্রয়োজন। সমূহ কর্তব্য দেখি এই যে তোমার যাওন হয় না।

শিকদার দৃষ্টি তুলিয়া একবার খালের দিকে তাকাইল, তারপর একটু ইতস্তত করিয়া ঘরের মধ্যে হইতে রুমালে বাঁধা ছোটো একটা পুঁটুলি আনিয়া মনসব সর্দারের হাতে তুলিয়া দিল : সর্দার স্বয়ং বড়োমিঞার হাত হইতে এমন ইনাম আমি কল্পনাও করি নাই। আমার দোস্ত হোসেন এখনও তর্ক বাড়ি ফিরিয়া আসিল না; তার হাতে এইটা তুলিয়া দিবেন। আর, এই দুই বাড়ি পাহারার লোক না পাইলে আমিও স্বস্তি পাইতে আছি না।

মনসব সর্দার পুঁটুলির মধ্যে টাকাগুলি লক্ষ করিয়া একটু বিমূঢ় মুখভাব দেখাইল : তার অর্থ? যার জন্য অর্ধেক জীবনটা এমন পথ চাইয়া কাটাইয়া দিলা, এখন তার সমস্ত কিছু এই রকম আচুক্কা ছাড়িয়া দিয়া ভাটির দেশে যাওনের কী অর্থ হয়? আমার তো মনে কয় সেও খুবই ছিদ্দতের মধ্যে পড়ছে। এখন তারে উদ্ধার করাই হইবে ঠিকমতো পুরুষকার। তখন দেখিও সমস্ত দিক হইতে তামাম জগৎ-সংসার তোমারে সাবাশ দিয়া উঠবে। আমারে যদি দোস্ত বলিয়া মানো, এই সুখটা আমিও পাইতে চাই।

শিকদার নতমুখ দাঁড়াইয়া রহিল।

মনসব সর্দার লাঠিখানা হাতে লইয়া স্ফীত বুকে ঋজু হইয়া বসিল : তবে কেবল দেহের শক্তিতেই সব কর্ম হয় না, কৌশলে ব্যাপারটা নিষ্পন্ন করতে হইবে। এখনও দরকার হয় নাই। তবে বড়োমিঞার সঙ্গে পরামর্শের দরকার হইতে পারে। এত বড়ো এস্টাট চালাই তো, চতুর্দিকে চৌখ রাখতে হয়। ওই আসগরউল্লার নিকট থেকিয়া আইন-মোতাবেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়াইয়া না লওন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে তারে উঠাইয়া দেওনটাও একটু কাঁচা কাজই হইয়া যাইত। এস্টাটের কেউর কোনো দুর্নাম হইতে দেওনটা কামের কথা না।

শিকদার একসময় ধীরস্বরে বলিল : সর্দার, আমার তো মনে কয় একদিক দিয়া এমন হওনটাই ভালো হইছে। সে স্বেচ্ছায় আসছে গেছে। কেন, কী অবস্থায় এখন আবারও গেল আমি জানি না, বুঝি না। বাকি জীবনটাও যে এই বিষয় লইয়া কাটাইতেও আমার কোনো সুখ হইবে না। পৌরুষকারের কথা না, আর এই বিষয় লইয়া কোনো হৈ চৈ হাঙ্গামাও আমার পছন্দ না। আমারও রুজি-রোজগার দরকার, অন্য সকলেও তৈরি হইয়া আমার অপেক্ষায় আছে, আমি এখন না গেলে নিজেরেও আর মাপ করতে পারমু না। আপনারা রইলেন, রইল ঘর-বাড়ি-ভিটা। একটা খন্দের তো কাল, ইতিমধ্যে রহস্যটারও একটা সঙ্গত মীমাংসা হইয়া যাইবে। সর্দার, কেবল এ কন্যার কথা না, আমার আরও কিছু ইচ্ছা আছে। আমি অন্য মানুষেরও ভালোবাসার পাত্র হইতে চাই। আপনেও তো চায়েন আমি কবি হই। এখন, আপনে দয়া করিয়া হুকুম দেন, নৌকা খুলুক, আমরা রওয়ানা দেই।

মনসব সর্দার মাথা নিচু করিয়া বেশ কিছুক্ষণ ভাবিয়া দেখিল সব দিকগুলি। তারপর দাড়ির উপর হাত বুলাইয়া হাসিত চাহিল : বেশ, তবে তাই হউক কবিয়াল, আর এই এস্টাটেই তো রইলা, সুযোগ মতো তোমারে আনতেও আমার চেষ্টার কোনো কসুর থাকবে না। মুখে যা-ই বলি কবিয়াল, আমিও বুঝি, ওই মাইয়া-মানুষ এমনই একটা বস্তু যার উপর জোর জবরদস্তি করার মধ্যে সুখ নাই। দেহ পাই তো মন পাই না, তখন জানো এই এত্ত বড়ো এস্টাটের কামকার্যও যেন আমার কাছে মিছা হইয়া যায়। মন পাইলে তখন দেহের সুখেরও আর সীম-পরিসীমা থাকে না। এই বিষয়টা বুঝি বলিয়াই তো আমি চাই তোমার আরও সম্মান হউক, গৌরব হউক, যে যা-ই বলুক, এই পিরকীতি এই পৃথিবীও যেন একটা মাইয়া মানুষের লাহান। ওই সমুদ্দুর যতই কোরধো লইয়া তার কাছে আছড়াইয়া পড়ুক সে যেন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে, কিন্তুক অন্তরে প্রবেশ করুক, নদীনালা হইয়া ভরিয়া তুলুক বীজ-বীর্যে চতুর্দিক, সোহাগ করিয়া সেই পুরুষের গর্বে-ঝলমল করিয়া সেই উঠবে। আমরা অপেক্ষায় থাকুম কবিয়াল, এই সমস্তর গীত-কথার মর্মে আমার তোমার সমস্ত জগৎ-সংসারের এস্টাটকে নতুন করিয়া সাজাইয়া তুলতে হইবে।

শিকদার খালের দিকে পা বাড়াইয়াও থামিয়া পড়িল : সর্দার, এইবার যাইতে হয়।

মনসব সর্দার স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বেলাশেষের রৌদ্রে তখন বন-বনানী, খালপাড়ের নল-খাগড়া কাশবন দুলিয়া চলিতেছে, খালের স্রোতে দুমুড়ির সময় শেষ হইয়া অন্য স্রোতের সূচনা দেখা দিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~